প্রত্যাগত

প্রত্যাগত

মূল ঃ এরিখ মারিয়া রেমার্ক

অনুবাদ ঃ আবদুল হাফিজ

মুক্তধারা

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-র খুলনা নিউজপ্রিণ্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা ১১৬৭

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭
প্রচ্ছদ-শিল্পী : হাশেম খান
মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০
মূল্য : সাদা : ৭০·০০ টাকা
লেখক কাগজ : ৫০·০০ টাকা

PRATYAGATA
[The Road Back—A Novel by Erich Maria Remarque]
Translated By Abdul Hafiz
First Edition : February 1957
Cover Design : Hashem Khan
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka 1100
Bangladesh
Price : Whiteprint : Taka 70·00
Lekhakprint : Taka 50·00

গ্রন্থকার পরিচিতি

ও

অনুবাদকের বক্তব্য

এরিখ মারিয়া রেমার্ক ফরাসী বংশোদ্ভব। ১৮৯৮ সালের ২২শে জুন জার্মানীর ওয়েস্টফেলিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ওসনাব্রুকে তাঁর জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধ কালে ১৮ বছর বয়েসে শিক্ষা জীবন ত্যাগ করে তাঁকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যোগদান করতে হয় এবং তিনি পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে একাধিক বার আহত হন।

১৯১৮ সালে যুদ্ধাবসানের পর রেমার্ক এক এক কবে জীবন-জীবিকার সন্ধানে কতিপয় ক্ষেত্রে বিচরণ করে শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে একটা ক্রীড়া সাময়িকীর সম্পাদক থাকা কালে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস In Westen nicht রচনা করে বিশ্বে সাড়া জাগিযে তোলেন। অনতিবিলম্বে এই উপন্যাস ইংরেজী ভাষায় All Quiet on the Western Front নামে অনূদিত হয়, এবং তা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়। এই উপন্যাস আরো বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে সমাদর লাভ করে। বিশ্ব সাহিত্যের সর্বাধিক সমাদৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই উপন্যাস অন্যতম। যুদ্ধের নিষ্ঠুর ভয়াবহতা ও অযৌক্তিকতা আপন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে বিধৃত কবে তিনি শান্তিবাদ ও মানবতাবাদের অন্যতম অকৃত্রিম প্রবক্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তদানীন্তন তরুণ সমাজের প্রতিনিধি। তাঁর শান্তিবাদ ও মানবতাবাদ দর্শন বিশ্ব-বিবেককে এমনি প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত কবে যে, সমরবাদী নাৎসী সরকার কর্তৃক ১৯৩৯ সালে এই উপন্যাসের সমস্ত কপি ভষ্মীভূত করা হয়।

All Quiet on the Western Front-এ যে-জগতের বর্ণনা আছে, তা যুদ্ধক্ষেত্রের জগৎ। ভয়াবহ যুদ্ধের অবসানে যে-সব তরুণ সৈনিক মরণকে ফাঁকি দিয়ে স্বগৃহে তাদের যুদ্ধপূর্ব পরিচিত জীবনে ফিরে আসে, সেই প্রত্যাগতদের জীবন কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থকার ১৯৩১ সালে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস Der Weg Zeriick রচনা করেন এবং এই উপন্যাস The Road Back নামে ইংরেজীতে এবং অন্যান্য কতিপয় ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বজোড়া সমাদর লাভ করে। বলা বাহুল্য, The Road Back উপন্যাস All Quiet on the Western Front-এর অনুক্রম। 'প্রত্যাগত' The Road Back-এর বাংলা অনুবাদ। রাষ্ট্রীয় নির্দেশে সহসা বাধ্য হয়ে যে-সব কিশোর-তরুণ তাদের পড়াশোনা ও খেলাধুলা ত্যাগ করে যুদ্ধে যোগদান করে তাদের তখন সমাজ-সংসারের সাথে কোন বন্ধন নেই। একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোন অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে কোথাও তারা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। পরিণত বয়েসে যারা যুদ্ধে গিয়েছিলো তাদের কেউ কেউ ফিরে এসে তাদের আত্মীয়-পরিজন ও স্ত্রী-পুত্রদের মাঝখানে পুরানো কর্মক্ষেত্রে তাদের অভ্যস্ত স্থান দখল করে নেয়, কিন্তু অনেকের ভাগ্যে জোটে দুঃখ-বিড়ম্বনা আর বেকারত্বের অভিশাপ। তারা অনেকে দেখে তাদের পুরানো কর্মক্ষেত্রে অন্যরা তাদের স্থান দখল করে নিয়েছে। এমন কি নিজের স্ত্রী পর্যন্ত এই দীর্ঘ বিরহের শূন্যতা পূরণের জন্য অন্য পুরুষকে বরণ করে নিয়েছে। তারা এ সংসারে অনাদৃত অনাহূত অবাঞ্ছিত। এই হলো প্রত্যাগতদের জীবনের ট্র্যাজেডি। এই দুঃখ যুদ্ধক্ষেত্রের অবর্ণনীয় দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার চেয়েও মর্মঘাতী। এই মর্মাঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণায় কেউ বেছে নিলো আত্মহত্যা ও আত্ম-নির্বাসনের পথ, আর কেউ হলো উন্মাদ।

সংসারে যখন তাদের কোন আশ্রয়ই জুটলো না, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যে নিবিড় বন্ধুত্বের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলো, তাদের মনে হলো ঐ বন্ধনই সত্য। কিন্তু সংসারের নিষ্ঠুর সংঘাতে এই ঐক্য-বন্ধনও ছিন্ন হয়ে যায়। যারা একদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মোকাবেলা করেছিলো, তারাই স্বার্থের প্রবল দাবি উপেক্ষা করতে না পেরে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এই ট্র্যাজিডিই The Road Back উপন্যাসের উপজীব্য।

কিন্তু এই ট্র্যাজিডির কথাই এই উপন্যাসের শেষ এবং সব কথা নয়। মানুষে-মানুষে সহজ ভালোবাসার যে সম্পর্ক অসীম নীলিমার মতন সমস্ত

বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে, এই উপন্যাসে তা বার বার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মানব জীবনের চিরন্তন এই উপলব্ধিই এ উপন্যাসের আশ্বাস ও প্রেরণা। গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও এই উপন্যাস যে আশ্বাস ও আশাবাদ আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে, তা হলো, মানব জীবনের স্বকীয় সম্পদ, সৃজনী শক্তি ও কল্যাণ বোধ অমলিন ও অনির্বাণ। এক দিন সকল বিরোধ ও সংঘাতের অবসানে মানুষ তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবে।

আব্দুল হাফিজ

অনামিকা
৮৪, লেক সার্কাস
ঢাকা

পূর্বাভাস

দুই নম্বর পল্টনের যারা আজও অবশিষ্ট আছে তারা ফ্রণ্ট লাইনের পেছনের গোলাবিধ্বস্ত ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বেশির ভাগই ঝিমোচ্ছে।

"অদ্ভুত ধরনের শেল।" জাপ সহসা বলে ওঠে।

"তুমি কি বলতে চাইছ?" ফার্ডিন্যাণ্ড কসোল প্রশ্ন করে।

"কান পেতে শোন।" জাপ জওয়াব দেয়।

কসোল কান পাতে। তার সাথে আমরা সবাই অন্ধকারে কান পেতে থাকি। কামান দাগার অস্পষ্ট আওয়াজ আর শেলের তীব্র শোঁ শোঁ ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না। মাঝে মাঝে ডান দিক থেকে মেশিন গানের ঘর্ঘর শব্দ শোনা যায়; আর কানে ভেসে আসে মানুষের চিৎকার। এতে অবশ্য অভিনবত্ব কিছু নেই। এই কয় বছর এ চিৎকার শুনে শুনে আমাদের কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মনে আর কোন কৌতূহল জাগে না।

কসোল সন্ধিগ্ধ চোখে জাপের পানে তাকায়।

জাপ আত্মপক্ষ অবলম্বন করে বলে "থেমে গেছে।" কথাটার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য কসোল আবার জাপের দিকে চায়। জাপ নির্বিকার। কসোল মুখ ফিরিয়ে বিড়বিড় করে, "এটা তোমার অভুক্ত নাড়ীভুঁড়ির গর্জন। এটাই তোমার শেলের আওয়াজ। ভালো করে ঘুমিয়ে নাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।" কথা শেষ করে সে শিথানের মাটিটুকু উঁচু করে সটান শুয়ে পড়ে। খুব সাবধানে, যাতে বুট জোড়া পা থেকে খুলে ট্রেঞ্চের জলে না পড়ে যায়। "হায় প্রভু! বাড়িতে সুন্দরী বউ আর দু'জনের জন্য সুন্দর নরম শয্যা পাতা রয়েছে।" চোখ বুঁজে সে বিড়বিড় করে। জাপ ট্রেঞ্চের কোণ থেকে বলে ওঠে, "আমি

জোর দিয়ে বলছি, গিয়ে দেখ ইতিমধ্যেই তোমার বদলে আর কেউ সে-শয্যায় শুয়ে আছে।"

কসোল জাপের দিকে কটমট করে তাকায়। মনে হয় এখনি বুঝি এক হাত হয়ে যাবে। কিন্তু না। "ছোটলোকের মতন যা-তা বলিস না।" এই কথা কয়টি বলেই সে নাক ডাকাতে থাকে।

জাপ আমাকে হাতছানি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে যেতে ডাকে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে এডলফের পা ডিঙিয়ে গিয়ে তার পাশে বসি। ঘুমন্ত কসোলের পানে আড় চোখে চেয়ে সে রুক্ষ কণ্ঠে বলে, "এরা সব গো-মূর্খের দল; লেখাপড়ার কোন ধারণা এদের নেই।"

যুদ্ধপূর্ব জীবনে জাপ ছিলো কলোন শহরের এক সলিসিটারের কেরানী। তিন বছর সেনাবাহিনীতে থেকেও নিজের সম্বন্ধে তার উঁচু ধারণাটুকু রয়ে গেছে। যুদ্ধ ফ্রণ্টে বসেও সুযোগ পেলেই সে তার জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দিতে চেষ্টা করে। যদিও শিক্ষা সম্বন্ধে তার নিজের ধারণাটুকুও খুব স্পষ্ট নয়, তবু পুরানো দিনের কথা বলতে বসলেই সে তার নিজের বিদ্যা-বত্তার কথা পাড়ে। এই আভিজাত্যটুকু সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে, নিমজ্জমান যেমন করে সাগরের বুকে ভাসমান তক্তা আঁকড়ে ধরে। এদের প্রত্যেকেরই একটা-না-একটা কিছুর প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ রয়ে গেছে। কারো তার বউয়ের প্রতি, কারো তার ব্যবসায়ের প্রতি, আর কারোবা তার বুট জোড়ার প্রতি। ভ্যালেনটাইন লাহেবের বিশেষ আকর্ষণ পানীয়ের প্রতি আর জাদেনের বিশেষ আহার্যের প্রতি।

এদিকে লেখাপড়ার কথা বললেই কসোল তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। তার ধারণা, লেখাপড়া মানেই অহঙ্কার, লেখাপড়া জানা লোক মাত্রই অহঙ্কারী। তাই ঘুমের ঘোরেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, "যত সব বদমায়েশ মাছি-মারার দল!"

এই সময় জাপ হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নেড়ে করুণার চোখে কসোলের দিকে তাকায়। আমরা গা গরম করার জন্য কতক্ষণ ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকি শীতের তীব্র আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য। রাতটা খুব ঠাণ্ডা। মাথার উপর মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে; মাঝে মাঝে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি নামলেই আমরা ওয়াটারপ্রুফগুলো দিয়ে মাথা ঢেকে বসে থাকি।

মাথার উপর আকাশ পথে গোলাগুলি আর কামান বিচ্ছুরিত ক্ষণিক দীপ্তি চোখ ঝলসে দিয়ে আবার নিভে যায়। মনে হয়, আকাশ পথে হয়ত

শীতের এতটা দৌরাত্ম্য নেই। গোলাগুলি আর কামান নিঃসৃত ফুল্‌কি-গুলোকে ঠিক সোনালী রঙিন ফুলের মত দেখায়। দীর্ণ বিধ্বস্ত গোলা-বাড়ির উপর যেন রঙিন চাঁদ ভেসে বেড়ায়।

"তোমার কি মনে হয় আমরা ঘরে ফিরব?" জাপ চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে।

আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে জওয়াব দি, "আলবত।"

জাপ সশব্দে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। "আচ্ছা, একখানা ঈষদুষ্ণ ঘর—নরম সোফা—নৈশ বিহার—এসবের কথা কি এখনো তুমি চিন্তা করতে পার?"

একটু ভেবে বলি, "গেলো বার ছুটিতে গিয়ে আমি আমার বেসামরিক পোশাক পরে বেরিয়েছিলাম। পোশাকগুলো অবশ্য এরি মধ্যে ছোট হয়ে গেছে। নতুন করে আবার পোশাক তৈরি করতে হবে।" বেসামরিক পোশাক, সোফা আর নৈশ বিহার কথাগুলো এখানে কি মিষ্টি মধুর শোনায়। কিন্তু এর সঙ্গে একটা অদ্ভুত ভাবনাও মনে উদয় হয়। ঠিক টিনের কৌটায় রাখা মরচে-ধরা দুর্গন্ধ মিশানো কফির মতন। মুখে দিলে অরুচি হয়; কাশিতে দম আটকে আসে।

জাপ এবার নাকটা আনমনে উঁচু করে বলতে থাকে, "সুন্দর সুন্দর দোকান ঘর—কফিখানা—মেয়েমানুষ—ভাবতে বেশ লাগে ভাই!"

"আহা! এবার চুপ কর। এই নোংরা বীভৎস লড়াইয়ের ময়দান থেকে যে অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য ফিরে আসতে পেরেছ, তাতেই কৃতজ্ঞ থাক।" এই বলে আমি শীতে কুঁকড়ানো হাতে ফুঁ দেই।

"তা সত্যি।" জাপ ওয়াটারপ্রুফটা কাঁধ পর্যন্ত টেনে দেয়। আবার কথার জের টেনে বলে, "আচ্ছা, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তুমি কি করবে?"

আমার হাসি পায়। "আমি? মনে হয়, আমাকে আবার স্কুলেই ভর্তি হতে হবে। উইলি, আলবার্ট, আমি আর ঐ যে লুদভিগ, সবাইকে হয়ত আবার স্কুলে ফিরে যেতে হবে।" লুদভিগ দু'দুটো গ্রেট কোট চাপিয়ে শুয়ে আছে। আমি তার দিকে আঙুল নির্দেশ করি।

"বল কি হে? না, আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না।" জাপ চেঁচিয়ে ওঠে।

"এখনো অবশ্য সঠিক বলতে পারি না, তবে হয়ত স্কুলেই আবার যেতে হবে।" বলতে গিয়ে অকারণে মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

গ্রেট কোটের ভিতরটা নড়ে ওঠে। একখানা পাণ্ডুর মুখ বেরিয়ে অস্পষ্ট আর্তনাদ করে। এই আমার সহপাঠী লেফটন্যাণ্ট লুদভিগ ব্রেযার। আমাদের পল্টনের কমাণ্ডার। কয় হপ্তা থেকে উদরাময়ে ভুগছে। কিন্তু হাসপাতালে কিছুতেই যাবে না। এ কয়টা দিন সে এখানেই কাটিয়ে দিতে চায়। সন্ধির কথা শোনা যাচ্ছে। যুদ্ধ হয়ত থেমে যাবে। তখন আমরা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। হাসপাতালে রোগী আর জখমীব ভিড়; চিকিৎসা আর সেবা শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে যাওযাব অর্থই মরণের পথে এগিয়ে যাওয়া। অবিরাম মৃত্যুর দৃশ্য দেখে দেখে রোগী মনোবল হারিয়ে ফেলে। অবশেষে তাকেও মরণের পথেই যাত্রা কবতে হয়। আমাদের স্ট্রেচার বাহক ম্যাকসওয়েল তাকে কি একটা তরল ঔষধ যোগাড় কবে দিয়েছে, তাতে যদি বোগের কিছুটা উপশম হয। এতেও তাকে রোজ বিশ-ত্রিশ বার প্যাণ্ট খুলতে হয়।

আবাব তাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। আমিই তাকে ধরে ট্রেঞ্চের এক কোণে বসিয়ে দেই।

জাপ আবার আমাকে ইশারায় ডেকে বলে, "ঐ যে আবাব শোনা যাচ্ছে।"

"কি?"

"যে শেলের কথা আমি বলেছিলাম।"

কসোল নড়ে চড়ে হাই তোলে। উঠে বসে। অর্থব্যঞ্জকভাবে নিজের মুষ্টি পরীক্ষা করে। তারপর জাপেব পানে আড় চোখে চেয়ে কঠোর কণ্ঠে বলে, "শোন বলছি! এমনি করে যদি আবার তুমি সবাইকে নাচাবে, তবে তোমার হাড় গুঁড়ো করে তোমাকে বস্তাবন্দী করে ঘরে পাঠিয়ে দেব।" আমবা আবার কান পাতি। অদৃশ্য বস্তুব তীব্র শোঁ শোঁ ধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে কেমন যেন অদ্ভুত কর্কশ আব বিলম্বিত ধ্বনি কানে আসে। ধ্বনিটা এমনি নতুন আর অদ্ভুত যে আমার সারা দেহ সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

উইলি লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে, "গ্যাস শেল।"

ইতিমধ্যে সবাই জেগে গেছে; মনোনিবেশ সহকারে এই শব্দ শুনছে।

ভেসলিং উপরের দিকে আঙুলি নির্দেশ করে বলে, "ঐতো, বুনো হাঁসের ঝাঁক।"

অস্পষ্ট ধূসর মেঘের বুক চিরে চিরে একটা আঁকাবাঁকা রেখা যেন চাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের রক্তিম চাক্তির পটভূমিকায় কালো ছায়াগুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাঁসের ঝাঁক ডানা মেলে চলছে আর তাদের অদ্ভুত করুণ বন্য ডাক দূর দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

"ওগুলো পালিয়ে যাচ্ছে।" উইলি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে। "পোড়া কপাল! আমরাও যদি এমনি করে পালিয়ে যেতে পারতাম। দুটো পাখা পেলেই ব্যস। একদম পগার পার।"

হেনরিখ ভেসলিং উড়ন্ত বুনো হাঁসগুলোর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। "তা হলে শীত ঋতু শেষ হয়ে এলো।" সে অনুচ্চ কণ্ঠে বিড়বিড় করে। ভেসলিং জাত চাষী। এসব তার খুব ভালো জানা আছে।

দুর্বল দেহ ভাগ্যহত ব্রেয়ার পাশে ভর দিয়ে স্বগোতক্তি করে, "জীবনে এই দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম।"

কসোল কিন্তু আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে ভেসলিংকে নানা প্রশ্ন করে। তার বিশেষ প্রশ্ন, এই বুনো হাঁস অন্যান্য হাঁসের মত মোটাসোটা কিনা।

"প্রায় একই রকম।" ভেসলিং জওয়াব দেয়।

"হায়রে দুর্ভাগা পেট।" পেটে হাত বুলোতে বুলোতে কসোল চেঁচিয়ে ওঠে। উত্তেজনায় তার মাড়ি দুটো কটমট করতে থাকে। "হয়ত পনর বিশটা চমৎকার রোস্ট শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। হায়রে কপাল।"

আবার ডানার পতপত ধ্বনি শোনা যায়; আবার পাখির সেই তীব্র করুণ ডাক বাজের মতন বুকে এসে ছোঁ মারে। ডানার পতপত, ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ আর বুনো হাঁসের কর্কশ ডাক। সব মিলে মনে যেন মুক্ত জীবন চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে।

হঠাৎ গুলি ছোঁড়ার শব্দ। কসোল রাইফেলটা নিচে নামিয়ে বুভুক্ষের মতন আকাশের পানে চেয়ে থাকে। উড়ন্ত ঝাঁকের মাঝখানে সে গুলি ছুঁড়েছে। তার পাশে জাদেন শিকারী কুকুরের মতন দাঁড়িয়ে।

হাঁস মাটিতে পড়লে লুফে নিয়ে আসবে। বুনো হাঁসের ঝাঁক নির্বিকার উড়তে থাকে।

"কপাল মন্দ।" বেথকি বলে উঠে। "এই জঘন্য যুদ্ধে এই একটি মাত্র গুলি ছোঁড়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।"

কসোল বিরক্তিভরে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, "যদি গোটা কয় পাখি-মারার গুলি থাকতো!" সে ম্লান মুখে আপন জায়গায় গিয়ে বসে। পাখিগুলো পেলে কি হতে পারতো তাই ভাবে। বসে বসে মনের অগোচরেই চিবুতে থাকে।

জাপ তার দিকে তাকিয়ে বলে, "হ্যাঁ, আপেলের চাটনি আর সেঁকা আলু হলে হাঁসের রোস্টের সাথে কি চমৎকার মানাতো। কেমন?"

কসোল বিষদৃষ্টি হেনে খেঁকিয়ে ওঠে, "চুপ রও মাছি-মারা।"

জাপ দাঁত-বের-করা হাসি হেসে আবার বলে, "তোমার বিমান বাহিনীতে যোগ দেওয়া উচিত ছিলো। তাহলে হাতে জাল নিয়ে পাখিগুলোর পেছনে ধাওয়া করতে পারতে।"

"নচছার।" বলে কসোল তার বক্তব্য শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ভালোই হলো। আরো জোরে বৃষ্টি পড়তে থাকে। আমরা পরস্পর পিঠে পিঠ রেখে মাথার উপর ওয়াটার প্রুফগুলো ছড়িয়ে দিয়ে কালো মাটির ঢিবির মতন ছোট ট্রেঞ্চের ভেতর হাঁটু তুলে বসে থাকি। আমাদের চারদিকে মাটি আর সৈনিকের উর্দি এবং দেহাভ্যন্তরে ক্ষয়িষ্ণু জীবনীশক্তি।

একটা রুক্ষ কঠোর ফিসফিসানিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। "ফরো-য়ার্ড—ফরোয়ার্ড। সামনে এগোও। সামনে এগোও।" চোখে ঘুমের জড়িমা নিয়েই আমি প্রশ্ন করি, "কেন? ব্যাপার কি?" "আমাদের লাইনে যেতে হবে।" কসোল নিজের জিনিসগুলো জড়ো করতে করতে জওয়াব দেয়।

"কিন্তু আমরা ত সবেমাত্র এখানে এসেছি।" আমি বিহ্বল কণ্ঠে বলি, "যত সব রদ্দি কাণ্ড।" ভেসলিং গজর গজর করতে থাকে। "যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তাই না?"

"উঠো, এগোও।" আমাদের কোম্পানী কমাণ্ডার হীল আমাদের খেদিয়ে বের করছে। ট্রেঞ্চের এপার-ওপার ছুটোছুটি করছে। আর

তাগাদা দিচ্ছে, লুদভিগ ব্রেয়ার এরি মধ্যে উঠে পড়েছে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, "উপায় নেই। যেতেই হবে।" বলতে বলতে গোটা কয় হাত-বোমা তুলে নেয়।

বেথকি চেঁচিয়ে বলে, "লুদভিগ তোমার গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং এখানে থেকে যাও। আমাশা নিয়ে তুমি যেতে পারবে না ...।" লুদাভিগ মাথা নাড়ে।

কোমর-বন্ধ আঁটার কন কন আর রাইফেলের খট খট। মাটির বুক ভেদ করে আবার যেন মৃত্যুর দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে, অথচ আমরা আশা করছিলাম, মৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে অবশেষে নিষ্কৃতি পেলাম।

শান্তির আশা হাউই বাজির মতন আমাদের সামনে উঠে এসেছিল। যদিও আমরা তা বিশ্বাস করিনি বা উপলব্ধি করতেও চেষ্টা করিনি, তবুও শান্তির গুরুত্বটা কয়েক মুহূর্তেই আমাদের এতটা বদলে দিয়ে গেল যা গত বিশ মাসেও পারেনি। যুদ্ধের দুঃখ-নৈরাশ্যময় বছরের পর এক একটা বছর আসছে আর যাচ্ছে। দিনগুলো গুণতে গেলে অবাক হতে হয় যে, এত দীর্ঘ কাল ধরে আমরা এখানে আছি; কিন্তু একবার যখন জানা গেল যে, যে-কোন দিন শান্তি আসতে পারে, তখন প্রতিটি দিন হাজার গুণ ভারি আর কঠিন হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি বিপদসঙ্কুল মুহূর্ত যেন যুদ্ধের গত কয় বছরের চেয়ে দীর্ঘতর ও কঠোরতর মনে হয়।

চারিদিকে বাতাসের করুণ আর্তনাদ। মেঘের দল চাঁদের উপর ভেসে বেড়ায়; আলো-ছায়ার খেলা চলে। আমরা কাতারবন্দী হয়ে একের পর এক এগিয়ে যাই। করুণ দৃশ্য। দুই নম্বর পল্টন মাত্র জন-কয়েক লোকে এসে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত কোম্পানীতে এখন একটা স্বাভাবিক পল্টনের সৈন্য-সংখ্যাও নেই। যারা অবশিষ্ট রয়েছে, তারা বাছাইকরা নির্ভরযোগ্য। আমাদের মধ্যে তিন প্রধান যোদ্ধাও রয়েছে। চৌদ্দ নম্বর থেকে—বেথকি, ভেসলিং এবং কসোল। তারা অভিজ্ঞ সবজান্তা। তারা আমাদের পুরানো যুদ্ধ-কাহিনী শোনায়। মনে হয় তারা যেন কোন আদি যুগের দেবতা আর বীরদের কাহিনী শোনাচ্ছে।

প্রত্যেকে নতুন জায়গায় নিজ নিজ কোণ বেছে নেয়। বিশেষ কিছু করার নেই। চারদিকে আগুনের ঝলকানি, মেসিনগান আর ইঁদুরের ছুটোছুটি। উইলি ত একটা ইঁদুরকে লাথি মেরে শূন্যে উঠিয়ে

এক কোপে দু'টুকরোই করে ফেলে। কয়েকটা গোলাগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে এদিক-ওদিক পড়ে। বাঁ দিকে দূরে হাত বোমা ফাটার শব্দ শোনা যায়।

"এদিকটায় যেন গোলাগুলি না হয়।" ভেসলিং বলে।

"আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ুক।" উইলি মাথা নাড়ে।"

"কপাল মন্দ হলে, নাক চুলকাতেও আঙুল ভাঙ্গে।" ভ্যালেণ্টিন দার্শনিকের মতন বলে ওঠে।

লুদভিগ তার ওয়াটারপ্রুফ চাদরের উপর শুয়ে থাকে। ইচ্ছে করলে, সে না এসেও পারতো। ভেইল তাকে দুটো ট্যাবলেট খেতে দেয়। লেদারহোজ গল্প জমাতে চেষ্টা করে, কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয় না। আমরা সবাই বসে থাকি। সময় কাটতে থাকে।

আমি হঠাৎ চমকে মাথাটা তুলি। দেখতে পাই, বেথকিও বসে পড়েছে। এমন কি জাদেনও সতর্ক। এক বছরের অভিজ্ঞতার ফলে তারা অজানা একটা কিছুর আভাস পেয়েছে। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমরা মাথা উঠিয়ে অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে ধরি। সবাই সজাগ। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত দেহপেশী পর্যন্ত অনাগত অজানা বিপদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আমাদের মধ্যে উইলি হাতবোমা নিক্ষেপে সবার চেয়ে দক্ষ। সে নিজকে প্রস্তুত করে নেয়। বিড়ালের মতন আমরা সবাই মাটির মধ্যে মিশে শুয়ে থাকি। আমার পাশে লুদভিগ। এই উত্তেজনাময় পরিবেশে তার দেহে রোগের লক্ষণ নেই। সবার মতন তার ভাব-ভঙ্গিতেও মৃত্যুর নিষ্ঠুর ভীষণতা। চোখে-মুখে উত্তেজনার অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি অচেতন মনের সৃষ্টি। উত্তেজনার কারণটা মনে স্পষ্ট হওয়ায় আগেই অচেতন মন তার ছাপ চোখে-মুখে ফুটিয়ে তোলে। কুয়াশা কাঁপছে, ওঠা নামা করছে। নিথর নিঝুম। সহসা আমি বুঝতে পারি, আমাদের এই আতঙ্কের কারণ কি। এই স্তব্ধতাই আমাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। কোন মেশিনগানের ঘর্ঘর নেই। গুলি ছোঁড়াছুড়ি নেই। বোমা ফাটার আওয়াজ নেই। নেই শে[illegible] শোঁ শোঁ ধ্বনি। আছে শুধু নৈঃশব্দ; নৈঃশব্দের বীভৎসতা।

আ[illegible] পরস্পরের পানে [illegible]। কেউ যেন কিছু উপলব্ধি করতে পারে [illegible]। ফ্রণ্টে আসার পর [illegible]ন গভীর স্তব্ধতা আমরা কোন দিন
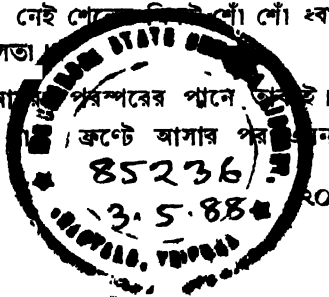
অনুভব করিনি। এই স্তব্ধতার কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা হাওয়া শুঁকতে থাকি। গ্যাস আসছে না ত? না, তাহলে এই স্তব্ধতায় টের পাওয়া যেতো। তবে এই নিস্তব্ধতা কেন? আমার হাতের বোমাটা ভিজে গেছে; উত্তেজনায় আমার গা বেয়ে ঘাম ঝরছে। মনে হয় শিরা-উপশিরা-গুলো বুঝি ছিঁড়ে যাবে। "পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট—পনর মিনিট হয়ে গেল।" লাহের বলে ওঠে—কুয়াশা ভেদ করে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। মনে হয় এই স্বর যেন কবর খুঁড়ে বেড়িয়ে আসছে, "তবু কিছু ঘটছে না, কোন আক্রমণ নয়। কোন মানুষের ছায়া নেই।"

হাতের মুঠো শিথিল হয়ে আবার শক্ত হয়ে যায়। অসহনীয় এই অবস্থা। আমরা ফ্রণ্ট লাইনের চেঁচামেচি শোরগোলে এমনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে মনে হয় আমরা এখখুনি বুলেটের মতন ফেটে আকাশে উড়ে যাব।

উইলি সহসা বলে ওঠে, "কেন? এইত শান্তি।"

সবার চোখমুখের দৃঢ়তা শিথিল হয়ে যায়; সবার নড়াচড়া কেমন যেন অর্থহীন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। শান্তি? আমরা পরস্পরের পানে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাই। আমার হাত বোমাটা আমি মাটিতে ফেলে দিই। শান্তি? লুদভিগের মুখাবয়বে এমনি অভিব্যক্তি যে মনে হয় এখনি বুঝি তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। শান্তি? ভেসলিং জড় পদার্থের মতন অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের দিকে মুখ ফেরাতেই মনে হয় সে বুঝি এখনই বাড়িমুখো রওয়ানা হবে।

উত্তেজনার মাঝখানে আমরা লক্ষ্য করিনি যে স্তব্ধতার অবসান হয়েছে। আবার গোলাগুলির সেই বীভৎস আওয়াজ। দূর থেকে কাঠঠোকরার ঠকঠকানির মতন মেশিন গানের আওয়াজ ভেসে আসে। আমাদের স্থৈর্য ফিরে আসে। মৃত্যুর পরিচিত ধ্বনি শুনে আমরা প্রায় খুশি হয়ে উঠি।

সারাটা দিন শান্ত গেছে। রাত্রি কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু ওপারের লোকগুলো তা দেবে না। তারা যে শুধু আমাদের পিছু নিয়েছে তাই নয়, আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণের আগেই তারা তীব্র গোলাগুলি আমাদের তাক করে চলেছে। আমাদের পশ্চাতে আগুনের রক্তিম ঝর্ণা আকাশ পথে বয়ে চলেছে। আমাদের আশ্রয়স্থলটি এখনো নিরাপদ। উইলি আর জাদেন একটিন গোশত সাবাড় করেছে। অন্যান্যরা স্বস্থানে

প্রতীক্ষমান। এ কয় মাসের যুদ্ধে তাদের জীবনী-শক্তি ক্ষয়ে গেছে। আত্মরক্ষা না করতে হলে তারা নির্বিকার।

আমাদের কোম্পানী কমাণ্ডার হীল গুড়ি-সুড়ি মেরে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের সব জিনিস পেয়েছ ত?" "গোলা বারুদ খুব অল্প।" বেথকি জওয়াব দেয়। কোন দিক না তাকিয়ে বেথকি মাথা নাড়ে। "যা আছে তারই সদ্ব্যবহার করতে হবে।" বলেই সে দ্রুত পায়ে পরবর্তী ট্রেঞ্চে চলে যায়। সে জানে, তারা এই গোলা বারুদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে। পুরানো যারা আছে তারা প্রত্যেকেই হীলের মত দক্ষ কোম্পানীর কমাণ্ডার হতে পারে।

অন্ধকার হয়ে আসে। আগুনের আলোতে আমাদের চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে। ধরতে গেলে আমাদের কোন আবরণ নেই। হাত আর কোদালের সাহায্যে গর্ত খুঁড়ে আমরা তাতে মাথা ঢুকিয়ে মাটির সাথে মিশে শুয়ে থাকি। আলবার্ট আর বেথকি আমার পাশে। বিশ গজের অনতিদূরে একটা শেল এসে পড়ে। কানের পর্দা বাঁচাবার জন্য আমরা মুখ হা করে রাখি; তবু শেলের আওয়াজে আমরা আধকালা হয়ে যাই। আমাদের চোখ মুখ ধুলো-ময়লায় ভরে যায়। বারুদ আর সালফারের দুর্গন্ধ নাকে লাগে। ধাতব দ্রব্যের বৃষ্টি পড়ে। ধূমায়মান একটা শেলের সাথে কার একটা বিচ্ছিন্ন হাত কোত্থেকে বেথকির মাথার পাশে এসে পড়ে।

হীল আমাদের গর্তে একলাফে ঢুকে পড়ে। বিস্ফোরণের আলোতে দেখা যায় ক্রোধে মুখখানা তার লাল গনগনে। "একদম সরাসরি ব্র্যানটকে লেগেছে। সাফ কেটে গেছে।" সে হাঁপাতে থাকে।

আর একটা শেল পড়ে। গর্জনের সাথে সাথে কাদা আর লৌহ বৃষ্টি। আকাশের বজ্র নির্ঘোষ, পৃথিবীতে কাতর আর্তনাদ। আকাশে আগুনের ঝলকানি। এই সঙ্গে মাটি কাদা মাখা মুখগুলো হাত বোমা নিয়ে মাথা তুলে প্রতীক্ষা করে।

"আস্তে শুয়ে পড়।" হীল হুকুম দেয়।

আমাদের বাঁ দিকে আক্রমণ চলছে, একটা মেশিনগান পোস্টের দখল নিয়ে। মেশিনগানটা চলছে ঘর্ঘর করে। হাত বোমার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ চিক দিয়ে উঠে আবার নিভে যাচ্ছে। সহসা কামানের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যায়। বিরতির সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানের দিকে শত্রু সৈন্য ছুটে যায়।

দু মিনিটের মধ্যেই হয়ত এটাও দখল করে নেবে। হীল তা দেখতে পায়। অস্থায়ী পাঁচিলে দাঁড়িয়ে হুকুম দেয় "ফরোয়ার্ড—অগ্রসর হও।"

আমরা এগিয়ে যাই। উইলি, বেথকি আর হীল নিক্ষেপের পাল্লায় পৌঁছে হাত বোমা নিক্ষেপ করছে। হীল ছুটাছুটি করছে। এমনি মুহূর্তে সে ঘোর পাগল হয়ে যায়। একদম পিশাচ। এতে সুফল ফলে। ট্রেঞ্চে যারা আছে তারা এতে নতুন সাহস ও প্রেরণা লাভ করে। মেশিনগান আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। দুদলে সংযোগ স্থাপিত হয়। আমরা আবার একযোগে শত্রু-সৈন্যের উপর প্রতি-আক্রমণ চালাই। এত দ্রুত কাজটা সমাধা হয় যে, টমিরা বুঝতেই পারে না যে পোস্টটা পরিত্যক্ত হয়েছে। তাই তারা পরিত্যক্ত ট্রেঞ্চেই গোলা-বারুদ খরচ করছে।

অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়। লুদভিগ সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা। কিন্তু সে ঠিক আছে। বেথকি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, "ভেসলিং কি করছে? ভেসলিং কোথায়?" এই কথাগুলো গোলাগুলির আওয়াজ ছাপিয়ে ওঠে।

হীল এসে প্রশ্ন করে, "ব্যাপার কি?"

"ভেসলিং নিখোঁজ।"

পশ্চাদপসরণের হুকুম আসার আগে জাদেন তার পাশে ছিলো। তারপর আর তাকে দেখা যায়নি। "কোথায়?" কসোল উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করে। জাদেন ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয়। কসোল বেথকির দিকে তাকায়। বেথকি কসোলের দিকে। প্রত্যেকেই জানে এটাই হয়ত আমাদের শেষ লড়াই। তাদের মনে কোন দ্বিধা নেই। তারা দুজন ভেসলিং এর সন্ধানে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে। হীল তাদের অনুসরণ করে।

লুদভিগ সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলে যায়। যদি শত্রু পক্ষ তাদের এই তিনজনকে আক্রমণ করে, তবে তারাও যেন কাল বিলম্ব না করে প্রতি-আক্রমণ চালায়। প্রথম দিকে সব শান্ত মনে হয়। তারপর হঠাৎ বোমার আগুন দেখা যায়। রিভলভারের পট পট শব্দ শোনা যায়। আমরা দ্রুত এগিয়ে যাই। সবার আগে লুদভিগ, তার পর বেথকি আর কসোল ঘর্মাক্ত কলেবরে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। ওয়াটার-প্রুফ জড়িয়ে কাকে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে।

"হীল?" না এ যে ভেসলিং এর কাতরানী। তবে হীলের কি হলো? শত্রুদের বাধা দেবার জন্য সেই প্রথম গুলি করে। সে তক্ষুণি ফিরে এসে চেঁচিয়ে ওঠে, "সব বেটাদের একই সঙ্গে আশ্রয় গর্তে পেয়েছিলাম। আর দুই বেটাকে নিয়েছি রিভালভারেব গুলিতে।" তাব পব ভেসলিং-এর পানে মনোনিবেশ সহকারে তাকিয়ে প্রশ্ন কবে? "অবস্থাটা কেমন?" ভেসলিং কোন সাড়া দেয় না।

পেটটা তার কসাইখানার জবাই করা জানোযারের মতন ফাঁকা হযে আছে। জখমটা যে কত গভীর তা জানার উপায় নেই। আমবা জখমটা আমাদের সাধ্যমত ব্যাণ্ডেজ করে দেই। ভেসলিং পানির জন্য কাতরায়, কিন্তু তাকে পানি দেওয়া হবে না। যুদ্ধের জখমীকে পানি দিতে নেই। এবাব সে কম্বলের জন্য কাকুতি করে। এত রক্তপাত হযেছে যে, শীতে সে জমে যাচ্ছে।

আরো পশ্চাতে অপসরণের হুকুম নিয়ে একজন বার্তাবাহক আসে। ওয়াটারপ্রুফে একটা রাইফেল ঢুকিয়ে ভেসলিংকে তাতে জড়িয়ে আমরা বযে নিয়ে যাই। একটা স্ট্রেচার পেলে তাকে তাতে উঠিয়ে দেব। আমবা একে অন্যের পেছনে সতর্কভাবে ধীর পদে বলি। ধীরে ধীরে চাবদিক আলোকিত হয়ে ওঠে। গুল্মলতায় রজতোজ্জ্বল কুযাশাব আববণ। আমবা যুদ্ধাঞ্চল ছেড়ে যাচ্ছি।

একটা বুলেট এসে লুদভিগেব হাতেব মাংস ছিঁড়ে নিযে যায়। উযেল জখমটা ব্যাণ্ডেজ কবে দেয়।

আমরা পেছন দিকে চলি। আরো পেছনে।

বাতাস মদের মত স্নিগ্ধ কোমল। এখন মার্চ মাস। নভেম্বব নয়। আকাশ নীলাভ নির্মেঘ। পথেব দু পাশে পপলার বৃক্ষের সারি। দীর্ঘ ঋজু বৃক্ষরাজি অক্ষত অবস্থায় নিয়মিত দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে এক আধটা গাছের অস্তিত্ব নেই। এই অঞ্চলটা ফ্রণ্ট লাইন থেকে বেশ দূরে, তাই এতটা বিধ্বস্ত নয়। আমরা যুদ্ধ লাইন থেকে শত্রুব আক্রমণেব মুখে আস্তে আস্তে একটু একটু করে পেছনে হটে এসেছি। খাকি ওয়াটারপ্রুফের ওপর সূর্যের আলো পড়ছে, আমরা সড়কের উপব দিযে আসতে আসতে গাছের শুকনো পাতা উড়ে উড়ে এর উপব পড়ছে। দু' একটা পাতা ওয়াটারপ্রুফের অভ্যন্তরেও ঢুকে গেছে।

চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে জখমীদের ভিড়। জনকয়েক জখমী বাইরে পড়ে আছে। ভেসলিংকে আপাততঃ সেখানেই রেখে দেই।

হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কয়েকজন জখমী সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। তারা চলে গেলে হাসপাতালের ভিড় কমবে। একজন ডাক্তার নবাগতদের ছুটোছুটি করে পরীক্ষা করছে। এক জখমীর জখমী পা ঝুলছে। তার হাঁটুর জোড়া থেকে পা'টা উল্টো দিকে বেঁকে আছে। তাকে এখ্‌খুনি ভিতরে নিয়ে যেতে হবে। ভেসলিংকে ব্যাণ্ডেজ করে বাইরেই রেখে দেয়া হয়।

ভেসলিং চৈতন্য ফিরে পেয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে। "ও চলে যাচ্ছে কেন?"

"এখখুনি ফিরে আসবে?" আমি জওয়াব দেই। "আমাকে ভিতরে যেতে হবে। আমার অপারেশান হওয়া চাই।" সে সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ব্যাণ্ডেজটাতে হাত বুলোয়।

"আমার জখমটা এখনি সেলাই করতে হবে।"

আমরা তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করি। সে নীল হয়ে গেছে। ভয়ে তার গা বেয়ে ঘাম ঝরছে। "এডলফ, তাকে ধরে নিয়ে এসো। তাকে আসতেই হবে।"

বেথকি এক মুহূর্ত দ্বিধা করে, কিন্তু ভেসলিং এর সামনে সে অস্বীকার করতে পারে না, যদিও সে জানে যে, ডাক্তারকে ডাকতে যাওয়াটা নিরর্থক। তাকে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে দেখি। যতদূর পর্যন্ত সম্ভব ভেসলিং এর চোখ দুটোও তাকে অনুসরণ করে। অনেক কষ্টে সে মাথাটা ঘুরিয়ে নেয়।

ভেসলিং এর দৃষ্টি এড়াবার উদ্দেশ্যে ফিরে এসে বেথকি মুখটা ঘুরিয়ে রাখে। সে ভেসলিংকে আঙ্গুলের ইশারায় এক দেখায় এবং অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে "এক ঘণ্টা পর"

আমরা সবাই খুশির ভাব দেখাই। কিন্তু একজন মৃত্যুপথযাত্রী চাষীকে কে ফাঁকি দিতে পারে? বেথকি যখন বলছে যে তাকে পরে অপারেশান করা হবে, জখমটা একটু ঠাণ্ডা হলে, ভেসলিং তখন সব বুঝে ফেলেছে। এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলে, "হ্যাঁ, তোমরা অক্ষত দেহে ওখানে দাঁড়িয়ে আছ—ঘরে ফিরে যাচ্ছ,—আর আমি—আমি চারটা বছর ঘর ছাড়া—চারটি বছর; আর এখন আমার এই অবস্থা।"

বেথকি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "তুমি ঠিকই হাসপাতালে যাচ্ছ হেনরিখ্।"

সে সান্ত্বনা পায় না। "যা হবার হবে।"

এর পর সে আর বেশী কথা বলে না; ভিতরেও যেতে চায় না, বাইরেই থাকতে চায়। একটা ঢালু স্থানে হাসপাতালটা অবস্থিত। এখান থেকে আমরা যে রাস্তা ধরে এসেছিলাম সেই রাস্তা এবং সেই রাস্তার দু'পাশে দূর দূরান্ত পর্যন্ত দেখা যায়। সব সোনালী উজ্জ্বল আনন্দময়। সেখানকার পৃথিবী শান্ত সহজ নিরাপদ। এমনকি, হাসপাতাল সংলগ্ন ধূসর মাঠের চষা ভূমিখণ্ডগুলোও চোখে পড়ে। বাতাসে ভেসে-আসা রক্ত আর নালী ঘায়ের তীব্র দুর্গন্ধের সাথে ভেসে আসে চষা মাটির সোঁদা সুগন্ধ। দূরে নীলাকাশ, চারিদিক শান্ত সমাহিত। এ স্থানটা ফ্রন্ট থেকে বহুদূরে।

ভেসলিং নীরব নিথর। সে সবকিছু খতিয়ে খতিয়ে দেখছে। দৃষ্টি তার সতেজ সজাগ। সে 'জাত চাষী। পল্লী গাঁয়ের দৃশ্য সে আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বোঝে; উপভোগ করে। এ সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। সে জানে, তাকে এখন সব ছেড়ে যেতে হবে। যাওয়ার আগে তাকে সব দেখে যেতে হবে। তাই সে আর চোখ ফিরায় না। এই মুহূর্তে সে বিবর্ণ হয়ে আসছে। অবশেষে সে সামান্য নড়ে চড়ে ফিস-ফিসিয়ে বলে, "আর্নস্ট!" আমি তার মুখের কাছে নুয়ে বসি, "আমার জিনিসগুলো বের কর।"

"এ জন্য অনেক সময় আছে, হেনরিখ।"

"না, না, বের কর।"

জিনিসগুলো বের করে তার সামনে ছড়িয়ে রাখি। একটা রংচটা পকেট বই, একটা ছুরি, ঘড়ি, টাকা-পয়সা ও বিবিধ জিনিস। পকেট বইয়ের ভিতর তার স্ত্রীর একটা ছবি।

"আমাকে এটা দেখাও ত?" সে অনুরোধ করে।

ছবিটা বের করে আমি তার চোখের সামনে তুলে ধরি। বাদামী রঙের স্পষ্ট একখানা মুখ। সে ছবিটার পানে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে। একটু পরে সে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে "সব শেষ।" ঠোঁট তার কাঁপতে থাকে। সে মাথাটা ঘুরিয়ে নেয়।

"এটা নিয়ে যাও।" কি বলতে চায় আমি তা বুঝতে পারি না। তবে তাকে আর কোন প্রশ্ন করতে আমার মন চায় না। তাই ছবিটা

আমার পকেটে রেখে দেই। "এগুলো তাকে দিয়ে দিও—" বলে সে অন্যান্য জিনিসের পানে তাকায়। আমি সম্মতি জানাই। "আর তাকে বলো—" সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার পানে তাকায়। কি যেন বিড় বিড় করে মাথা নাড়ে আর গোঁ গোঁ করতে থাকে। সে কি বলতে চায় তা বুঝতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি, কিন্তু বুঝতে পারি না। সে এবার গরগর শব্দ করে। তার হাত পা খিঁচতে থাকে; থেমে থেমে সে জোরে নিশ্বাস নেয়। ধীরে ধীরে তার চোখ নিষ্প্রভ হয়ে আসে আর একবার সে খুব জোরে নিশ্বাস নেয়; তারপর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

পরদিন সকাল বেলায় আমরা যুদ্ধ সীমান্তের অগ্রবর্তী ট্রেঞ্চে শেষবারের মতন হাজির হই। গোলাগুলি নেই। যুদ্ধ অবসান হয়েছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা এখান থেকে সরে পড়বো। এখানে আবার ফিরে আসার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমরা চিরদিনের জন্য এখান থেকে চলে যা'ব।

যা ধ্বংস করার তা আমরা ধ্বংস করে ফেলি। ধ্বংস করার মত যৎসামান্যই অবশিষ্ট আছে—গোটা দুই পরিখা মাত্র। এবার পশ্চাদপ-সরণের হুকুম আসে।

এ এক অদ্ভুত মুহূর্ত। আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সামনের যুদ্ধ-সীমান্তের পানে তাকাই। ভূপৃষ্ঠে সেখানে কুয়াশার আবছা আবরণ। গোলার আঘাতে সৃষ্ট গহ্বর আর পরিখাগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে। সেগুলো অবশ্য সীমান্তের শেষ প্রান্তে সংরক্ষিত অবস্থানের এলাকাধীন, তবে গোলা-গুলির পাল্লার আওতায়। কত বার আমরা সেখানকার রস আস্বাদন করেছি! যারা সেখানে গেছে, তাদের মধ্যে কত অল্প সংখ্যকই না নিরাপদে ফিরে এসেছে। সামনে বৈচিত্র্যহীন রুক্ষ ধূসর বন্ধুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর। দূরে একটা গুল্ম বেষ্টনীর অবশিষ্ট রয়েছে গোটা কয় বৃক্ষকাণ্ড, একটি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ আর তার মাঝখানে গোলাগুলির আঘাত প্রতিহত করে নিঃসংগ দাঁড়িয়ে আছে একটি উঁচু প্রাচীর।

"হ্যাঁ!" ধ্যান গভীর কণ্ঠে বেথকি বলে, "চার বছর—দীর্ঘ চারটি বছর আমরা এখানে কাটিয়েছি—" "ধ্যাৎ। এ সব কথা ছাড়।" কসোল সায় দেয় "এবার এ সব কিছু নিরর্থক হয়ে যাবে।"

উইলি প্রাচীর গাত্রে হেলান দিয়ে বলে, "তাই, কি মজার ব্যাপার। নয় কি?"

আমরা সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকি। খামার বাড়ী, বনভূমির ধ্বংসাবশেষ, দিকচক্রবালের অদূরে অবস্থিত উঁচু স্থান আর ইতস্ততঃ অবস্থিত ট্রেঞ্চ। সে এক ভয়াবহ জগৎ—দুর্বহ জীবন। এর অবসান হয়েছে। এই জগৎ আর এই জীবন এখানে পড়ে থাকবে। আমরা যখন এখান থেকে চলে যাব তখন সব কিছু ধীরে ধীরে পিছনে পড়ে থাকবে এবং এক ঘণ্টা পরে আমাদের জীবনে এগুলোর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তখন কে আর এ সব উপলব্ধি করবে?

আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই অবস্থায় আমাদের আনন্দ-হাসি-উল্লাসে চিৎকার করা উচিত কিন্তু আমাদের মনে আনন্দোল্লাস জাগে না। পাকস্থলীতে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করি। ময়লা নোংরা একটা কিছু গলাধঃকরণ করলে যেমন বমি-বমি ভাব হয়, তেমনি বমি-বমি ভাব।

বলার মত কেউ কোন কথা খুঁজে পায় না। লুদভিগ ব্রেয়ার ক্লান্ত দেহে ট্রেঞ্চের পাশে হেলান দিয়ে অদূরে কাউকে যেন ইশারায় ডাকছে, এমনিভাবে হাত তোলে।

হীল এগিয়ে আসে। "জায়গাটা ছেড়ে যেতে মন চায় না; তাই নয় কি?—তা হলে এবার তলানিটুকু ভোগ করার পালা।" লেদেরহোজ বিস্মিত দৃষ্টিতে তার পানে তাকায়। "এবার শাস্তি ভোগ করার পালা, তাই তুমি বলতে চাও?"

"হ্যাঁ, তাই। তলানীটুকু" বলে সদ্য মাতৃহারার মত বেদনা কাতর মুখে সে বেরিয়ে যায়।

"হ্যাঁ, তাই। সুকৃতির পুরস্কার পায়নি, এই বঞ্চনায় জ্বালায় সে জ্বলছে।" লেদেরহোজ ব্যাখ্যা করে। "আহ্! তোমরা বাজে প্রলাপ বন্ধ কর ত।" আলবার্ট বলে ওঠে।

"যাক, এবার যাওয়া যাক।" বেথকি সবাইকে অনুরোধ করে। সে নিজে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে।

"আমাদের অনেকেই কিন্তু ওখানে পড়ে রইলো।"

"হ্যাঁ, অনেকেই—ব্র্যাণ্ড, মুলার, ক্যাট, হ্যায়, বমার, ব্যার্টিঙ্ক—"

"স্যাণ্ডকুল, মেইওর্স, দুই জন টারব্রুগেন, হিউগো, বানহার্ড—"

"প্রভুর দোহাই, এবার থাম দেখি—"

সত্যি ওখানে অনেকেই পড়ে আছে। যদিও এর আগে আমরা এমন করে কথাটা ভাবিনি। এতদিন পর্যন্ত আমরা সবাই একত্র ছিলাম ; ওরা কবরে আর আমরা ট্রেঞ্চে ; কয়েক মুঠো মাটির ব্যবধান মাত্র। ওরা সামান্য সামনে ছিলো। প্রত্যহ আমরা সংখ্যায় কমতে থাকি, আর ওরা বাড়তে থাকে। আমরা বড় একটা জানতেই পারিনি আমরা ওদেরই দলে আছি কিনা। মাঝে মাঝে গোলার আঘাত ওদেরকে আমাদের মাঝখানে নিয়ে আসত। মাটি মাখা চূর্ণ বিচূর্ণ হাত, উর্দির ছেঁড়া টুকরো, জীর্ণ শীর্ণ হাত। এমনি করে ওরা ওদের কবর থেকে উঠে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত। তখন ব্যাপারটা আমাদের কাছে ভয়াবহ মনে হতো। আমরা ওদের অতি নিকটে ছিলাম। এবার আমরা আমাদের পুরাতন জীবনে ফিরে যাচ্ছি আর ওদের এখানে পড়ে থাকতে হচ্ছে।

লুদভিগের এক জ্ঞাতি ভাই এই সেকটারে নিহত হয়েছে। সে আঙুলের সাহায্যে নাকটা পরিষ্কার করে মুখ ফিরিয়ে চলতে থাকে। ধীর পদক্ষেপে আমরা তার অনুসরণ করি। চলতে চলতে আমরা বার কয়েক চারদিকে তাকাই ; চলার পথে আমরা আবার থমকে পড়ি। সহসা আমরা উপলব্ধি করি যে, অদূরের সন্ত্রাসের নরক আর গোলাবিধ্বস্ত জনশূন্য প্রান্তর আমাদের অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য হরণ করে নিয়েছে। হ্যাঁ ! আরে ধ্যাৎ ! উচ্ছন্নে যাক যত সব তুচ্ছ ভাবাবেগ। মনে হয়, এই জীবনই যেন আমাদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। যন্ত্রণাভরা এই ভয়ঙ্কর স্বদেশ আর আমরা এর অঙ্গীভূত জীব মাত্র।

এ সব চিন্তা ভাবনার বোঝা ঝেড়ে ফেলার জন্য আমরা মাথা ঝাঁকুনি দেই। কিন্তু এখানে জীবনের যে কয়টা বছর হারিয়ে গেছে বা যে বন্ধুরা এখানে রয়ে গেছে বা যে দুঃখ-যন্ত্রণা এখানকার মাটিতে চাপা পড়ে আছে, এ সব মিলে আমাদের দেহের প্রতিটি অস্থিমজ্জায় একটা মর্মযন্ত্রণা বিরাজ করছে। এই অনুভূতি আমাদের কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

আমরা পথ ধরে অগ্রসর হই।

প্রথম অধ্যায়

প্রান্তরের বুক চিরে সুদীর্ঘ জনপথ; দুপাশে ধূসর গ্রাম, বৃক্ষ পত্রের মর্মর ধ্বনি। শুকনো পাতা অবিরাম ঝরছে।

পথ বেয়ে রঙচটা ধূলো ময়লায় ধূসরিত উর্দিপরা সারিবদ্ধ সৈন্যদল। পায়ে হেঁটে চলছে। মুখাবয়ব অমুণ্ডিত খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি-গোঁফে ভর্তি। লৌহ শিরস্ত্রাণের নিচে অনশনক্লিষ্ট কৃশ মুখাবয়বে বিপদাতঙ্ক, সাহসিকতা আর মৃত্যুর রেখা। তারা ক্লান্ত চরণে নীরবে এগোয়। তারা আজ পর্যন্ত বহু পথ পায়ে হেঁটে নীরবে অতিক্রম করেছে। ট্রাকে বসে পাড়ি দিয়েছে দুস্তর পথ। বহু পরিখায় আর শেল-বিধ্বস্ত গহ্বরে বহু কাল কাটিয়েছে নীরবে; বেশি কথা না বলে। তাই তারা ক্লান্ত দেহে এই পথ বেয়ে এখন স্বগৃহে শান্তির আশায় ফিবে যাচ্ছে বেশি কথা না বলে।

শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ আর বিশ বছরের অনূর্ধ্ব বয়স্ক ছিমছাম তরুণের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। তারা কমরেড—বন্ধু। তাদের পাশাপাশি চলছে তাদের লেফটেন্যান্ট। কৈশোর অতিক্রম করেছে মাত্র। বহু নৈশ আক্রমণে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে। আর তাদেব পশ্চাতে রয়ে গেছে নিহতদের দল। এমনি করে এক পা এক পা করে তারা সামনে এগিয়ে চলে। অসুস্থ, অনশন ও অর্ধাশনক্লিষ্ট অস্ত্রশস্ত্রহীন ক্ষয়িত সংখ্যক সৈন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। তাদের দৃষ্টিতে অপ্রত্যয আর অনুপলব্ধিব অভিব্যক্তি। বিভীষিকাময় পাতালপুরী থেকে মুক্তি পেয়ে তারা যে জীবনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এই সত্য তারা বুঝি উপলব্ধি করতে পারছে না।

কোম্পানী মন্থর গতিতে এগোয়। কারণ, আমরা ক্লান্ত আব আমাদের সঙ্গে জখমী রয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমাদের দল পিছিয়ে পড়ে। পাহাড়ী অঞ্চল, চড়াইউৎরাই পথ। চড়াই পথের শীর্ষে চড়ে সামনে পিছনে চলন্ত সৈন্যদের মিছিল চোখে পড়ে। সামনের দল ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে আর পিছনের বিরাট সারি আমাদের অনুসরণ করছে। পিছনে 'সারিবদ্ধ মার্কিন বাহিনী। তারা পথ দিয়ে নদীর বন্যার মতন বৃক্ষ সারির

মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। তাদের অস্ত্রের চাকচিক্য তাদের উপর কেঁপে কেঁপে প্রতিফলিত হচ্ছে। চারিদিকে প্রশান্ত প্রান্তর পড়ে আছে। বৃক্ষ শীর্ষগুলো শারদীয় বর্ণ সমারোহ নিয়ে মাথা উঁচু করে আসন্ন বন্যার প্রতি উদাসীন চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রিটা আমরা একটা ছোট গাঁয়ে যাপন করি। যে বাড়িতে আমাদের রাখা হয়, সে বাড়ির পাশ দিয়ে একটি ক্ষুদ্র নদী বইছে। নদীর দুপাশে উইলো বৃক্ষের সারি। নদীর তীর বেয়ে একটি সঙ্কীর্ণ পথ। আমরা এই পথ দিয়ে একের পিছনে অন্য জন দীর্ঘ সারিবদ্ধভাবে চলি। সবার আগে কসোল, তার পিছনে উল্‌ফ্ নিজের ঝোলা শুঁকছে।

এই পথটা যেখানে রাজপথের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে পৌঁছে সহসা ক্যাডিন্যাও পিছন পানে লাফ দেয়।

"সামনে তাকাও"।

মুহূর্তে আমাদের রাইফেলগুলো উঁচু হয় আর আমরা ছড়িয়ে পড়ি। পথের পাশের গর্তের মধ্যে কসোল হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গুলি করতে প্রস্তুত হয়। জাপ আর ট্রসকি হঠাৎ মাথা নিচু করে আড়াল থেকে চুপি চুপি রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করে। উইলি হোমেয়ার তার হাতে বোমার বেল্টায় টান মারে। আমাদের জখমীরা পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

রাস্তা ধরে জন কয়েক মার্কিন সেপাই আসছে। তারা হাসাহাসি করছে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। তাদের অগ্রবর্তী টহলদার দলটা আমাদের নাগাল পেয়েছে।

একমাত্র এডলফ বেথকি অবিচল। আড়ালে থেকে সে নীরবে কয়েক পা এগিয়ে যায়। কসোল্ উঠে পড়ে। অবশিষ্টদের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ফিরে আসে। আমরা বিব্রতবোধ করে নিজেদের বেল্ট আর রাইফেল পুনর্বিন্যাস করি। কারণ কয়দিন আগেই ত লড়াই থেমে গেছে।

আমাদের দেখা মাত্রই মার্কিনরা থমকে দাঁড়ায়। তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। তারা মন্থর গতিতে এগিয়ে আসে। একটা ঘরের আড়ালে গিয়ে আমরা প্রতীক্ষা করি। জখমীদের আমরা আমাদের মাঝখানে রেখে দেই।

এক মিনিট নীরবতার পর একজন দীর্ঘকায় মার্কিন দল থেকে এগিয়ে আমাদের সামনে এসে ইঙ্গিতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে।

"হ্যালো কমরেড।"

এডলফ বেথকি একই ভঙ্গিতে হাত তোলে। "কমরেড।"

উত্তেজনার অবসান হয়। মার্কিনরা এগিয়ে আসে। এক মুহূর্তের মধ্যে তারা আমাদের বেষ্টন করে ফেলে। এর আগে তারা বন্দী হলে বা নিহত হলেই কেবল তাদের এত কাছাকাছি দেখতে পেয়েছি।

অদ্ভুত অনির্বচনীয় মুহূর্ত। আমরা নীরবে তাদের পানে চেয়ে থাকি। তারা অর্ধবৃত্তাকারে আমাদের চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে—সুন্দর সবল দেহ। সন্দেহ নেই তাদের আহার্যের অভাব নেই। পেট ভরে খেতে পায়। সবাই তরুণ। তাদের মধ্যে এডলফ বেখকি বা ফ্যার্ডিন্যাণ্ড কসোলের মতন বয়স্ক কেউ নেই অথচ তারা দু'জনের কেউ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক নয়। অন্যদিকে আলবার্ট ট্রাসকি বা কার্ল ব্রোগারের মতন এত অল্প বয়স্কও তাদের মধ্যে কেউ নেই। অথচ তাঁরা দুজন আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে কম বয়েসী নয়।

তাদের পরণে নতুন উর্দি, নতুন গ্রেট কোট ; তাদের বুটগুলো আঁটসাট যুৎসই। তাদের রাইফেলগুলো উত্তম, তাদের গুলি রাখবার থলেগুলো গুলি ভর্তি আর গুলিগুলোও টাটকা।

তাদের তুলনায় আমাদের একদল ডাকাত মনে হয়। আমাদের উর্দিতে দীর্ঘ দিনের কাদা মাটির দাগ, গ্রেট কোটগুলো কাঁটা তার আর শেলের টুকরোয় ছিন্নভিন্ন, তালি-দেওয়া ; কাদা আর অনেক ক্ষেত্রে রক্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। আমাদের বুটগুলো ছেঁড়া, রাইফেল নড়বড়ে আর গুলি রাখার থলেগুলো প্রায় শূন্য। আমাদের সবার দেহ নোংরা শ্যাওলা-পরা।

আরো সৈন্য আমাদের চার পাশে সমবেত হয়। সবার চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি।

আমরা আমাদের জখমীদের ঘিরে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকি ; তবে ভয় ভীতিতে নয়, আমরা একাত্ম বলে। মার্কিনরা পরস্পরকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে আমাদের পুরানো ছেঁড়া পোশাকের পানে আঙ্গুল নির্দেশ করে। তাদের একজন ব্রেয়ারকে একটুকরো সাদা রুটি দিতে আসে, কিন্তু ক্ষুধার কাতরতা চোখে মুখে স্পষ্ট থাকলেও সে তা গ্রহণ করে না।

তাদের একজন একটা আকস্মিক উক্তি করে আমাদের জখমীদের ব্যাণ্ডেজগুলোর দিকে ইশারা করে। ব্যাণ্ডেজগুলো ক্রেপ কাগজের তৈরী।

তারা সবাই এক নজর দেখে নিজেদের মধ্যে অনুচ্চ কণ্ঠে বলাবলি করে। আমাদের কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ পর্যন্ত নেই দেখে তারা বন্ধুসুলভ সহানুভূতি জানায়।

যে লোকটা সর্ব প্রথম আমাদের সম্ভাষণ করেছিলো সে বেথকির কাঁধে হাত রেখে বলে, "সত্যি বীর সিপাই বটে!" অন্যরাও সজোর সমর্থন জানায়।

আমরা কোন উত্তর দেই না। উত্তর দেয়ার মতন শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই। গেলো কয়েক সপ্তাহের কর্মতৎপরতায় এখনো আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছি। আমাদের বার বার যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়েছে। নিরর্থক আমাদের লোক ক্ষয় হয়েছে। আমরা কোন প্রতিবাদ করিনি। আগের মতনই কর্তব্য করে গেছি। 'শেষ পর্যন্ত আমাদের কোম্পানীর দুই শো লোকের মধ্যে মাত্র বত্রিশ জন অবশিষ্ট আছে। এমনিভাবে আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছি। তাই আমরা আর সে সম্বন্ধে ভাবনা করি না। আমরা শুধু ভাবি যে, আমাদের উপর যে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, সে কর্তব্য আমরা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছি।

কিন্তু এখন মার্কিনদের এই করুণার পাত্র হয়ে বুঝতে পারছি যে, সব নিষ্ফল হয়েছে। তাদের বিরাট সুসজ্জিত বাহিনী দেখে এখন তা স্পষ্ট উপলব্ধি করছি। জনশক্তি ও সমর-সম্ভারের কি ভয়ঙ্কর অসুবিধে নিয়েই না আমরা তাদের মোকাবেলা করেছিলাম!

আমরা ঠোঁট কামড়ে পরস্পরের পানে তাকাই। বেথকি মার্কিন সৈন্যটার হাতের তল থেকে তার কাঁধটা সরিয়ে নেয়। কসোল শূন্য দৃষ্টি মেলে সামনে চেয়ে থাকে। লুদভিগ সরে যায়। আমরা আমাদের রাইফেলগুলো দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়াই; আমাদের দৃষ্টি কঠোরতর হয়। আমরা পিছন পানে ফিরে তাকাই। অবরুদ্ধ আবেগে আমাদের মুখাবয়ব কঠিন হয়ে ওঠে। অতীত স্মৃতির দাবদাহ আমাদের অন্তরে আবার জ্বলে ওঠে। কি আমরা করেছি? কি অসহনীয় দুঃখ ব্যথা পেয়েছি? কি আমরা পিছনে হারিয়ে এসেছি? সে সব স্মৃতির দাবদাহ!

আমাদের কি হয়েছে তা বুঝি না, তবে যদি এখন কেউ আমাদের কোন তিক্ত অপ্রীতিকর কথা শোনায় আমরা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠব। স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আমরা আবার দিশে হারা হয়ে বন্য প্রাণীর মত যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

একজন মোটাসোটা লালমুখো সার্জেন্ট অন্যদের সরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। তার নিকটতম কসোলকে জার্মান ভাষায় গব গব করে অনেকগুলো কথা বলে যায়। ফ্যার্ডিন্যাণ্ড চোখ টিপে।

"ও ত আমাদের মতনই কথা বলে" বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে সে বেথকিকে বলে, "ও কি বললো?"

লোকটা কসোলের চেয়েও ভালোভাবে এবং অনর্গল জার্মান ভাষা বলতে পারে। সে বললো যে যুদ্ধের আগে সে ড্রেসডেনে ছিলো। সেখানে তার অনেক বন্ধু আছে।

"ড্রেসডেনে?" কসোল প্রশ্ন করে। "আমিও ত একবার সেখানে প্রায় দু বছর ছিলাম—"

সার্জেন্ট হাসে, যেন সঠিক শনাক্ত হয়ে গেছে। যে রাস্তায় সে থাকত সে রাস্তার নামটা সে উল্লেখ করে। "আমার বাড়ি থেকে ত পাঁচ মিনিটের রাস্তাও নয়।" ফার্ডিন্যাণ্ড উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে। "মনে হয়, আগে আমাদের দুজনের দেখা হয়নি। পহল নাম্নী বিধবা মহিলাকে হয়ত আপনি চেনেন—জোহানিস স্ট্রীটের কোণের একটা বাড়িতে থাকে। সেই মহিলা আমার বাড়িওয়ালী।"

কিন্তু সার্জেন্ট এই মহিলাকে চেনে না। সে জেণ্ডার নামক একজনের নাম করে। ট্রেজারীর কেরানী। কসোল আবার তাকে স্মরণ করতে পারে না। এলবে নদী আর দুর্গের কথা দুজনেরই মনে আছে। খুশীতে তাদের চোখ চিক চিক করে ওঠে। ফার্ডিন্যাণ্ড সার্জেন্টের বাহু চেপে ধরে বলে, "আরে, তুমি দেখছি স্থানীয় অধিবাসীদের মতনই জার্মান ভাষা বলতে পার। তা হলে তুমিও ড্রেজডেনে ছিলে? কিন্তু বলত, আমরা কি নিয়ে যুদ্ধ করছি?"

সার্জেন্ট হাসে। সে নিজেও তা জানে না। একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে সে কসোলকে এগিয়ে দেয়। কসোল আগ্রহ ভরে হাত বাড়িয়ে দেয়। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে একটা ভালো সিগারেটের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ দেবে না। আমাদের নিজেদের সিগারেট-গুলো বীচ বৃক্ষের পাতা আর শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরী আর এগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ভালো। ভ্যালেনটিন লাহের ডেকে ডেকে বলে, আমাদের সাধারণ সিগারেটগুলো সমুদ্রের আগাছা আর গোবর দিয়ে তৈরী। আর সে এমনি বস্তুর সমঝদার।

কসোল আমেজে সিগারেট টেনে ধীরে সুস্থে ধোঁয়া ছাড়ে। আমরা ঈর্ষাকাতর চিত্তে ধোঁয়া শুঁকতে থাকি। লাহেরের নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে। সে মিনতির সুরে কার্ডিন্যাণ্ডকে অনুরোধ করে—" আমাদের এক আধটা টান দিতে দাও।" কিন্তু সিগারেটটা নেয়ার আগেই অন্য একজন মার্কিন সৈন্য তাকে একটা ভার্জিনিয়া তামাকের প্যাকেট দেয়। ভ্যালেনটিন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার পানে চায়। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে গন্ধ শোঁকে। মুখটা তার আনন্দোজ্জ্বল। সে অনিচ্ছায় তামাকের প্যাকেট ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু লোকটা তা প্রত্যাখ্যান করে ভ্যালেনটিনের টুপির ব্যাজটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ভ্যালেনটিন বুঝতে পারে না। "সে তামাকের বিনিময়ে টুপির ব্যাজটা চায়।" ড্রেসডেন থেকে আগত সার্জেন্ট ব্যাখ্যা করে। লাহেরের কাছে ব্যাপারটা আরও জটিল ঠেকে। এত চমৎকার তামাকের বদলে একটা টিনের তৈরী ব্যাজ। "লোকটার নিশ্চয়ই মাথায় গোলমাল আছে।" ভ্যালেনটিন এ দাঁও কিছুতেই ছাড়বে না। সে মার্কিনীকে ব্যাজসহ টুপিটা দিয়ে কাঁপা হাতে লোভীর মত তার পাইপে তামাক ভরতে শুরু করে দেয়।

এখন আমরা বুঝতে পারি মার্কিনীরা কি উদ্দেশ্যে এই বিনিময় চায়। এটা স্পষ্ট যে, খুব বেশি দিন হয়নি এরা যুদ্ধে এসেছে। এরা এখনও স্মারক সংগ্রহ করছে। কাঁধের স্ট্র্যাপ, টুপির ব্যাজ, কোমর বন্ধের বক্‌লেস, পদক, উর্দির বোতাম। এ সবের বিনিময়ে আমরা সাবান, সিগারেট, চকোলেট, মাংস ভর্তি টিন জড়ো করি। তারা আমাদের কুকুরটার বিনিময়ে টাকা পয়সাও দিতে চায়। কিন্তু আর নয়। তারা যা খুশী দিক, আমাদের কুকুরটা আমাদের ছেড়ে যাবে না। অন্য দিকে আমাদের জখমীদের দৌলতে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। একজন মার্কিন সৈন্য আমাদের জখমীদের ব্যবহৃত কয়েক টুকরো রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ অর্থের বিনিময়ে নিতে অত্যন্ত আগ্রহী। তার এক মাত্র উদ্দেশ্য, দেশে ফিরে গিয়ে সে লোকদের দেখাবে যে এই ব্যাণ্ডেজগুলো কাগজের তৈরী। বিনিময়ে সে অত্যুৎকৃষ্ট বিস্কুট আর একমুঠো সত্যিকার ব্যাণ্ডেজ দেয়। অতি যত্ন সহকারে সে আমাদের জখমীদের দেয়া ব্যাণ্ডেজগুলো বেঁধে দেয়। বিশেষ করে লুদভিগের ব্যবহৃত ব্যাণ্ডেজগুলো। কারণ এগুলো একজন লেফট্-ন্যান্টের রক্ত মাখা। তবে লুদভিগের পেনসিল দিয়ে এগুলোতে তার নাম ঠিকানা, রেজিমেন্টের নাম লিখে দিতে হয়। যাতে আমেরিকাবাসীরা বোঝে যে এগুলো ঝুটা নয়। প্রথম দিকে লুদভিগ অস্বীকৃতি জানায়।

কিন্তু উইলি তাকে বুঝিয়ে সম্মত করে। কারণ আমাদের ভালো ব্যাণ্ডেজের খুব প্রয়োজন। তা ছাড়া, তার আমাশায় বিস্কুট ত দৈব প্রাপ্ত পরম সৌভাগ্য।

আর্থার লেদেরহোজ সবচেয়ে বড় দাঁও মারে। সে এক পরিত্যক্ত স্থানে পাওয়া এক বাক্স আয়রণ ক্রস হাজির করে। তারই মতন রোগা পটকা এক মার্কিন সৈন্য পুরো বাক্সটা কিনতে চায়, কিন্তু লেদারহোজ টেড়া চোখে চেয়ে একটা মাত্র আয়রণ ক্রস বের করে দেয়। ক্রেতা নিরাবেগ দৃষ্টিতে তার পানে চায়। সহসা তাদের দু'জনের মুখের আসল সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যেন একই পরিবারের দুই ভাই। যুদ্ধ ও মৃত্যুর পৈশাচিকতা পেরিয়ে এই সাদৃশ্য টিকে রয়েছে ; টিকে রয়েছে এই ব্যবসায়িক মানসিকতা।

লেদারহোজের প্রতিপক্ষ বুঝতে পারে এই পাইকারী লেনদেনটা কিছুতেই কার্যকর হচ্ছে না। আর্থার ঠকবার পাত্র নয়। তার পণ্য খুচরো বিক্রি করলে নির্ঘাত অনেক লাভ হবে। তাই সে একটা একটা করে বিনিময় করে তার বাক্স নিঃশেষ করে ফেলে। তার পাশে পণ্যের স্তূপ জমে যায়—মাখন, রেশমী কাপড়, ডিম, পোশাক-পরিচ্ছদ, টাকা পয়সা। শেষ পর্যন্ত মনে হয় সে পণ্য বিপনির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার আমরা বিদায় নেই। মার্কিন সৈন্যরা পিছন থেকে ডাকাডাকি করে হাত নেড়ে আমাদের বিদায় দেয়। সার্জেন্টটা এ ব্যাপারে অক্লান্ত। কসোল পর্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে, একজন সৈনিকের পক্ষে যতটুকু আবেগপ্রবণ হওয়া সম্ভব। সেও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বিদায় বাণী উচ্চারণ করে হাত নাড়ে। তার কাছে এসব আনুষ্ঠানিকতা এখন নিরর্থক ব্যাপার। অবশেষে সে জোর করেই বেথকিকে বলে, "বেশ ভালো লোক এরা, তাই না?"

এডলফ মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানায়। আমরা এবার সামনে চলতে থাকি। ফার্ডিন্যাণ্ড মাথা নত করে কি যেন ভাবছে। এটা তার স্বভাব নয়, কিন্তু মন মেজাজ বিগড়ে গেলে সে একই কথা বার বার ভাবে। ড্রেসডেনের সেই সার্জেন্টের কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

গাঁয়ের লোকেরা আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। একটা রেলওয়ে ক্রসিং-এ প্রহরীর ঘরের জানালায় ফুল ফুটে আছে। একটা নীল জামা পড়া স্ফীতকায়া স্ত্রীলোক শিশুকে স্তন্যদান করছে। কয়েকটা কুকুর আমাদের পিছনে ঘেউ ঘেউ করছে। নেকড়েরা প্রত্যুত্তরে গর্জন করছে। একটা

কুকুর একটা কুকুরীর উপর চেপে আছে। আমরা আনমনে ধূমপান করে চলছি।

"চলছি ত চলছিই।"

আমরা এবার এম্বুলেন্স স্টেশন ও সাপ্লাই ডিপো এলাকায় পৌঁছে যাই। বৃক্ষাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ পার্কে স্ট্রেচার আর জখমীর দল গাছের তলায় পড়ে আছে। রক্তিম সোনালী পাতা ঝরে ঝরে তাদের উপর পড়ছে।

একটা গ্যাস হাসপাতাল। "যে সব রোগীর অবস্থা খারাপ, অন্যত্র সরানো যায় না, তাদের জন্য এই হাসপাতাল। গ্যাস আর এসিড লাগা নীল সবুজ দগদগে মুখ। দৃষ্টিহীন চোখ। রুদ্ধশ্বাস মুমূর্ষুদের দল। তারা এখান থেকে চলে যেতে চায়, যুদ্ধবন্দী হতে চায় না। কোথায় মরবে এই ব্যাপারটা যেন কোন ঔদাসীন্যের ব্যাপার নয়।

আমরা তাদের এই বলে উৎসাহ দেই যে, মার্কিনদের অধীনে তাদের চিকিৎসা আর সেবা-যত্ন আরও ভালো হবে। কিন্তু তারা কর্ণপাত করে না। তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য তারা বার বার অনুনয় বিনয় করে।

তাদের কান্না অসহ্য। এই মুক্ত আলোতে তাদের বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখগুলো ভূতুড়ে আর অস্বাভাবিক মনে হয়। সবচেয়ে বীভৎস মনে হয় তাদের ডুবড়ানো চোয়ালে গজানো অবিন্যস্ত নোংরা ময়লা খোঁচা-খোঁচা দাঁড়িগুলো।

তাদের মধ্যে গুরুতর আহত জনকয়েক তাদের জীর্ণ হাতগুলো শিশুর মত উপরে তুলে কাতর কণ্ঠে চেঁচায়, "আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই! তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।" তাদের গভীর চক্ষু-কোটরে অদ্ভুত কালচে রেখা, তাদের চক্ষু তারকা জলে নিমজ্জিত ব্যক্তির চক্ষু তারকার মতন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। অন্যান্যরা নীরব দৃষ্টিতে আমাদের অনুসরণ করছে।

ক্রমশঃ তাদের কান্নাধ্বনি স্তিমিত হয়ে যায়। ক্লান্ত দেহে আমরা পথ চলতে থাকি। আমরা অনেক জিনিসপত্র বহন করছি। বাড়িতে কিছু একটা নিয়ে যেতেই হবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অপরাহ্ণে মেঘ কেটে সূর্য দেখা দেয়; বীচ বৃক্ষগুলো অবশিষ্ট সামান্য কয়েকটা পাতা নিয়ে পথের কর্দমাক্ত জমাট পানিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বৃক্ষ শাখায় নতুন পাতা চোখে পড়ছে।

পৃষ্ঠদেশে বোঝা নিয়ে নত মস্তকে চলতে চলতে রাস্তার পাশে অবস্থিত বৃষ্টির জলে সৃষ্ট জলাশয়গুলোতে বর্ণালী বৃক্ষরাজির প্রতিবিম্ব চোখে পড়ে। এসব আকস্মিক আয়নায় প্রতিফলিত বৃক্ষগুলোর প্রতিবিম্ব সত্যিকার বৃক্ষের চেয়েও সুন্দর উজ্জ্বল মনে হয়। এই প্রতিবিম্বগুলো অন্য পরিবেশে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। পিঙগল ধরণীর বুকে একটুকরো আকাশ, বৃক্ষরাজি, গভীরতা আর স্বচ্ছতা শায়িত রয়েছে। সহসা আমার দেহ শিউরে ওঠে। দীর্ঘকাল পর আমি আবার অনুভব করি যে, সুন্দরের অস্তিত্ব এখনও আছে। আমার সম্মুখে এই জলাশয়ে অবস্থিত দৃশ্যটা তার সহজ সারল্য নিয়ে সুন্দর ও পবিত্র। এ শিহরণ আমার হৃদয় নাচিয়ে দেয়। মুহূর্তের জন্য আর সব চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণরূপে মন থেকে মুছে যায়। আর এই প্রথম বারের মতন তা আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করি, অবলোকন করি, উপলব্ধি করি। শান্তি! শান্তি! যে জগদ্দলে পাষাণ এত দিন আমার বুকে অহরহ চেপেছিলো, কিছুতেই নামেনি, তা অবশেষে নেমে যায়। অদ্ভুত নতুন একটা কিছু ডানা মেলে উড়ে যায়—একটা কপোত, একটা শ্বেত কপোত শূন্যে উড়ে যায়। কল্পনায় দিগন্তে ভেসে উঠে প্রত্যাশা, আলোর আকস্মিক দীপ্তির পূর্বাভাস, আশা-আনন্দ-শান্তি।

একটা অপ্রত্যাশিত আতঙ্কে আমি ফিরে তাকাই ; স্ট্রেচারের উপর আমার বন্ধুরা শুয়ে আছে। তারা এখনও ডাকে। যুদ্ধ থেমেছে, শান্তি ঘোষিত হয়েছে ; কিন্তু তাদের মৃত্যু অনিবার্য। তারা শান্তি উপভোগ করতে পারবে না। কিন্তু আমি—আমি উল্লাসে নৃত্য করছি ; আমার লজ্জা করছে না। সত্যি বিশ্রী ব্যাপার।

একে অন্যের ব্যথা-বেদনা দুঃখ-শোক উপলব্ধি করতে পারে না বলেই কি অনন্ত কাল ধরে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটছে ?

(২)

অপরাহ্নে আমরা এক মদের কারখানার প্রাঙ্গণে বৃত্তাকারে বসে আছি। কারখানার অফিস থেকে আমাদের কোম্পানী কমাণ্ডার লেফটান্যান্ট হীল বেরিয়ে এসে আমাদের সবাইকে এক সাথে ডাকে। উপর থেকে হুকুম এসেছে যে, নিম্ন স্তর থেকে আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে। হুকুম শুনে আমরা হতভম্ব। এমন কথা আগে কেউ কোন দিন শোনেনি।

ম্যাকসওয়েল হাতে একটা খবরের কাগজ দুলাতে দুলাতে প্রাঙ্গনে এসে চেঁচিয়ে বলে, "বার্লিনে বিপ্লব চলছে।"

হীল দ্রুত মুখ ফিরিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে, "বাজে কথা। বার্লিনে গোলমাল হচ্ছে।"

কিন্তু ওয়েলের কথা শেষ হয়নি। সে তার আগের কথার জের টেনে বলে, "কায়জার হল্যাণ্ডে পালিয়েছে।"

এই কথায় আমরা চমকে উঠি। ওয়েল নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে। হীল ত রেগে আগুন। "মিথ্যাবাদা কোথাকার।" সে গর্জে ওঠে। ওয়েল তার হাতে খবরের কাগজটা দেয়। হীল কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে ওয়েলের পানে কঠোর দৃষ্টি হানে। ওয়েলকে সে সহ্য করতে পারে না। কারণ ওয়েল একজন ইহুদী ; স্বল্প বাক নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। সারাক্ষণ বসে বসে পড়া লেখা করে : আর হীল বড় ঝঞ্ঝাটে আর কলহপ্রিয়।

"সব গুজব" সে গর্জন করে ওয়েলেসের পাণে এমনিভাবে তাকায় যেন ওয়েলেসকে গলা টিপে ধরবে।

ম্যাকস তা. জামার বোতাম খুলে খবরের কাগজের আর একটা বিশেষ সংখ্যা বের করে দেয়। হীল কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নিজের ঘরে চলে যায়। ওয়েল কাগজের টুকরোগুলো একত্র জোড়া লাগিয়ে আমাদের খবরটা পড়ে শোনায়। আমরা হতভম্বের মতন বসে থাকি। এটা আমাদের ধারণার অতীত।

"খবরে বলছে যে কায়জার গৃহযুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিল"—ওয়েল ব্যাখ্যা করে।

"কি সব বাজে ব্যাপার" কসোল বলে উঠে, "এ জন্যই কি আমরা এখানে পড়ে আছি?"

"জাপ, আমার পাঁজরে একটা খোঁচা দিয়ে দেখত, আমি এখানে আছি কিনা।" বেথকি মাথা নেড়ে বলে।

জাপ খোঁচা দিয়ে বেথকির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। "তা হলে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।" বেথকি বলে যায়, "তবুও ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আমাদের মধ্যে কেউ এমন কাণ্ড করলে তাকে দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হত।"

"ভেসলিং আর স্রোডারের কথা এখন চিন্তা না করাই উত্তম।" কসোল বিড় বিড় করে বলে, "চিন্তা করলে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে যাব।

বেচারা গ্রোডার। আহা, বাচ্চা ছেলে। তার দেহটা থেৎলে পড়ে আছে আর যে লোকটার জন্য সে প্রাণ দিল সেই কিনা সটকে পড়লো। "নোংরা কলঙ্ক।" সহসা সে ক্ষিপ্তের মতন সামনের বিয়ারের বাক্সটায় লাথি মারে।

এই আলোচনা বাদ দেয়ার জন্য উইলি হোমেয়ার ইঙ্গিত করে। "এ আলোচনা ছেড়ে বরং অন্য বিষয়ে আলোচনা হোক।" সে প্রস্তাব করে। "আমি এ বেটার কথা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছি।"

কয়েকটা রেজিমেন্টে ইতিমধ্যে কেমন করে সেনাপরিষদ গঠিত হয়েছে ওয়েল তা ব্যাখ্যা করে। রেজিমেন্টের অফিসাররা আর নেতৃত্ব দিচ্ছে না। অনেক অফিসারের কাঁধের স্ট্র্যাপ খুলে নেয়া হয়েছে। আমাদেরও একটা পরিষদ হোক, সে তাই চায়। কিন্তু অন্যেরা তাতে খুব উৎসাহ প্রদর্শন করে না। আমরা আর কোন কিছু গঠন করতে চাই না। আমরা ঘরে ফিরতে চাই। পরিষদ গঠন না করেই তা পারা যাবে।

শেষ পর্যন্ত তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। বেথকি, ওয়েল আর লুদভিগ ব্রেয়ার।

ওয়েল চায় যে, লুদভিগ তার কাঁধের স্ট্র্যাপ খুলে ফেলুক।

"এখানেই—"লুডউইগ ক্লান্ত হস্তে কপাল মুছতে মুছতে বলে। কিন্তু বেথকি ওয়েলের প্রস্তাব উড়িয়ে দেয়, "লুদভিগ আমাদেরই একজন।"

ব্রেয়ার একজন ভলাণ্টিয়ার হিসেবে আমাদের কোম্পানীতে যোগদান করে; পরে কমিশন লাভ করে। শুধু ট্রসকি, হোমেয়ার, ব্রগার এবং আমার সঙ্গেই সে আপন জনের মতন কথা বলে না—আমাদের কথা আলাদা, কারণ আমরা স্কুলে সহপাঠী ছিলাম; অন্য কোন অফিসারের অনুপস্থিতিতে অন্যান্য পুরানো বন্ধুদের সঙ্গেও সে একই রকম ব্যবহার করে। এ জন্য সে কৃতিত্বের অধিকারী।

"তাহলে হীলের ব্যাপারে"—ওয়েলস গোঁ ধরে।

তার ব্যাপারটা সহজবোধ্য। হীল বহুবার ওয়েলসকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে সুতরাং এবার ওয়েল যে এই সুযোগে তার উপর একহাত নেবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তাতে আমাদের মাথা ঘামাবারও কোন কারণ নেই। হীলের মেজাজ রুক্ষ, তা সত্যি, তাই বলে সে কারো প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়। আপদে বিপদে সে ছুটে আসে। এ জন্য সৈন্যরা তার প্রশংসা করে।

"বেশ, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার।" বেথকি মন্তব্য করে। "তবে গোটাকয় ব্যাণ্ডেজ সঙ্গে নিও" জাদেন পিছন থেকে ডেকে বলে। আসলে ঘটনাটা অন্য. রকম মোড় নেয়। ওয়েলের ঢোকার মুখে হীল অফিস থেকে বেরোচ্ছিলো। তার হাতে কয়েকটা কাগজ। "তোমার কথাই সত্যি।" সে ম্যাকসকে উদ্দেশ করে বলে। ওয়েল কথাটা বলতে শুরু করে। কাঁধের স্ট্র্যাপের কথাটা উত্থাপন করতেই হীল হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হয় এবার বুঝি হাতাহাতি হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা অবাক হলাম যে, কোম্পানী কমাণ্ডার সংক্ষেপে জওয়াব দেয়, "তাই ত।" তারপর লুদভিগের পানে তাকিয়ে সে তার কাঁধের স্ট্র্যাপে হাত দিয়ে বলে, "তুমি হয়ত বুঝতে পারছ না ব্রেয়ার, প্রাইভেট পোশাকই বাঞ্ছনীয়; সামরিক পোশাকের দিন ফুরিয়ে গেছে।"

কেউ কোন কথা বলে না। এ আমাদের পরিচিতি হীল নয়—যে হীল রাত্রিতে হাতে একটি মাত্র ছড়ি নিয়ে টহলে বেরোতো, যাকে আমরা বুলেট প্রুফ মনে করতাম। দাঁড়িয়ে কথা বলতেও যেন তার কষ্ট হচ্ছে।

আজ সন্ধ্যায় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ফিস ফিস শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। "তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছ।" কসোলকে এই কথা বলতে শুনি। "সত্যি ঘটনা," উইলি জোর দিয়ে বলে, "এসো দেখবে।"

তারা তাড়াহুড়ো করে প্রাঙ্গণে যায়। আমিও তাদের অনুসরণ করি। অফিস ঘরে বাতি জ্বলছে। তাই ভিতরটা দেখা যায়। হীল টেবিলে উপবিষ্ট। তার অফিসারের নীল জ্যাকেট 'লিটেফ্‌র্কা' তার সামনে পড়ে আছে। একটা প্রাইভেট টিউনিক তার পরণে। হাতের উপর মাথাটা ন্যস্ত। না, তা হতে পারে না। আমি এক পা এগিয়ে যাই—হীল. হীল. কাঁদছে।

"এর চেয়ে অবিশ্বাস্য কিছু হতে পারে?" জাদেন চুপি চুপি বলে।

"চুপ কর।" বলে বেথকি জাদেনকে একটা লাথি মারে। আমরা বিব্রত হয়ে চুপে চুপে সরে পড়ি।

পরদিন সকালে শুনতে পাই, সম্রাটের পলায়নের খবর পেয়ে একজন মেজর গুলিতে আত্মহত্যা করেছে।

হীল আসছে। নিদ্রাহীনতায় ক্লান্ত বিবর্ণ। শান্ত কণ্ঠে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে সে চলে যায়। আমাদের অত্যন্ত খারাপ লাগে। আমাদের

শেষ সম্বলটুকুও হারিয়ে গেলো—আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলো।

"আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো। সত্যিকার বিশ্বাস-ঘাতকতা।" কসোল্ বদমেজাজে বলে।

আজ যে সেনাবাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে বিষণ্ণ চিত্তে এগিয়ে যাচ্ছে, সে বাহিনী গত কালের বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকের বাহিনী পরিত্যক্ত, পথহারা। প্রতি পদক্ষেপে আমাদের পরিখা খননের যন্ত্রপাতি-গুলো শব্দ করছে। কিন্তু এ ধ্বনি বৈচিত্র্যহীন বেসুরো। সব ব্যর্থ নিষ্ফল।

একমাত্র লেদারহোজ খুশীতে উপচে পড়ছে। সে মার্কিনীদের থেকে লুণ্ঠিত পণ্যদ্রব্য আমাদের কাছে বিক্রি করছে।

পরদিন অপরাহ্নে আমরা জার্মানী পৌঁছি। এখানে আশেপাশে কেউ আর ফরাসী ভাষায় কথা বলছে না বলে অবশেষে আমাদের মনে এ বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠে যে, সত্যি শান্তি স্থাপিত হয়েছে ; এতে কোন সন্দেহ নেই। এর আগে পর্যন্ত আমরা মনে মনে আশঙ্কা করছিলাম, যে-কোন সময় হুকুম আসতে পারে যে, এবার উল্টো পথে ট্রেঞ্চে ফিরে যাও। একজন সৈনিক ভালো সম্বন্ধে সদা সন্দিহান ; তার ধারণা, উল্টোটা আশা করাই কাম্য। এবার আমাদের মনের অভ্যন্তরে আশার বুদ্বুদ ধীরে ধীরে জেগে উঠছে।

আমরা একটা বড় গাঁয়ে প্রবেশ করি। গোটা কয় শুকনো মালা রাজপথে ঝুলছে। ইতিমধ্যে এত সেনাদল এই পথ অতিক্রম করে গেছে যে আমাদের নিয়ে বিশেষ মাতামাতি করার কোন কারণ নেই। আমরাই সর্বশেষ দল। তাই অভ্যর্থনা জীর্ণ, আয়োজন নেই। বৃষ্টি-ধোওয়া কয়েকটা প্রাচীরপত্রে বাসিফুলের শুকনো মালায় আমাদের তৃপ্ত থাকতে হয়। লোকজনেরা আমাদের দিকে বড় একটা ফিরেও তাকায় না। আমাদের মত লোকদের দেখে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে প্রত্যাবর্তন আমাদের পক্ষে একটা অভিনব ব্যাপার। যতই আমরা ভান করি যে তারা আমাদের পানে না তাকালে কিছু আসে যায় না, তবু মনের গহনে আমরা তাদের বন্ধুত্বব্যঞ্জক দৃষ্টি কামনা করি। মেয়েরা অন্ততঃ দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আমাদের অভিবাদন জানাতে পারে। মাঝে মধ্যে জাদেন আর জাপ মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় না। আমাদের যে ভীতিপ্রদ দেখায় তাতে সন্দেহ নেই। তাই শেষ পর্যন্ত তারা এই প্রচেষ্টা ত্যাগ করে।

কেবল বাচ্চারা আমাদের সঙ্গ নেয়। আমরা তাদের হাত ধরি আর তারা আমাদের পাশে পাশে দৌড়ায়। আমরা তাদের চকোলেট দেই—অবশ্য কিছু চকোলেট আমরা বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই। এডলফ বেথকি একটা ছোট মেয়েকে কোলে তুলে নেয়। মেয়েটা তার দাড়ি ধরে টানে; দাড়িটা যেন লাগাম। তার মুখ ভেংচিতে মেয়েটা আনন্দে হাসে। মেয়েটা ছোট হাতে তার মুখে চাপড় দেয়। মেয়েটার হাত কত ছোট, আমাকে তা দেখাবার জন্য সে একটা হাত ধরে ফেলে। সে আর মুখ ভেংচি দেয় না বলে মেয়েটা কাঁদতে শুরু করে। এডলফ তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে; কিছুতেই তার কান্না থামেনা বরং আরও চেঁচিয়ে কাঁদে। মেয়েটাকে তাই সে নামিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

"আমরা পুরোপুরি ভূত হয়ে গেছি মনে হয়" কসোল মন্তব্য করে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এমন মুখ দেখলে কে আর ভয় পাবে না?" উইলি ব্যাখ্যা করে, "আতঙ্কে এদের শরীর শির শির করে।"

"আমাদের গায়ের রক্তে যে দুর্গন্ধ আছে, তাতেই এরা ভয় পায়," ব্রেয়ার ক্লাও কণ্ঠে বলে। "বেশ, এবার খুব ভালো করে মেজে ঘষে গোসল করতে হবে," জাপ জওয়াব দেয়, "তা হলে হয়ত মেয়েরা আমাদের প্রতি আগ্রহী হবে।"

"হ্যাঁ, যদি গোসলই এই অনাগ্রহের একমাত্র কারণ হতো।" লুদভিগ বিষন্ন কণ্ঠে মন্তব্য করে।

আমরা উদাস অবসন্নভাবে পথ চলতে থাকি। যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘ কাল যাপনের পর এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে আমাদের অন্য রকম কল্পনা ছিল। আমরা কল্পনা করছিলাম, জনসাধারণ আমাদের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করবে। কিন্তু এখন দেখছি, প্রত্যেকেই আপন ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। জীবন প্রবাহ চলছে, চলবে। এই প্রবাহ আমাদের পিছনে ফেলে চলছে। আমরা যেন উদ্বৃত্ত অপ্রয়োজনীয়। এই গ্রামটা অবশ্য জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবু এই নৈরাশ্য অসহনীয় অমঙ্গলের পূর্বাভাষ আমাদের উপর ছায়া বিস্তার করে।

গরুর গাড়ীগুলো ঘর্ঘর করে চলে যায়। গাড়োয়ানেরা চেঁচামেচি করে। পথচারী একবার চোখ তুলে চায়; তারপর আপন চিন্তায় আপন সমস্যায় মগ্ন হয়ে যায়। গীর্জার ঘড়ি থেকে মহাকাল খসে খসে পড়ছে,

বৃষ্টিভেজা বাতাস আমাদের শুঁকে শুঁকে বয়ে যাচ্ছে, সৈন্য সারির সঙ্গে এক বৃদ্ধা ছুটোছুটি করছে আর আর্তকম্পিত কণ্ঠে জনৈক এরহার্ড স্লিথের সন্ধান করছে।

এক প্রকাণ্ড বহির্বাটিতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এলেও আমাদের মধ্যে কেউ বিশ্রাম সুখ চায় না। আমরা একটা সরাইয়ে যাই।

এখানে প্রচুর জীবন চাঞ্চল্য আর এ বছরের চোলাই করা টাটকা মদ রয়েছে। এই মদ সুস্বাদু আর মাতালকরা। এই মদ্য পানে পা টলে। তাই এখানে বসে থাকাটাই তৃপ্তি। তামাকের ধোঁয়ার মেঘে ঘরটা আচ্ছন্ন। এই মদে মাটি আর গ্রীষ্মের গন্ধ। আমরা টিনে সংরক্ষিত মাংস বের করি। টুকরো টুকরো করে কেটে মাখন লাগানো রুটি খাই। প্রদীপগুলো মায়ের স্নেহের মতন আমাদের উপর স্নিগ্ধ আলো বিস্তার করে ।

রাত্রি পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলে; অবশ্য ফ্রণ্ট লাইনের ট্রেঞ্চ জীবনে নয়, শান্তি কালে। বিকেল বেলায় নৈরাশ্যজর্জরিত হয়ে আমরা এখানে পৌঁছেছিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছি। যে ছোট ব্যাণ্ড এতক্ষণ ঘরের কোন থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করছিলো, সেই দলে আমাদের মধ্য থেকে জনকয়েক যোগদান করে। কেউ পিয়ানো বাদক, কেউ মাউথ অর্গেনে পারদর্শী। একজন পিয়ানো বাদকও আছে। উইল হোমেয়ার প্রকাণ্ড দুটো হাঁড়ির ঢাকনা নিয়ে এসে একই সঙ্গে করতাল, কেটলড্রাম আর রেটল্ হিসেবে বাজাতে শুরু করে।

কিন্তু মদের চেয়ে আজ আমাদের মেয়ে মানুষের প্রতি আগ্রহ প্রবলতর। আজ অপরাহ্নে যে-সব মেয়েদের আমরা যেমনটি দেখেছি, এখানকার মেয়ে মানুষগুলো তাদের থেকে ভিন্ন! এরা হেসে আমাদের খুশী করতে চায়। এরা হয়ত ভিন্ন ধরনের মেয়ে। কত কাল হলো, আমরা মেয়ে মানুষের সঙ্গ পাইনি!

প্রথম দিকে আমাদের মনে যুগপৎ আগ্রহ আর সঙ্কোচ জাগে। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি না, এদের সঙ্গে কেমন করে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেব আমরা যেন তা ভুলে গেছি। শেষ পর্যন্ত ফার্ডিন্যাণ্ড কসোল এক স্থূলাঙ্গিনী মেয়ে মানুষের সঙ্গে ওয়ালজ নৃত্যে নেমে পড়ে। তার স্তনদ্বয় এমনি বিশাল যে ফার্ডিন্যাণ্ড তার বন্দুকটা

অনায়াসে এই স্তনে হেলান দিয়ে রাখতে পারে। এবার অন্যরা ফার্ডি-ন্যাণ্ডের অনুসরণ করে।

মদের তীব্র মধুর নেশা আমাদের দেহে মনে ক্রিয়া করতে থাকে। মেয়েরা ঘুরে ঘুরে নাচে, সঙ্গীত বাজতে থাকে, আমরা কয়েকজন ঘরের এক কোণে বেথকিকে ঘিরে উপবিষ্ট। "বন্ধুরা আমার," সে বলে উঠে, "কাল বা পরশু আমরা ঘরে পেঁছিব। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী—দশটি মাস হয়ে গেলো—"

টেবিলের উল্টো দিকে আমি ভ্যালেন্টিনের সঙ্গে আলাপ করছি। সে শ্রেষ্ঠমন্যতাবোধ নিয়ে মেয়েদের পানে চেয়ে আছে। তার পাশে এক তরুণী বসে আছে। সে কিন্তু এই তরুণীর প্রতি নিস্পৃহ। সামনের দিকে হেলান দিতেই টেবিলের কোণে লেগে আমার পকেটের অভ্যন্তরে একটা কিছুতে চাপ লাগে। জিনিসটা কি তা জানার জন্য পকেটে হাত দেই। ভেসলিং এর ঘড়িটা। জাপ সবচেয়ে মোটা মেয়ে মানুষটাকে বাগিয়েছে। প্রশ্ন-বোধক চিহ্নের মতন সে মেয়েটার সঙ্গে নাচছে। মেয়েটার বিরাট নিতম্বে হাতের থাবাটা স্থাপন করে সে তাতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে পিয়ানো বাজাচ্ছে আর মেয়েটা তার পানে চেয়ে হাসছে। জাপ ক্রমশঃ সাহস সঞ্চয় করে অবশেষে মেয়েটাকে নিয়ে নাচতে নাচতে বাইরে উধাও হয়ে যায়।

মিনিট কয় পর আমি বেরিয়ে প্রাঙ্গণের নিকটতম কোণের দিকে অগ্রসর হই। সেখানে এক ঘর্মাক্ত কলেবর সার্জেণ্ট একটা মেয়েকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বাগানের দিকে পা বাড়াতেই পিছনে একটা প্রচণ্ড হুড়মুড় শব্দ শুনতে পাই। ফিরে দেখি জাপ সেই স্থূলাঙ্গীকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাদের দু জনের দেহের ভারে টেবিলটা ভেঙ্গে পড়েছে। আমাকে দেখে সে অট্টহাস্য করে জিভ কাটে, তারপর দুঃখে বিরক্তিতে বিড় বিড় করে। আমি দ্রুত পদে একটি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাই; যেতে যেতে কার যেন হাত মাড়িয়ে দেই। কী নারকীয় রাত্রি। "দেখে পথ চলতে পার না গরু কোথাকার?" এক, কঠোর গম্ভীর কণ্ঠে গালাগালি শুনতে পাই।

"কেমন করে জানব এখানে কোন সরীসৃপ জাতীয় জীব পড়ে আছে?" আমিও সমুচিত জওয়াব দিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা নির্জন কোণ বেছে নেই।

ধোঁয়াচ্ছন্ন ঘরের বাইরে এখানকার স্নিগ্ধ বাতাস দেহ মন জুড়িয়ে দেয়। আনত বৃক্ষ শাখা-প্রশাখার নীচে কল-কোলাহলমুক্ত শান্তিতে আমি প্রস্রাব করতে দাঁড়াই।

আলবার্ট এসে আমার পাশে দাঁড়ায়। চারদিকে জ্যোৎস্নার প্লাবন। আমাদের প্রগ্রাব রজত শুভ্র।

"চমৎকার লাগছে আর্নস্ট, তাই না?" আলবার্ট বলে।

আমি মাথা দুলিয়ে তার কথার সায় দেই। আমরা কতকক্ষণ চাঁদের পানে চেয়ে থাকি।

"যুদ্ধের বিশ্রী কাণ্ড-কারখানা শেষ হয়েছে ভাবতে, তাই না আলবার্ট? "আমি শপথ করছি—"

পিছনে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে ক্যাচক্যাচ মচমচ আর নারী কণ্ঠের হাসির শব্দ আসছে আর সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাচ্ছে। আজকের রাত্রিটা বজ্রক্ষুব্ধ ঝড়ের মতন, প্রাণ চাঞ্চল্যে দুরন্ত, উচ্ছল উজ্জ্বল।

উদ্যান প্রাঙ্গণে কে একজন যন্ত্রণায় কাতরায় আর সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি শোনা যায়। ছায়া মূর্তি খড়ের গাদার চূড়ায় উঠছে, দুজন মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে। পুরুষটা পাগলের মতন মেয়েটার স্কার্টের অভ্যন্তরে মাথা ঢুকিয়ে আধো-আধো কি বলছে আর মেয়েটা এমনি ঝাঁঝালো ,আর কাংস্য কণ্ঠে হাসে যে তাতে আমাদের স্নায়ুতে চোট লাগে। আমার শিরদাঁড়া শিউরে ওঠে। গতকাল আর আজ, মৃত্যু আর জীবন কত কাছাকাছি বিরাজ করছে।

জাদেন অন্ধকার উদ্যান থেকে ঘর্মাক্ত কলেবরে বেরিয়ে আসে, কিন্তু তার মুখাবয়ব আনন্দোজ্জ্বল। টিউনিকের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলে, "আহ, এবার আবার বেঁচে থাকার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারছি।"

বাড়িটা এক চক্কর ঘুরতে গিয়ে উইলি হোমেয়ারকে আবিষ্কার করলাম। শুকনো আগাছা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে কয়েক মুঠো গোল আলু এখান-ওখান থেকে সংগ্রহ করে তাতে ফেলে দিয়েছে। সে আগুনের পাশে একাকী বসে নিরিবিলি স্বপ্নের জাল বুনছে আর আলুগুলোর সেঁকার প্রতীক্ষা করছে। কুকুরটা তার পাশে বসে পাহারা দিচ্ছে। তার কাছাকাছি কয়েকটা আমেরিকান কাটলেটের টিন। 'আগুনের ঝলকানিতে তার মাথার লাল চুল তামাটে দেখাচ্ছে। প্রান্তর থেকে কুয়াশা আসছে। তার পাশে বসে আমরা আগুন থেকে আলু উঠিয়ে নেই। আলুর খোসা আগুনের তাপে ঝলসে কালো হয়ে গেছে। কিন্তু ভিতরটা সোনালী আর সুগন্ধ। আমরা কাটলেটগুলো দু হাতে মাউথ অর্গেনের মতন দাঁতে চেপে ধরি।

গোল আলু! কত সুস্বাদু! সত্যি আমরা কোথায় আছি? পৃথিবীটা কি আবার নিজের গতিপথে ফিরে এসেছে? আমরা যেন আবার কৈশোরে ফিরে টরলকসটেনের মাঠে বসে আছি। আমরা না সেই সোঁদা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সারাদিন আলু তুলতাম আর আমাদের পিছনে নীল রঙচটা নীল পোশাক পরা মেয়েরা সেই আলু ঝুড়িতে ভরতো? আর এখন আলু পোড়া আগুন, সাদা কুয়াশা মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়ছে, আর আগুনে পট পট শব্দ হচ্ছে। বাকী সবকিছু নিস্তব্ধ; আলুই এখন শেষ ফসল। সব আলু তোলা হয়ে গেছে, মাঠ শূন্য, বায়ু নির্মল, ফসল তোলার মওসুমের অবসান। শৈশবের সেই মধুর দিনগুলো। আমরা আবার সেই দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছি। যুদ্ধ শেষ, হয়ে গেছে। আবার আলু পোড়া আগুন জ্বলছে, ফসল তোলার মওসুম আসছে। জীবনোপভোগের দিন আসছে।

"আহ উইলি! আমার বন্ধু উইলি!"

"এই ত আসল জিনিস।" সে উপরের দিকে তাকিয়ে বলে। তার হাতভর্তি গোল আলু আর গোশত। হায়রে মাথা মোটা। আমি অন্য একটা ভাবনা ভাবছিলাম।

আগুন নিভে গেছে। উইলি তার প্যান্টে হাতটা মুছে চাকুটা বন্ধ করে। গাঁয়ের ভিতর কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে—অন্য কোন শব্দ নেই, শেল বিস্ফোরণের শব্দ নেই। অস্ত্রের ঝনঝন নেই। এম্বুলেন্সের ঘর্ঘর নেই। গেলো চার বছরের প্রতি রাত্রে যত মানুষ মারা গেছে আজ রাত্রে তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক মানুষ মরবে।

আমরা সরাইয়ে ফিরে যাই, কিন্তু সেখানে আজ বিশেষ কর্মচাঞ্চল্য নেই। ভ্যালেনটিন তার গায়ের টিউনিকটা খুলে ফেলে বার কয় হাতের উপর দাঁড়ায়, মেয়েরা প্রশংসায় হাত তালি দেয়, কিন্তু ভ্যালেনটিন তুষ্ট নয়। "এক কালে আমি একজন উঁচু দরের ব্যায়াম কুশলী ছিলাম কাডিন্যাও, কিন্তু আমার এখনকার ব্যায়াম কৌশল গাঁয়ের মেলাতেও অচল।" সে বিষণ্ণ কণ্ঠে কসোলকে বলে, "দেহের গ্রন্থিগুলো শক্ত হয়ে গেছে। এক কালে এই ভ্যালেনটিনের হরাইজেন্টেল বার খেলা দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতো, আর এখন আমাকে বাতে ধরেছে—"

"রেখে দাও এসব কথা। তোমার হাড়গুলো যে এখনও টিকে আছে সে জন্য কৃতজ্ঞ থাক।" কথাগুলো বলে কসোল টেবিলে কিল মারে। "উইলি! এবার সঙ্গীত হোক।"

হোমেয়ার কেবল ড্রাম আর র‍্যাটল বাজতে শুরু করে। পরিবেশটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করে। মোটা মেয়েটার সাথে তার্ কেমন জমলো জাপকে জিজ্ঞেস করি। ঘৃণা বিরক্তিতে সে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। আমি বিস্মিত হয়ে বলি, "বলছ্ না কেন? ব্যাপারটা খুব অপ্রত্যাশিত, তাই না?"

সে মুখ ভেংচি কেটে বলে, "হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম, আমাকে তার ভালো লেগেছিলো, কিন্তু জান? সেই কুত্তিটা কিনা শেষ পর্যন্ত আমার কাছে পয়সা চেয়ে বসলো। তার কথায় আমি মনে মনে এমনি মানসিক আঘাত পেলাম যে হঠাৎ দুম করে টেবিলে আমার পা টা লেগে গেলো। এখন পর্যন্ত হাঁটতে আমার কষ্ট হচ্ছে।"

লুদভিগ ব্রেয়ার বিমর্ষ মুখে নীরবে একটা টেবিলে বসে আছে। অনেক আগেই তার ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিলো। কিন্তু সে ঘুমোবে না। তার বাহুর ক্ষতটা বেশ সেরে উঠেছে, আমাশয়ও অনেকটা ভালোর দিকে, কিন্তু তবু সে নিজকে নিয়ে অশান্তিতে আছে।

জাদেন তাকে বলে, "লুদভিগ, তোমার অন্ততঃ অল্পক্ষণের জন্য হলেও একাধিকবার বাগানে যাওয়া উচিত—এই কাজটা সর্ব রোগের ধন্বন্তরি—"

লুদভিগ মাথা নেড়ে আরও বিমর্ষ হয়ে যায়। আমি তার পাশে বসে পড়ি। "বাড়ি ফিরছ, তাতে তোমার খুশী লাগছে না?" আমি তাকে প্রশ্ন করি।

সে নীরবে সরে পড়ে। আমি কারণটা বুঝতে পারি না। পরে দেখতে পাই সে একাকী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আর কোন প্রশ্ন না করে আমি নীরবে ভিতরে প্রবেশ করি।

দোর-গোড়ায় লেদারহোজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। সে মোটা মেয়ে মানুষ-টাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। জাপ বিদ্বেষের হাসি হেসে ফোড়ন কাটে "এর কপালে অপ্রত্যাশিত বিস্ময় রয়েছে।"

"বরং মেয়েটার কপালে," উইলি সংশোধন করে। তুমি কি মনে কর একটা আধ পেনি দেয়ার মুরদ আর্থারের আছে?"

টেবিলে অঢেল মদ। প্রদীপ জ্বলছে, মেয়েদের স্কার্ট উড়ছে। আমি ক্লান্ত, মাথাটা আমার আস্তে আস্তে টেবিলের উপর ঢলে পড়ে—গ্রামাঞ্চলের

উপর দিয়ে চলন্ত ট্রেনের মতন রাত্রিটা স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা অনতিবিলম্বে স্বদেশের মাটিতে পৌঁছে যাই।

(৩)

শেষ বারের মতন আমরা ব্যারাক প্রাঙ্গণে সমবেত হই। কোম্পানীর একাংশ এখানকার আশেপাশে বাস করে। এখানেই তাদের সেনাবাহিনী থেকে বিদায় দেয়া হচ্ছে। আমাদের অবশিষ্ট যারা তাদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে। কারণ ট্রেন চলাচল এমনি অনিয়মিত যে এক সঙ্গে আমাদের সবাইকে এখান থেকে পাঠানো যাবে না। এবার আমাদের পরস্পর থেকে বিদায় নেয়ার পালা।

ধূসর বিস্তীর্ণ স্কোয়ারটা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রকাণ্ড। বিবর্ণ নভেম্বর মাসের বাতাস বইছে, বাতাসে অবক্ষয় আর মৃত্যুর গন্ধ। আমরা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে। এই বিবর্ণ বিস্তীর্ণ স্কোয়ারটা আমাদের মনে করুণ স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। স্মৃতির অতলে শায়িত রয়েছে বহু সৈন্যের অদৃশ্য মৃত দেহ।

হীল কোম্পানীর পাশ দিয়ে চলে যায়। তাকে অনুসরণ করে তার পূর্বসুরীদের স্মৃতির ভৌতিক মিছিল। তার ঠিক পিছনে চলছে বেৰ্টিঙ্ক। এখনও তার গ্রীবাদেশ বেয়ে রক্ত ঝরছে। থুৎনিটা বেঁকে গেছে, দৃষ্টি তার আর্ত করুণ। সে দেড় বছর কাল কোম্পানী কমাণ্ডার ছিলো। যুদ্ধের আগে সে ছিলো একজন শিক্ষক, বিবাহিতা চার সন্তানের জনক। ঠিক তারই পশ্চাতে চলছে বিবর্ণ মুখ মূলার—বয়েস মাত্র উনিশ, কোম্পানী কমাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র তিন দিন পর গ্যাস বোমায় আহত হয়ে মারা যায়। তারপরে রয়েছে রেডেকার, একজন প্রাক্তন বন বিভাগের কর্মচারী। দু সপ্তাহ পর বোমার সরাসরি আঘাতে মাটির তলে মিশে যায়। আরও পরে আছে আরও বিবর্ণ মুখ ক্যাপটেন বুটনার; আক্রমণকালে হৃৎপিণ্ডে মেশিনগানের গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। তারপর আসে অজ্ঞাত নামা নিহতদের মিছিল। এই মিছিলে সামিল হয়েছে গেলো দুই বছরে নিহত সাতজন কোম্পানী কমাণ্ডার আর পাঁচশত সৈনিক. এখন এই স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে আছে অবশিষ্ট মাত্র বত্রিশজন।

বিদায় উপলক্ষে হীল দু এক কথা বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। তাই তাকে বাধ্য হয়ে থামতে হয়। এই জনবিরল

নিস্তব্ধ স্কোয়ারে খাকি পোশাক পরা বন্ধু বিয়োগের ব্যথায় ব্যথাতুর জনকয়েক নির্বাক জীবিত শ্রোতার সামনে বলার মতন কোন কথা থাকতে পারে না।

হীল যেতে যেতে একের পর একের কর মর্দন করে। ম্যাকস ওয়েলের সামনে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, "এবার তোমার সুদিন ওয়েল—"

"এবার রক্তারক্তি কম হবে" ওয়েল শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দেয়। "আর কম বীরত্বপূর্ণ" হীল বলে।

"বীরত্বই জীবনে এক মাত্র কাম্য নয়," ওয়েল বলে, "তবে সর্বোত্তম ; আর কি ই বা আছে?" হীল বলে। ওয়েল এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলে, "লেফটান্যাণ্ট মহোদয়, প্রেম. দয়ামাখা কথাগুলো আজ কাল বড় দুর্বল ও তাৎপর্যহীন শোনায়, তবে এগুলোতেও বীরত্ব আছে।"

"নেই," চট করে হীল জওয়াব দেয়, যেন এ ব্যাপারে সে আগেই অনেক ভাবনা-চিন্তা করে রেখেছে। তার চোখে কালো ছায়া নেমে আসে। "ওগুলো শহীদত্ব প্রাপ্তির সুযোগ দেয় মাত্র। এটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। যুক্তির যেখানে শেষ, বীরত্বের যেখানে সূচনা। তখন জীবনের মূল্য কমে যায়। বীরত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নির্বুদ্ধিতা, উল্লাস আর বিপদাশঙ্কা, তা তুমি ভালো করেই জান। তবে তাতে কোন অভীষ্ট লক্ষ্য নেই। কেন কোন কারণে এই বীরত্ব? কোন অভীষ্ট সাধনে এই বীরত্ব? এসব প্রশ্ন যারা করে তারা এসম্বন্ধে কিছুই জানে না।"

হীল জোর দিয়ে এ কথাগুলো বলে যায়, যেন নিজকেই সে এই বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করতে চায়। তার ক্লান্ত মুখে তা প্রকাশিত হয়। এই কয়দিনে তার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে গেছে; তাকে আগের চেয়ে বয়স্ক দেখায়। ওয়েলেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে সে সবার অলক্ষ্যে থাকত। কেউ তাকে ভালোভাবে বুঝতে পারতো না, কিন্তু অধুনা সে সবাইকে পিছনে ঠেলে সামনে এগিয়ে এসেছে এবং প্রতি মিনিটে স্থিরনিশ্চয় আর আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠছে। আগে কেউ কোন দিন ভাবেনি যে সে এমনিভাবে কথা বলতে পারে। হীল তই উত্তেজিত হয়, ম্যাকস ততই শান্ত হয়। সে দৃঢ় চিত্তে শান্ত কণ্ঠে বলে, "লাখো লাখো মানুষের দুঃখ-দুর্দশার বিনিময়ে মাত্র গুটিকয় ব্যক্তির বীরোচিত আচরণের মূল্যটা বড্ড বেশি।"

হীল কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, "মূল্য—অভীষ্ট লক্ষ্য—মূল্য প্রদান—এগুলো তোমার কথা। আমরা দেখব এসব কথা তোমাকে কোথায় কতদূরে নিয়ে যায়।

ওয়েল হীলের পরণে এখনও একজন সাধারণ সৈনিকের পোশাক দেখে বলে, "আর তোমাকেই তোমার কথা কত দূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে ?"

ক্রোধে হীলের মুখমণ্ডল লাল হয়ে যায়। সে রুষ্ট কণ্ঠে বলে, "একটা স্মৃতিতে, অতীতের স্মৃতিতে যা অর্থের বিনিময়ে লভ্য নয়।"

ওয়েল এক মুহূর্ত নীরব থাকে, "একটা স্মৃতিতে" কথাটা পুনরাবৃত্তি করে ; তারপর জনশূন্য স্কোয়ার আর আমাদের অত্যল্প সংখ্যক লোকের দিকে তাকিয়ে বলে, "হ্যাঁ, একটা কঠোর দায়িত্বে।"

আমরা এসব কথা বড় একটা বুঝি না। আমরা কথা বলা অপ্রয়োজনীয় মনে করি। কথায় পৃথিবীর রূপ বদলাবে না।

আমাদের সারি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এবার বিদায় গ্রহণ শুরু হয়। মূলার আমার পাশে দণ্ডায়মান। তার বোঝাটা কাঁধে আর রেশনের গাঠরীটা বগলে। সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "এবার চলি. ভাগ্য তোমার সুপ্রসন্ন হোক আর্নস্ট।"

"তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক ফেলিকস।" সে একে একে উইলি. আলবার্ট আর কসোলের কাছে যায়। এবার জেরার্ড পহল আসে। আমাদের কোম্পানীর গায়ক। মার্চ করার সময় সে চড়া সুরটা গাইতো, অন্যরা যখন খাদের সুর গাইতো, তখন সে বিশ্রাম নিতো যাতে চড়া সুর গাইবার সময় সে আবার তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেত পারে। তার আঁচিল চিহ্নিত তামাটে মুখটা যন্ত্রণাকাতর দেখায়। এই মাত্র তার স্ক্যাট খেলার সাথী কার্ল ব্রোগারের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এতে তার মর্মে আঘাত লেগেছে।

"বিদায়, আর্নস্ট—"

"বিদায়, জেরার্ড—" সে চলে যায়।

ওয়েডেক্যাম্প এবার তার হাত এগিয়ে দেয়। যুদ্ধে নিহতদের জন্য সে ক্রুশ তৈরি করতো, "আমার দুঃখ রইলো আর্নস্ট, আমি আর কখনও তোমাকে সাজাতে পারব না। তুমিও একটা মেহগনি কাঠের ক্রুশ পেতে পারতে। আমি তোমার জন্য একটা মেহগনি কাঠের পিয়ানোর চমৎকার ঢাকনার টুকরো বাঁচিয়ে রেখেছিলাম"—সে বলে, "সময় পেলে সবকিছুই হবে," "আমি হেসে জওয়াব দেই। "সময় এলে আমি তোমাকে চিঠি লিখে জানাব।"

সে হাসে, "তাই ভালো। হেসে খেলে যাও। যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।"

মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে সে ধীর দুলকি চালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রথম দলটি ইতিমধ্যেই ব্যারাক গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে। শেফলার, কালবেগুার, তরুণ লুকে এবং আগষ্ট বেকম্যান এই দলে রয়েছে। অন্যরা তাদের অনুসরণ করে। আমাদের মন খারাপ হতে শুরু করে। এতগুলো লোক চিরতরে চলে যাবে তা ভাবতেও প্রথম দিকে কষ্ট হয়। এর আগে মৃত্যু, জখম বা সাময়িক বদলীর দরুনই কেবল কোম্পানীর লোকসংখ্যা কমেছে। তবে এখন শান্তি—তা বিবেচনা করতে হবে।

শেল-গহ্বর আর ট্রেঞ্চ দেখে দেখে আমরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, এখন সহসা নিস্তব্ধ সমতল সবুজ প্রান্তর দেখে আমাদের সন্দেহ জাগে। হয়ত এটা মাইন-পোতা অঞ্চলে যেতে আমাদের প্রলুব্ধ করার জন্য একটা ফন্দী মাত্র।

ঐ ত আমাদের সাথীরা দ্রুত পদে সেখানে যাচ্ছে। কারো কথায় কর্ণপাত না করে যাচ্ছে। একাকী নিরস্ত্র ; হাতে রাইফেল নেই, হাতে বোমা নেই। ইচ্ছে হয় তাদের পিছনে পিছনে ছুটে গিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনি। তাদের চেঁচিয়ে বলি, "ওহে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? কিসের পিছনে তোমরা ছুটছ? তোমরা যে আমাদের দলের লোক, আমাদের সাথী। আমরা এক জায়গায় থাকব, নইলে আমরা বেঁচে থাকব কেমন করে?"

মাথায় অদ্ভূত চিন্তার ঘূর্ণন। অনেক দিন সেনাবাহিনীতে অবস্থানের ফল।

ব্যারাক স্কোয়ারে নভেম্বরের বাতাস শোঁ শোঁ বইছে। আরও আরও বন্ধুরা চলে যায়। অনতিবিলম্বে সবাই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে।

কোম্পানীর যারা অবশিষ্ট রইলো তারা একই পথ ধরে যাবে। আমরা এখন ট্রেনের প্রতীক্ষায় রেল স্টেশনে শুয়ে বসে আছি। জায়গাটা এখন বাক্স পেটারায় ঠাসা একটা সামরিক গুদাম। সাত ঘন্টায় দুটো মাত্র ট্রেন এইখান দিয়ে যায়। লোকে লোকারণ্য। ট্রেনের দরজায় পর্যন্ত আরোহীরা বাঁদর-ঝোলা ঝুলে আছে। অপরাহ্ন পর্যন্ত আমরা ট্রেনে উঠা-নামার পথের পাশে জায়গা করে নেই। বিকেলের আগে একেবারে সামনে অবস্থান গ্রহণ করি।

দুপুরের পরেই প্রথম ট্রেনটা আসে। অন্ধ অশ্বে বোঝাই একটা মালবাহী ট্রেন। অশ্বগুলোর চোখের তারা নীলচে সাদা, তারার চারপাশে রক্তিম আবেষ্টনী। প্রাণীগুলো নিথর নিস্পন্দ ; নাসারন্ধ্রের ঈষৎ কম্পন থেকে মাত্র বোঝা যায় এগুলো জীবিত আছে।

অপরাহ্নে একবার ঘোষণা করা হয় যে আজ আর কোন ট্রেন আসবে না।

ঘোষণা শুনে কেউ নড়ে চড়েনা। সৈনিকেরা ঘোষণায় বিশ্বাস করে না। আসলে আর একটা ট্রেন সত্যি আসে। এক নজরই যথেষ্ট। এতেই হবে। ট্রেনটা আধ-বোঝাই।

স্টেশনটা কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রতীক্ষা-কক্ষ থেকে যাত্রীর দল নিজেদের গাঠরী-বোচকা নিয়ে হুড়োহুড়ি করে অন্যদের মাড়িয়ে ধাক্কিয়ে ট্রেনের দিকে ধাবিত হয়। তুমুল হট্টগোল, তুলকালাম কাণ্ড।

ট্রেনটা মন্থর গতিতে এগিয়ে আসে। একটা জানালা খোলা। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে রোগা পটকা আর ক্ষিপ্রগতি ট্রটস্কিকে আমরা উপরে তুলে ধরি। সে অতিকষ্টে বানরের মত জানালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে।

পর মুহূর্তেই সবগুলো দরজার যাত্রীদের ভীড় জমে যায়। সবগুলো জানালাই বন্ধ। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকগুলো জানালা রাইফেলের কুঁদার ঘায়ে ভেঙ্গে গেছে। অনেকে হাতে পায়ে জখমের বিনিময়েও গাড়ীর কামরায় প্রবেশ করার জন্য বদ্ধপরিকর। জানালার ভাঙ্গা কাঁচের উপর কম্বল বিছিয়ে দিয়ে তারা চলন্ত গাড়ীর কামরায় প্রবেশ করতে থাকে।

ট্রেনটা এবার থেমে যায়। আলবার্ট করিডোর দিয়ে ঘুরে গিয়ে আমাদের সামনের জানালাটা পুরোপুরি খুলে দেয়। জাদেন আর কুকুরটা প্রথম ক্ষিপ্রগতিতে ঢোকে। তারপর কসোল আর বেথকি। উইলি পিছন দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাদের ঢুকতে সাহায্য করে। এই তিনজন মিলে তখন দুদিক দিয়ে কামরার দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়। তারপর লুদভিগ, লেদারহোজ, ভ্যালেনটিন, কার্লব্রেগোর আর আমি মালপত্র নিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করি। সব মালপত্র উঠেছে কিনা তার তদারক করে সব শেষে উইলি ওঠে।

"সব উঠেছে?" কসোল ভিতরের চলাচল পথে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে। "সবাই উঠেছে।" উইলি চেঁচিয়ে জওয়াব দেয়। এখন

চলাচল পথে চাপ বেড়েছে। এবার বেথকি, কসোল আর জাদেনে গুলির মতন সবেগে গিয়ে তাদের আসন দখল করে। বাইরের অন্যান্য যাত্রীরা এতক্ষণে সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করে কামরায় প্রবেশ করে, মালপত্রের স্তূপের উপর পর্যন্ত তারা আশ্রয় নেয়। কামরায় এক ইঞ্চি স্থানও ফাঁকা নেই।

ইঞ্জিনে পর্যন্ত যাত্রীরা চড়াও হয়। ছাদে পর্যন্ত ভীড়। গাড়ির গার্ড চেঁচায়, "ছাদ থেকে নেমে পড়ুন। শেষ পর্যন্ত মাথার খুলি ভাঙ্গবে।" "তুমি চুপ কর বলছি" যাত্রীদের থেকে জওয়াব আসে। পাঁচজন যাত্রী পায়খানার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে। একজনের দেহের পশ্চাদ্দেশ জানালা দিয়ে বেরিয়ে আছে।

ট্রেন ছেড়ে দেয়। যারা একটা কিছু শক্ত করে ধরেনি, তারা ঝাঁকুনিতে পড়ে যায়। দুজন চাকার তলে পড়ে পিষ্ট হয়। গাড়ির চাকা তাদের দেহপিণ্ড ঠেলে হেঁচড়ে নিয়ে যায়। অন্যরা যারা পারে, আবার লাফ দিয়ে উঠে তাদের নিজেদের স্থান দখল করে। গাড়ির পা-দানও যাত্রীতে ভরা। গাড়ি চলতে চলতে ভীড় আরও বাড়তে থাকে।

একটা লোক দরজার পাল্লা ধরে ঝুলছে। দরজা দোলার সঙ্গে সঙ্গে সেও দোলে। উইলি লোকটার জামার কলার ধরে লোকটাকে ভিতরে উঠিয়ে নেয়।

রাতে আমাদের কামরায় প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে। একটা নীচু সুরঙ্গ পথ অতিক্রম করার সময় কয়েকজন যাত্রী ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। অন্যদের চোখের সামনে এই বীভৎস দুর্ঘটনা ঘটলেও তারা নিরুপায়, কারণ ট্রেনকে থামাবার কোন উপায় নেই। পায়খানার জানালায় বসা লোকটাও ঘুমন্ত অবস্থায় বাইরে পড়ে যায়।

অন্যান্য কামরায়ও এমন দুর্ঘটনা ঘটে। তাই এবার ছাদের চারদিকে রশি দিয়ে কাঠের তক্তা বেঁধে দেয়া হয় আর সময়মত সতর্ক করে দেয়ার জন্য সান্ত্রী স্থাপন করা হয়।

আমরা ঘুমোই আর ঘুমোই—দাঁড়িয়ে, শুয়ে বসে, বাক্সের উপর। যে যেখানে পারে, যে অবস্থায় পারে ঘুমোই। ট্রেন খট খট কট কট করে চলতে থাকে। বাড়িঘর, বৃক্ষলতা পাশ দিয়ে চলে যায়। মিছিল, লাল নিশান, রেলওয়ে প্রহরী, সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা আর বিপ্লবের চিৎকার ধ্বনি পেরিয়ে গাড়ি চলে। এই প্রথম আমরা বুঝতে পারি গেলো চার বছরে আমরা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

সন্ধ্যা নামে, কামরায় একটা বাতি টিম টিম করে জ্বলছে। ট্রেনটা ধীর মন্থর গতিতে চলছে। আর ইঞ্জিনের গোলমালের দরুন বার বার থেমে যাচ্ছে।

আমাদের বাক্স-পেটরাগুলো গাড়ির ঝাঁকুনিতে দোলে। কুকুরটা আমার হাঁটুর উপর ঘুমিয়ে আছে। এডলফ বেথকি আমার উপর হেলান দিয়ে কুকুরটার মাথায় হাত বুলোচ্ছে। "আহ, ভাইত আর্নস্ট, শেষ পর্যন্ত আমাদের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে।"

আমি মাথা নাড়ি। এডলফ ছাড়া জীবন আমি কল্পনা করতে পারি না,—তার সযত্ন দৃষ্টি, শান্ত কণ্ঠ। এডলফ আর আমি যখন রংরুট হিসেবে ফ্রণ্টে আসি, তখন সে-ই আমাকে সবকিছু শিখিয়েছে। সে তখন না থাকলে আমি এখন এখানে থাকতাম না।

"আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ ত হবেই আর তা প্রায়ই হবে।"—আমি তাকে বলি।

একটা বটের গোড়ালী আমার মুখে লাগে। আমাদের মাথার উপরের তাকে বসে যাদেন মনোযোগ সহকারে তার পয়সা গুনছে। সে স্টেশন থেকে সরাসরি কোন পতিতালয়ে যাবে। এ কাজের সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতির জন্য সে দুজন চাষী মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম লীলার কাহিনী আমাদের শোনায়। এটাকে অশ্লীল বলে আর কেউ মনে করে না। যুদ্ধের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তার কাহিনীটা আমরা বিনা দ্বিধায় মন দিয়ে শুনি।

একজন সৈনিক সগর্বে আমাদের শোনায় যে তার স্ত্রী একটা সাত মাসের কন্যা সন্তান প্রসব করেছে, তা সত্ত্বেও শিশুটির ওজন আট পাউণ্ড। লেদারহোজ বিদ্রূপ করে বলে, "এমনিতে এমনটি হয় না।" লোকটা তার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারে না। তার শেষ ছুটি আর সন্তানটির জন্ম তারিখের মধ্যে কম মাসের ব্যবধান তা সে আঙ্গুল গুনে হিসেব করে। "হ্যাঁ, ঠিক সাত মাসই বটে।" "লেদারহোজ হাসে। তার মুখে বিদ্রূপের হাসি। "তোমার হয়ে তোমার অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ এ সামান্য কাজটা করে গেছে।"

লোকটা লেদারহোজের পানে তাকিয়ে বলে "কি—কি তুমি বলতে চাও?" সে তোতলায়।

"ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সহজবোধ্য," আর্থার গা চুলকোতে চুলকোতে জওয়াব দেয়।

লোকটার মুখে ঘাম দেখা দেয়। সে বার বার তারিখ গোনে। তার মুখমণ্ডল কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। জানালার পাশে উপবিষ্ট এক স্থূলকায় দাড়ি গোঁফমণ্ডিত লোক হেসে গড়াগড়ি যায়, "ওরে বোকা! ওরে নিরেট বোকা—"

বেথকি সহসা রুক্ষ কঠোর হয়ে ওঠে, "মুখ বন্ধ কর বলছি, মোটা বোকা কোথাকার।"

"কেন?" দাড়িওয়ালা প্রশ্ন করে।

"কারণ তোমার মুখ বন্ধ করা উচিত। তুমিও চুপ কর আর্থার,"—বেথকি বলে দেয়।

সৈনিকটার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। "তা'হলে এ ব্যাপারে কি করা যায়।" সে অসহায় কণ্ঠে জানতে চায়।

জাপ বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করে বলে, "কারো ছেলে উপার্জনক্ষম না হলে তার বিয়ে করা উচিত নয়; তা হলেই এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না।"

বাইরে সন্ধ্যা নামে। দিক চক্রবালের পটভূমিকায় অরণ্যগুলোকে গরু বাছুরের মতন দেখায়; কামরা থেকে বিচ্ছুরিত ম্লান আলোতে প্রান্তর-গুলো আবছা মনে হয়। বাড়ি পেঁাছতে আর ঘণ্টা দুয়েকের পথ বাকী। বেথকি তার গাঠরী-বোচকা ঠিকঠাক করছে। শহর থেকে কয়েক স্টেশন আগে তার বাড়ি। তাই সে আমাদের আগে নামবে।

ট্রেন থামে। এডলফ আমাদের সবার সাথে করমর্দন করে। সে গাড়ির পাশে লাফ দিয়ে নেমে চার দিকে একবার তাকায়। এক লহমায় সব কিছু দেখে নেয়। তৃষ্ণার্ত ধরণী যেমন করে বৃষ্টির পানি শুঁষে নেয়। সে আবার আমাদের দিকে ফিরে তাকায়। তার কানে আর কোন কথা ঢোকে না। লুদভিগ ব্রেয়ার জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। তার যন্ত্রণার কথা সে ভুলে যায়। "তাড়াতাড়ি চলে যাও এডলফ, তোমার স্ত্রী অপেক্ষা করছে।"

বেথকি আমাদের পানে মুখ তুলে মাথা নাড়ে। "কোন তাড়াহুড়ো নেই লুদভিগ," তবে তার গৃহ যে তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে তা সহজবোধ্য। কিন্তু এডলফের কথাই আলাদা। সে অন্য জাতের জীব। তারপর সে পিছনে ফিরে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলতে থাকে।

"শীগগির আমরা তোমাকে দেখতে যাব।" আমি তাকে পিছন থেকে ডাক দিয়ে বলি।

আমরা তাকে মাঠ পার হতে দেখি। অনেকক্ষণ ধরে সে হাত নাড়ে। ইঞ্জিনের ধোঁয়া আমাদের মাঝখানে এসে আমাদের দৃষ্টি আড়াল করে দেয়। দূরে কয়েকটা আলো ঝিকমিক করে।

ট্রেনটা চলতে চলতে একটা বিরাট বাঁক নেয়। এডলফকে ক্ষুদ্র দেখায়—একটা বিন্দু মাত্র। একটা অতি ক্ষুদ্রকায় নিঃসঙ্গ মানুষ বিস্তীর্ণ অন্ধকার প্রান্তরের উপর দিয়ে নীরবে চলছে। তার মাথার উপর দিক-দিগন্ত-ব্যাপী নীল আকাশ। আমি জানি না, এডলফের সাথে সম্পর্কবিহীন এই দৃশ্য কেন আমাকে মুগ্ধ করে। একজন নিঃসঙ্গ পথচারী বিরাট আকাশের পটভূমিকায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে পথ চলছে।

তারপর পুঞ্জীভূত অন্ধকারে বৃক্ষসারি এগিয়ে আসে। অনতিবিলম্বে আর কিছু চোখে পড়ে না। শুধু গতি, অরণ্য আর আকাশ।

গাড়ির কামরাটা মুখর হয়ে ওঠে। মালপত্রের গাঠরী-পেটরা, রোদে বৃষ্টিতে জীর্ণ বিবর্ণ পিঙ্গল মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল ফুটকি, মাটি-ঘাম-মাখা সামরিক উর্দির গন্ধ আর বাইরে ট্রেনের চাকার তলে দলিত মথিত ধরণী অজানার পথে এগিয়ে চলছে। আমরা অতীতের পৃথিবীকে পিছনে, আরও পিছনে ফেলে যাচ্ছি—ট্রেঞ্চের পৃথিবী, শেল-বিধ্বস্ত পৃথিবী, অন্ধকার আর আতঙ্কভরা পৃথিবী। জানালা দিয়ে শুধু চোখে পড়ে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র গতি। এর সাথে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই।

কে যেন গান গাইতে শুরু করে। অন্যেরা তার সাথে কণ্ঠ মিলায়। এবার সবাই, কামরার প্রতিটি যাত্রী—পাশের কামরার যাত্রীরা—সারাটা ট্রেনের যাত্রীদল এক সাথে গান গাইতে থাকে।

আমরা পরস্পরের পানে তাকাই ; আমাদের চোখ জ্বলজ্বল করে। গাড়ির চাকার ধ্বনি আমাদের সুরের সাথে তাল দেয় ; আমরা গান গাই আর গাই।

আমি লুদভিগ আর কসোলের মাঝখানে ঘেষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে আছি। তাদের দেহের উষ্ণতা আমি অনুভব করি। আমার আপাদ-মস্তকে শিহরণ জাগে। আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গে এক স্নিগ্ধ মধুর পুলকানুভূতির অমিয় ধারা বইতে থাকে। সমস্ত গাড়িটা যেন এই অমিয় ধারায় অবগাহন করছে। আমি মৃদুভাবে লুদভিগের হাতে হাত রাখি। মনে হয় তার হাতটা পুড়ে যাচ্ছে। সে তার জীর্ণ বিবর্ণ মুখ তুলে আমার

পানে তাকালে আমি আমার বুকের অনুভূতি নিঙড়ে জড়িত কণ্ঠে শুধু এইটুকু মাত্র বলতে পারি, "সিগারেট আছে লুদভিগ?"

সে একটা সিগারেট দেয়। গাড়ি বাঁশী বাজায় আর আমরা গান গাইতে থাকি। গাড়ির চাকার ঘর্ঘর ধ্বনির চেয়েও একটা অবাঞ্ছিত বিকট ধ্বনি আমাদের কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তা সমস্ত গাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়। আকাশে মেঘ জমেছে। বজ্রের বিকট ধ্বনি। বিদ্যুতের চকিত আলোতে সহসা চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কসোল জানালায় দাঁড়িয়ে বলে, "এবার অন্য ধরনের বজ্রঝটিকার মুখোমুখি" বলে বিড়বিড় করে সামনে মাথা বাড়িয়ে দেয়।

"শীগগির দেখ। ঐ যে দেখা যাচ্ছে," সে সহসা চেঁচিয়ে ওঠে। আমরা তার চারপাশে সমবেত হই। বিদ্যুতের আলোর ঝলকানিতে প্রান্তর সীমায় আকাশের বুক চিরে শহরের উঁচু সরু চূড়োগুলো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একবার দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো নিকটতর হয়ে দেখা দেয়।

উত্তেজনায় আমাদের চোখ জ্বলমলিয়ে ওঠে। সহসা প্রত্যাশার তীব্র আবেগ আমাদের সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

কসোল তার জিনিসপত্র গোছায়। সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "আজ থেকে এক বছর পর আমরা কোথায় বসে থাকব বলতে পার?"

"আমাদের পাছার-উপর", জাপ ভয়ে ভয়ে মন্তব্য করে। কিন্তু তার কথায় কেউ হাসে না। শহরটা আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে আমাদের তার কাছে আকর্ষণ করছে। সে আকুল আগ্রহে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। আর আমরা এক ট্রেন ভর্তি সৈনিক, এক ট্রেন ভর্তি প্রত্যাগতের দল, এক ট্রেন ভর্তি আশা-আকাঙ্খা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ট্রেন সামনে চলছে; সামনে নগর প্রাচীর এগিয়ে আসছে। হয়ত এই মুহূর্তে একটা সংঘাত ঘটবে। বাইরে বিদ্যুৎ চমক, মেঘ, গর্জন। এবার গাড়ির দুপাশে দেখা দেয় হৈ-হুল্লোড়, চেঁচামেচি। প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়ছে। প্লাটফর্মের জমাট পানি চিক্‌মিক্ করছে। সেই ভাবনা আমাদের নেই; আমরা সবাই বৃষ্টিতে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ি।

আমরা ট্রেনের দরজার বাইরে নামতেই কুকুরটা আমার অনুসরণ করে। আমরা দুজন বৃষ্টিধারা মাথায় নিয়ে সিঁড়িতে পা দেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্টেশনের সামনে আমরা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ি। কসোল ব্রোগার আর ট্রসকিকে নিয়ে হেনরিখ স্ট্রীট ধরে দ্রুত পদে রওয়ানা হয়। লুদভিগকে নিয়ে আমি স্টেশন এভেন্যুর পথ ধরি। বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতায় কালক্ষেপ না করে লেদারহোজ তার পণ্য সামগ্রী নিয়ে ইতিমধ্যেই চলে গেছে আর জাদেন উইলির কাছ থেকে বেশ্যা পাড়া যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথটা জেনে নেয়। জাপ আর ভ্যালোটিনের মাত্র অবসর আছে। তাদের জন্য কেউ পথ চেয়ে নেই। তাই তারা খাবারের সন্ধানে স্টেশনটা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। তাদের ইচ্ছা, তারা পরে ব্যারাকে আশ্রয় নিবে।

স্টেশন এভেন্যুর দু পাশের গাছ থেকে টপ টপ করে পানির ফোঁটা পড়ছে; আকাশে মেঘ ছুটোছুটি করছে। যুদ্ধে যোগদানের জন্য সাম্প্রতিককালে ভর্তি হয়েছে এমন কয়েকজন সৈন্য আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। তাদের বাহুতে লাল রঙের ফিতে জড়ানো। একজন লুদভিগকে হঠাৎ আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে "এর কাঁধের স্ট্র্যাপ খুলে ফেল।"

"চুপ কর সৈনিকের জারজ বাচ্চা!" এই বলে আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেই।

অন্যরা এগিয়ে এসে আমাদের বেষ্টন করে ফেলে। সবার আগে যে আছে তার দিকে শান্তভাবে একবার তাকিয়ে লুদভিগ নিজের পথে চলতে থাকে। লোকটা পথ ছেড়ে দেয়। তখন দুজন নৌসেনা সেখানে উপস্থিত হয়ে তার প্রতি ধাবিত হয়।

"শুয়োরের বাচ্চা! দেখতে পাচ্ছিস না, এই লোকটা জখমী?" মুক্ত হাতে তাদের মোকাবেলা করার জন্য আমি আমার গাঠরীটা ছুঁড়ে ফেলি। কিন্তু ইতিমধ্যে লুদভিগ মাটিতে পড়ে আছে। বাহুতে জখম বলে সে আত্মরক্ষায় অক্ষম বলা যায়। নৌসেনা দুটো তাকে পায়ের তলায় দাবিয়ে তার উর্দি টানতে থাকে। একজন লেফটান্যান্ট মেয়েলী কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে, "বেটাকে লাথি মেরে মেরে খুন কর! বেটা কুত্তা!" তাকে সাহায্য করতে যাওয়ার আগেই আমার মুখে একটা

ঘুষি লাগে। আমি টলতে থাকি। "কুত্তার বাচ্চা" বলে আমি আমার আক্রমণকারীর পেটে সজোরে লাথি মারি। সে উঃ করে উল্টো হয়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনজন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাকে নীচে ফেলে দেয়। "ছোরা বের কর" মেয়েলী কণ্ঠ আবার চেঁচায়।

আমার আক্রমণকারীদের পায়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই লুদভিগ তার অক্ষত বাঁ হাতটা দিয়ে একটা নৌসেনার টুটি চেপে ধরেছে। তাকে লুদভিগ হাঁটুতে লাথি মেরে মাটিতে ফেলেছে। সে টুটি ধরে আছে, যদিও অন্যরা তাকে যত পারে কিল-ঘুষি মারছে। এবার একটা লোক তার বেল্টের বাকলেস দিয়ে আমার মাথায় মারছে আর একজন আমার দাঁতের উপর পা ঠুকছে। উলফ তার পা ধরে ফেলেছে। কিন্তু আমরা তবু উঠতে পারছি না। তারা বার বার আমাকে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। ক্রোধান্ধ হয়ে আমি আমার রিভালবার বের করতে চেষ্টা করছি। ঠিক এমনি মূহূর্তে একটা লোক আমার পাশে পিছনের দিকে দপ করে পড়ে যায়। এবার দ্বিতীয় লোক; লোকটা অচেতন। তারপর তৃতীয় লোক। এর একটা মাত্র অর্থ হতে পারে উইলি তার কাজ করছে।

সে ক্রোধে গাঠরী-বোচকা ফেলে দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সে দুজন করে একসাথে ঘাড়ে ধরে পরস্পরের মাথা ঠুকাঠুকি করছে। এক মুহূর্তে দুজনকে একসাথে মাটিতে ফেলছে। উইলি রেগে গেলে রীতিমতন প্রকাণ্ড হাতুড়িতে পরিণত হয়। আমরা নিষ্কৃতি পাই। আমি দাঁড়িয়ে উঠতেই আক্রমণকারীর দল রণভঙ্গ দেয়। মাত্র একজনের পিঠে একটা ঘুষি দিয়েই লুদভিগের প্রতি মনোনিবেশ করি।

কিন্তু উইলি সজোরে তাদের ধাওয়া করছে। যে দুই নৌসেনা লুদভিগকে সর্ব প্রথম আক্রমণ করেছিলো সে তাদের নাগাল পায়। তাদের একজন নর্দমায় পড়ে গোঁ গোঁ করতে থাকে। আর ঝড়ের বেগে উইলি তখন অন্যজনের পিছনে ধাওয়া করে।

লুদভিগের থেৎলানো বাহুর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে রক্ত ঝরছে। তার মুখে কাদা মাটি লেগে আছে; আর কপালটা বুটের গোড়ালীতে ছিঁড়ে গেছে। সে নিজেই তা মুছে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। "খুব লেগেছে?" আমি তাকে প্রশ্ন করি। সে বিবর্ণ মুখে মাথা নাড়ে।

ইতিমধ্যে উইলি নৌসেনাটাকে পাকড়াও করে বস্তার মত হেঁচড়ে আনছে। "ভীরু বদমায়েস"! সে গর্জে ওঠে। "এখানে সারা যুদ্ধ-

কালটা তোমরা জাহাজে বসে হাওয়া খাচ্ছ। একটা গুলির আওয়াজ পর্যন্ত শোননি। আর এখন ভাবছ যুদ্ধ ফ্রণ্টের সৈন্যদের উপর হাত তোলার সুযোগ এসেছে। তাই ভাবছ নাকি? তোমাকে পাকড়াও করেছি। জানু পেতে বসো, ফাঁকিবাজ আগাছা! জানু পেতে বসে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

সে লোকটার মাথাটা সজোরে চেপে লুদভিগের সামনে নুইয়ে দেয়। তার এমনি ভয়ঙ্কর মূর্তি যে তাতে যে কারো মনে দারুণ ভয় জাগিয়ে দেয়। "আমি তোমাদের সবাইকে খুন করব; টুকরো টুকরো করে ফেলব। নতজানু হও, হাঁটু গেড়ে বসো" সে গর্জন করে।

লোকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। "ওকে ছেড়ে দাও, উইলি।" নিজের জিনিসপত্রগুলো গুছোতে গুছোতে লুদভিগ বলে।

"কি বলছ?" অবিশ্বাসের সুরে উইলি প্রশ্ন করে। "পাগল হয়েছ? এরা তোমার হাতটা থেৎলে দেয়ার পর—"।

লুদভিগ এখন রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। "আহ, ওকে ছেড়ে দাও।"

এক মুহূর্ত উইলি লুদভিগের পানে চেয়ে থাকে; তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটাকে ছেড়ে দেয়। "বেশ, এবার ছুটে পালাও।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসম্বরণ করতে পারেনা। শেষ মুহূর্তে নৌসেনাটাকে এমনি একটা লাথি মারে যে সে দু'দুবার ডিগবাজি খায়।

আমরা নিজেদের পথ ধরে চলি। উইলি গালাগালি দেয়। রেগে গেলে সে বকর বকর করবেই। কিন্তু লুদভিগ নির্বাক।

হঠাৎ চোখে পড়ে পলাতকের দল বিয়ার স্ট্রীটের কোণ ঘুরে আমাদের দিকে ফিরে আসছে। তারা এবার লোকজন সংগ্রহ করে আরও শক্তিশালী হয়ে আসছে।

উইলি তার কাঁধ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে চোখ দুটো ছোট করে বলে, "গুলি ভরে তৈরী থাক।" লুদভিগ তার রিভলভারটা বের করে। আমিও আমার বন্দুকটা নিয়ে প্রস্তুত। এতক্ষণ হাতাহাতি ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে মাত্র, এবার সাংঘাতিক একটা কিছু হবে। এরা যেন আর আমাদের পিছু না নেয়, তাই আমরা চাই।

আমরা তিনজন রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি পরস্পরের থেকে তিন পা দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলি। যাতে তিনজন একই তাকের আওতায়

না পড়ি। কুকুরটাও আসন্ন ব্যাপারের গুরুত্বটা উপলব্ধি করে আমাদের আড়ালে থেকে ঘেউ ঘেউ করে চলতে থাকে। যুদ্ধ ফ্রণ্ট থেকে ওটাও শিখেছে, কেমন করে আত্মরক্ষা করে অগ্রসর হতে হয়।

"বিশ গজের মধ্যে এলেই গুলি করব।" উইলি হাঁক দিয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়।

আমাদের বিরোধীপক্ষ উদ্বিগ্ন চিত্তে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের রাইফেলের মুখ আমাদের দিকে তাক করা। কট করে উইলি তার রাইফেলের সেফটি ক্যাচ খুলে বেল্ট থেকে হাতবোমাটা হাতে নেয়। রসদের অংশ হিসেবে এখনো এটা সে সঙ্গে রাখে। সে হাঁক ছেড়ে বলে। "আমি তিন পর্যন্ত গুনব--"

নন-কমিশন অফিসারের পোশাক পরা এক বয়স্ক লোক—তাঁর পোশাক থেকে পদমর্যাদাজ্ঞাপক ব্যাজ খুলে নেয়া হয়েছে—দল থেকে কয়েক পা এগিয়ে এসে ডেকে বলে, "তোমরা আমাদের কমরেড কিনা?"

উইলি ফুঁসে ওঠে; তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে। "দোজখে তোদের স্থান হোক। এই প্রশ্ন ত আমরাই তোদের করছি। ভীরু কাপুরুষের বাচ্চারা। তোদের মধ্যে কে প্রথম এই আহত লোকটাকে আঘাত করেছিলো?"

লোকটা এ কথার জওয়াব না দিয়ে পিছনের লোকদের জিজ্ঞেস করে, "তোমরা এ কাজ করেছিলে?"

তাদের দলের একজন জওয়াব দেয়, "সে কিছুতেই স্ট্র্যাপ খুলবে না।"

নন-কমিশন অফিসার এই উক্তিতে বিরক্তি ও অধৈর্য প্রকাশ করে; তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "তাদের অন্যায় হয়েছে, কমরেড। তবে আমার মনে হয় তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারনি। যাক, এখন তোমরা কোথেকে আসছ?"

"নিশ্চয়ই যুদ্ধ ফ্রণ্ট থেকে। কোথেকে আসছি বলে তোমরা ভাবছ?" উইলি ধমকের সুরে জওয়াব দেয়।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"যাচ্ছি তোমরা যুদ্ধের দিনগুলোতে যেখানে ছিলে—বাড়িতে। লোকটা তার হস্তবিহীন আস্তিনটা দেখিয়ে বলে, "কমরেড। ঘরে বসে থেকে এই হাতটা হারাইনি নিশ্চয়।" "তাতেও পরিস্থিতি তোমার খুব অনুকূলে

যায় না।" উইলি অবিচলিত কণ্ঠে বলে। "এই অবস্থায় তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত যে তুমি এসব হঠাৎ-বনা পুতুল-সিপাইদের সঙ্গে অকাজে যোগ দিয়েছ।"

সার্জেণ্টটা আরও এগিয়ে এসে শান্ত কণ্ঠে বলে, "দেশে এখন বিপ্লব চলছে। আমাদের সঙ্গে যারা নেই, তারাই আমাদের দুশমন।"

উইলি শ্লেষের হাসি হেসে বলে, "চমৎকার বিপ্লবই বটে। সন্দেহ নেই। স্ট্র্যাপ খোলা সমিতির বিপ্লব। স্ট্র্যাপ খুলে নেওয়াই কি তোমার বিপ্লবের উদ্দেশ্য?" সে ঘৃণায় থুথু ফেলে।

"না, ব্যাপারটা এত সহজবোধ্য নয়।" এক হাতওয়ালা লোকটা দ্রুতপদে এগিয়ে আসে। "আমরা আরও অনেক কিছু চাই। আমরা যুদ্ধের অবসান চাই। হিংসা-বিদ্বেষের অবসান চাই। আমরা আবার মানুষ হতে চাই; যুদ্ধের হাতিয়ার হতে চাই না।"

উইলি এবার হাতবোমা রেখে দিয়ে লুদভিগের থেৎলানো হাতটা দেখিয়ে বলে, "বিপ্লবের সূচনাটা চমৎকার হয়েছে, আমি বলব।" তারপর হঠাৎ কয়েক লাফে বিপক্ষদলের মাঝখানে গিয়ে বলে, "মায়ের কোলে ফিরে যা নচ্ছার ছোড়ারা সব!" তারা পিছনে সরে যায়। সে গর্জন করতে থাকে।

"তোরাই আবার মানুষ হতে চাস! তাই না? কেমন করে? তোরা ত এখনও রুচিবান সিপাইও হতে পারলিনে। তোরা যুদ্ধের রাইফেল ধরেছিস, তাতে লোকজন ভয়ে পালাবে। নিজেরাই কখন নিজেদের জখম করবি।"

ছোকরা সিপাইরা পালাতে থাকে। উইলি তখন ফিরে এসে এক হাত-ওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "এবার তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি। এ যুদ্ধে আমাদের দুঃখ-কষ্ট তোমাদের চেয়ে কম হয়নি। এই দুঃখ-কষ্টের অবসান হতে যাচ্ছে তাও সত্যি, কিন্তু তোমরা যে পথ বেছে নিয়েছ সে পথ ভুল। আমরা যা করি স্বেচ্ছায় করি, কারো হুকুমে নয়। অনেক দিন থেকে অন্যের হুকুম তামিল করে কিছু করিনা, এই দেখ।"

সে এক টানে কাঁধের স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে ফেলে। "এই আমি স্ট্র্যাপটা খুলে ফেললাম। তোমার কথায় নয় বরং আমিও তা চাই বলে।" সে লুদভিগকে দেখিয়ে বলে, "স্ট্র্যাপটা রাখা না রাখা তার ইচ্ছে। কেউ তাকে জোর করতে পারবে না।" এক হাতওয়ালা লোকটা নীরবে সায়

দেয়। সহসা তার মুখের রঙ বদলে যায়। "আমিও তোমাদের মতন ফ্রণ্টে ছিলাম বন্ধু।" সে সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, "সেখানকার অবস্থার কথা আমিও জানি। এই যে—" বলে সে তার কাঠের পা'টা দেখিয়ে দেয়, "বিংশতি ইনফ্যানট্রি ডিভিশন—ভার্দুন।"

"আমরাও"—উইলি সহানুভূতির সুরে বলে, "যাক, ভাগ্য তোমার প্রসন্ন হোক; বিদায় বন্ধু, বিদায়।"

উইলি তার বোচকা আর রাইফেলটা আবার কাঁধে তুলে নেয়। আমরা আবার চলতে থাকি। পাশ দিয়ে যাবার বেলায় বাহুতে লাল ফিতা বাঁধা সার্জেণ্টটা সহসা এক হাত তুলে লুদভিগকে সামরিক কায়দায় সালাম করে। এ সালাম লুদভিগের উর্দিকে নয়, যুদ্ধকে নয়—ফ্রণ্ট ফেরত তার বন্ধুদের।

উইলির বাড়িটা নিকটতম। সে রাস্তার ওপারে বাড়ির পানে আনন্দে হাত নাড়ে, আর গান গেয়ে ওঠে "নাবিক এলো ঘরে।"

আমাদের ইচ্ছে, আমরা তার জন্য অপেক্ষা করব, কিন্তু উইলি নারাজ। সে বলে, "বরং লুদভিগকে প্রথম তার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়া যাক; আমার জন্য কোন ভাবনা নেই; আমার সব ঠিকই আছে।"

আমরা সবাই রাস্তায় একবার থেমে মেজেঘষে নিজেদরকে খানিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেই, যাতে আমাদের মা বাবা আত্মীয় স্বজন বুঝতে না পারে যে, আমরা সরাসরি লড়াইর ময়দান থেকে ফিরছি। আমি লুদভিগের মুখখানা মুছে দিয়ে তার হাতের ব্যাণ্ডেজটা খুলে নতুন করে বেঁধে দেই, যাতে রক্তের দাগ ঢাকা পড়ে। কারণ রক্তের দাগ দেখলে তার মা ঘাবড়ে যাবে। পরে অবশ্য হাসপাতলে নিয়ে তার ব্যাণ্ডেজটা আরও ভালো করে বাঁধিয়ে আনতে হবে।

এবার আমরা নির্ঝঞ্ঝাটে লুদভিগের বাড়ি পৌঁছি। তাকে এখনও বিমর্ষ দেখায়। "এনিয়ে আর মন খারাপ করোনা", আমি তার করমর্দন করতে করতে বার বার তাকে প্রবোধ দেই। উইলি তার কাঁধে হাত রেখে বলে, "এমন ধরনের ব্যাপার সবার বেলায় ঘটতে পারে। বুড়ো খোকা, আমরা জানি, তোমার হাতটা অক্ষত থাকলে তুমি এদের টুকরো টুকরো করে ফেলতে।"

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে। সে ঠিক মতন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারছে কিনা তা দেখার জন্য আমরা

অপেক্ষা করি। প্রায় অর্ধেক সিঁড়ি উঠে গেলে উইলির একটা কথা মনে পড়ে। সে পিছন থেকে ডেকে বলে "ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতিতে পড়লে লাথি মারবে, দুশমনকে কাছে ঘেষতে দেবে না। বুঝলে?" এই কথাটা শেষ হলে আমরা বেরিয়ে পড়ি।

"গেলো কয় হপ্তায় লুদভিগ যেন কেমন হয়ে গেছে. তাই ভাবছি," যেতে যেতে আমি বলি।

উইলি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "হয়ত আমাশার দরুনই এমনটি হয়েছে; তা ছাড়া অন্য কোন কারণ ত দেখছিনে।"

সে কাঁধের বোমাটা আবার ঠিক করে নেয়। "তা হলে, এবার চললাম আর্নস্ট। ভাগ্য তোমার সুপ্রসন্ন হোক। গেলো ছয় মাস হোমেয়ার পরিবারের দিনকাল কেমন কাটছে তাই গিয়ে দেখি। পেঁছিলেই ঘণ্টাখানেক কান্নাকাটি, আর পুরোদমে বক্তৃতা চলবে আশা করছি। মা আমার কী চমৎকার সার্জেণ্ট মেজরই না হতে পারতো। বুড়ী মহিলার ভিতরটা সোনার, কিন্তু বাইরেটা পাথরের মতন কঠিন।"

এবার আমি একা পথ চলছি। মুহূর্তে যেন দুনিয়াটা বদলে গেছে মনে হয়। আমার কানের ভিতর কেমন যেন শব্দ হচ্ছে। একটা নদী বুঝি পাকা রাস্তার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলছে। বাড়ির বাইরে পেঁছার আগ পর্যন্ত আমি যেন কিছু শুনতে বা দেখতে পাচ্ছি না। আমি ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উঠি। দরজার সামনে একটা নিশান ঝুলছে। তাতে লেখা রয়েছে "স্বগৃহে সুস্বাগতম।" আর তারই পাশে এক গুচ্ছ ফুল। তারা আমাকে আসতে দেখে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে; মা আমার সবার সামনে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে; তারপর বাবা এবং বোনেরা। দূর থেকে চোখে পড়ছে নানা রকম খাবারের আয়োজন। আনন্দময় মধুর পরিবেশ। "এত সব কে করেছে? এত সাজসজ্জা, এত সমারোহ, এত খাবার-দাবার। "এ সব করার কোন প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু মা তুমি কাঁদছ কেন? আমি ত ফিরে এসেছি। যুদ্ধ থেমে গেছে। কান্নার কোন কারণ নেই।" তারপর আমি অনুভব করি আমার নাক বেয়েও নোনা অশ্রু ঝরছে।

(২)

আলুর চপ, ডিম আর সসেজ। চমৎকার খাবারের ব্যবস্থা। গেলো দু বছর ডিমের চেহারা পর্যন্ত দেখিনি; আর আলুর চপ যে কখন খেয়েছি প্রভুই জানেন।

বাইরের ঘরে সবাই মিলে বড় টেবিলটায় বসে আরামে স্যাকারিন দিয়ে চা খাই। ঘরে বাতি জ্বলছে আর ক্যানারীটা গান গাইছে। টেবিলের নীচে কুকুরটা ঘুমোচ্ছে। মনোরম পরিবেশ।

"এবার তোমার অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনাও দেখি আর্নস্ট।" বাবা আমাকে বলেন।

"অভিজ্ঞতা—" আমি আপন মনে কথাটা পুনরাবৃত্তি করি আর মনে মনে ভাবি, আমি ত কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করিনি। সারাটা সময় ত যুদ্ধেই কেটেছে; সেখানে মানুষের অভিজ্ঞতা হবে কেমন করে?

মগজ তোলপাড় করেও মনের মতন কোন অভিজ্ঞতার কথা মনে আসছে না। যুদ্ধ সীমান্তে যা ঘটেছে বেসামরিক নাগরিককে তা বলা যায় না। তা ছাড়া আমার ত আর কিছু জানা নেই।

"তোমরা সাধারণ নাগরিকরা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ।" নিষ্কৃতির আশায় আমি তাকে বলি।

সত্যি অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে। আমার বোন জানায়, নিত্যকার আহার যোগাড় করতে তাদের কত বেগ পেতে হয়েছে। দু'দুবার স্টেশন থেকে পুলিশ তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়েছিলো। তৃতীয়বার তারা পরিধানের ভিতর সেলাই করে ডিম, ব্লাউজের ভিতর সসেজ আর স্কার্টের ভিতরের পকেটে আলু লুকিয়ে রেখে রেহাই পেয়েছিল।

তাদের কাহিনী আমি আনমনা হয়ে শুনি। তাদের বয়েস এর মধ্যে কত বেড়ে গেছে। এমনও হতে পারে আগে এটা আমি লক্ষ্য করিনি। তাই এখন তা আমার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ছে। ইলসির বয়েস সতর পেরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। সময় যে কেমন করে কেটে যায়—

"তুমি কি জেনেছ যে কাউন্সিলার প্লেইস্টার মারা গেছেন?" বাবা জিজ্ঞেস করেন।

আমি মাথা নাড়ি—"কখন?"

"জুলাই মাসের বিশ তারিখের কাছাকাছি আমার মনে হয়—"

কেৎলীতে পানি ফুটছে। আমি টেবিলের ঢাকনির কোনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি। জুলাই মাস—আমি মনে মনে চিন্তা করি—জুলাই মাসের শেষ পাঁচ দিনে আমরা ছয়ত্রিশজনকে হারাই। তাদের তিনজনের নামও আমার এখন মনে পড়ছে না। কালের গতির সাথে সাথে আরও কত-

জন এই মৃতের দলে যোগ দিয়েছে। "কিসে মারা গেলো?" ঘরের অনভ্যস্ত উষ্ণতায় ঘুম-জড়ানো চোখে আমি জিজ্ঞেস করি। "বোমায় না মেশিনগানের গুলিতে?"

"আর্নস্ট, তিনি ত সেনাবাহিনীর লোক ছিলেন না।" তিনি বিমূঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন। "তিনি যকৃতের ব্যামোতে মারা গেছেন।" কৈফিয়তের সুরে বলি "আমি কথাটা ভুলে গেছলাম।"

আমার গত ছুটির পর যে সব ঘটনা ঘটেছে, তারা একে একে সব কিছু বলে। রাস্তার মোড়ের দোকানী কসাইটাকে এক ক্ষুধার্ত মেয়েরদল মেরে মেরে আধমরা করে ফেলেছিলো। এক সময়—আগস্টের শেষাশেষি প্রত্যেক পরিবার এক পাউণ্ড করে মাছ পেতো। কুমারী মেনেট্রোপ সন্তান-সম্ভবা হয়েছে। আলুর মূল্য আবার বেড়ে গেছে। পরবর্তী সপ্তাহে কসাইখানায় হয়ত কিছু পরিমাণ মাংস কিনতে পাওয়া যাবে। গ্রেটি মাসীর মেজো মেয়ের গত মাসে বিয়ে হয়েছে—একজন ক্যাপ্টেনের সাথে।

আমার বোন কথা বলতে বলতে থেমে যায়। "কিন্তু আর্নস্ট, তুমি ত কোন কথাই মন দিয়ে শুনছো না?"

"হ্যাঁ শুনছি", আমি তাকে নিশ্চয়তা দেই। "ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেনের সাথে বিয়ে হয়েছে, তাই বলছিলে না।"

"ভেবে দেখ কি সৌভাগ্য।" আমার বোন আগ্রহভরে বলে যায়। "অথচ তার মুখটাতে বিশ্রী ফুটকি ফুটকি দাগ। এ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?" এ সম্বন্ধে আমার কি মতামত থাকতে পারে? আমি কি বলব? যদি ক্যাপ্টেনের ভুড়িতে বোমার টুকরো এসে লাগে, তবে অন্য যে কোন লোকের মত তার রক্ষা নেই; তাকেও পটল তুলতে হবে।

তারা আলাপ করতে থাকে। কিন্তু আমি আমার চিন্তাধারা বিন্যস্ত করতে পারিনা।

আমি উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। বাইরে কয়েকটা কাপড় রশিতে শুকোতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাপড়গুলো বাতাসে দুলছে। সহসা বহু দূরের একটা দৃশ্য আমার মনের মুকুরে ভেসে ওঠে। কাপড় দুলছে, সন্ধ্যায় মাউথ অর্গেন বাজছে। সৈনিকেরা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মার্চ করে যাচ্ছে—রঙচটা গ্রেটকোট গায়ে নিগ্রো সৈন্যদের লাশ ইতস্ততঃ পড়ে আছে—গ্যাস বোমায় তাদের ঠোঁট ফেটে গেছে। চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। এই দৃশ্যটা এক মুহূর্ত স্থায়ী হয়ে আবার মিলিয়ে যায়। আবার আমার সামনে

কাপড় ঝুলছে। আমার পিছনে উষ্ণ পরিবেশে নিরাপদে আমার মা বাবা সবাই বসে আছেন। দূরের দৃশ্যটা মন থেকে মুছে যেতেই আমি স্বস্তি অনুভব করি; পিছনে তাকাই।

"তুমি এত অস্থির চঞ্চল কেন, আর্নস্ট?" বাবা প্রশ্ন করেন। "তুমি ত দশ মিনিটও এক নাগাড়ে স্থির হয়ে বসনি।"

"তুমি হয়ত অত্যন্ত ক্লান্ত" মা মন্তব্য করেন।

"তা নয়।" আমি কিছুটা বিব্রত হয়ে জওয়াব দেই। "ক্লান্তি এর কারণ নয়। অনেকক্ষণ ধরে কেমন চেয়ারে বসে থাকতে হয় আমি হয়ত তা ভুলে গেছি। ফ্রণ্টে চেয়ার পাতা থাকতো না। সেখানে আমরা মেঝেতে বা যেখানে খুশী শুয়ে বসে থাকতাম। বসে থাকার অভ্যাসটা আর নেই। আমার মনে হয়, কারণটা তাই।"

"অদ্ভুত ব্যাপার।" বাবা বলে ওঠেন।

আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দেই। মা হাসেন। "তুমি কি তোমার ঘরটায় গিয়ে দেখেছ?" মা প্রশ্ন করেন।

"না, এখনও যাইনি।" বলে আমি আমার ঘরের দিকে পা বাড়াই। দরজা খুলতে খুলতে আমার হৃৎপিণ্ডে দ্রুত স্পন্দন অনুভব করি। অন্ধকারে বইপত্রের গন্ধ নাকে এসে লাগে। চট করে বাতি জ্বালিয়ে চারদিকে তাকাই। "যেমনটি ছিলো সবকিছু তেমনটি আছে।"—আমার বোন পিছন থেকে আমাকে বলে।

"হ্যাঁ, তাই।" আমি সায় দেই। আমি এখন একলা থাকতে চাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই অন্যরাও দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি চেয়ারে বসে টেবিলের উপর হাত দুটো রাখি। টেবিলটা কত মসৃণ আর স্নিগ্ধ। হ্যাঁ, সবকিছুই আগের মতন রয়েছে। কার্ল ভগটের দেয়া বাদামী রঙের পেপার ওয়েটটা আগের মতনই কমপাস আর দোয়াতদানের পাশে রয়েছে। কার্ল ভগট গাউন্ট কেমেলে নিহত হয়েছিলো।

"ঘরটা কি তোমার আর পছন্দ হচ্ছে না?" বোন প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ পছন্দ হচ্ছে, তবে বড় ছোট—"

বাবা হাসেন। "আগে যেমন ছিলো, এখনও ততটুকই আছে।" "অবশ্য ঘরটা আগের মতনই আছে। তবে আমার যেন যে-কোন কারণেই

হোক ধারণা হয়েছিলো যে ঘরটা আরও অনেক বড় হোক।" আমি তার কথায় সায় দেই।

"অনেক দিন আগে এসেছিলে" মা বলেন।

আমি মাথা নাড়ি। "বিছানা নতুন করে পাতা হয়েছে। তুমি হয়ত এখনও তা লক্ষ্য করনি।" মা বলতে থাকেন।

আমি আমার টিউনিকের পকেট হাতড়াই। বিদায়কালে এডলফ বেথকি আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট দিয়েছিলো। আমাকে এখন একটি সিগারেট খেতে হবে। আমার মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে। খুব জোরে সিগারেটে কয়েকটা টান দিতেই অনেকটা ভালো লাগতে শুরু করছে।

"তুমি সিগারেট খাও?" বিস্ময় আর ভর্ৎসনার স্বরে বাবা প্রশ্ন করেন।

কতকটা অবাক হয়ে আমি তার পানে চাই। "হ্যাঁ, তা অবশ্য খাই।" আমি জওয়াব দেই। "ফ্রণ্টে সিগারেট আমাদের রসদের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যহ তিনটে সিগারেট আমরা পাই। আপনি একটা সিগারেট খাবেন?"

তিনি একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বলেন "আগে ত সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস তোমার ছিলো না।"

"হ্যাঁ তাই—" আমি জওয়াব দেই। তার এ হেন মনোভাবে আমার হাসি পায়। কথাটা সত্যি যে আগে এমন অনেক কিছুই করতাম না, কিন্তু যুদ্ধ ফ্রণ্টে মুরব্বীয়ানার ধার কেউ ধারে না। সেখানে সবাই সমান।

সবার অলক্ষ্যে আমি ঘড়ির পানে তাকাই; মাত্র দু ঘণ্টা হলো বাড়ি এসেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে দু হপ্তা উইলি আর লুদভিগকে দেখিনি। এখন ওদের কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমাকে যে বাকি জীবনটা পরিবারের মধ্যে কাটাতে হবে এই কথাটা আমি ভাবতেই পারছি না। আমার এখনও মনে হচ্ছে আগামী কাল কিংবা পরশু বা পরে যে কোন দিন আমরা আবার এক সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে মার্চ করব।

আমি শেষ পর্যন্ত উঠে গিয়ে আমার গ্রেট কোটটা নিয়ে আসি।

"আজ সন্ধ্যেটা কি তুমি আমাদের সঙ্গে এখানে থাকবে না?" মা জানতে চান।

"আমাকে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে।" আমি মিথ্যে কথা বলি। সত্য কথা বলতে সাহস পাই না।

মা সিঁড়ি পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করেন। "একটু দাঁড়াও।" মা বলেন। "বড্ড অন্ধকার। একটা বাতি নিয়ে আসি।"

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। বাতি! একয়টা সিঁড়ি পার হওয়ার জন্য? হায় প্রভু! গোলাগুলি মাথায় করে অন্ধকারে কত গুহা-গর্তের মাঝখান দিয়ে আমাকে এই কয়টা বছর পথ খুঁজে নিতে হয়েছে, আর এখন সিঁড়ি পার হওয়ার জন্যও বাতি! মাগো! তবু মায়ের বাতি নিয়ে আশা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আমি অপেক্ষা করি। তিনি সিঁড়ির গোড়ায় বাতি ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

"সাবধানে চলো আর্নস্ট।" তিনি পিছন থেকে আমাকে সাবধান করে দেন।

আমি হাসিমুখে বলি "এই শান্তির দিনে মা বাড়ির ভিতর কি আর বিপদ আসতে পারে?" মা সিঁড়ির রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রদীপের আলোয় মায়ের ছোট্ট মুখে সোনালী আভা চিক চিক করে। তার পিছনের দেয়ালে আলো-ছায়ার খেলা চলে। হঠাৎ একটা ব্যথা বিজড়িত উত্তেজনা আমাকে পেয়ে বসে—যেন আমার মায়ের মুখের মতন কোন বস্তু সারা দুনিয়ায় নেই। যেন আমি আবার শিশু হয়ে গেছি, সিঁড়িতে নামবার সময় যার জন্য বাতি ধরে রাখতে হবে। পথ চলা কালে যার বিপদ ঘটতে পারে মনে হয়। মাঝের এ কয়টা বছর যা ঘটেছে তা অলীক স্বপ্ন মাত্র।

প্রদীপের আলোতে আমার কোমরবন্ধের বকলেস চক্ চক্ করে উঠতেই আমার কল্পনার জাল ছিন্ন হয়ে যায়। আমি আর শিশু নই। সৈনিকের উর্দি আমার গায়ে। এক লাফে সিঁড়ির তিনটি ধাপ পেরিয়ে আমি বাইরের দরজাটা খুলে বন্ধুদের সাথে দেখা করার আগ্রহে ত্রস্তপদে বেরিয়ে পড়ি।

প্রথম আলবার্ট ট্রসকির কাছে যাই। কেঁদে কেঁদে তার মায়ের চোখ দুটো লাল। হয়ত আলবার্টের প্রত্যাবর্তনের পর আজই কেঁদে কেঁদে এমনটি হয়েছে। গুরুতর কিছু নয়। আলবার্টও আগের মতন নেই। ভিজে মোরগের মতন সে টেবিলে নীরবে বসে আছে। তার পাশে তার বড় ভাই। অনেক দিন পর তার সাথে আমার দেখা। তার সম্বন্ধে

এতটুকুই জানি যে সে হাসপাতালে ছিলো। সে মুটিয়ে গেছে। মুখটাও তার সুন্দর হয়েছে।

"হ্যালো হ্যান্স, ভালো হয়ে গেছ?" আমি তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাই। "কেমন লাগছে? সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছ ত?"

সে বিড় বিড় করে কি যে বলে বুঝতে পারিনা। তার মা কান্নায় ভেঙে পড়ে বেরিয়ে যায়। আলবার্ট আমার দিকে চোখ ইশারা করে। আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাই। হ্যান্সের চেয়ারের পাশে এক জোড়া ক্রাচ পড়ে আছে। "তা হলে এখনও সারেনি?" আমি প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ ভাই, গেলো হপ্তায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছি।" এই বলে সে ক্রাচটাতে ভর দিয়ে উঠে এক লাফে উনুনের পাশে চলে যায়। দুটো পায়েরই পাতা নেই। ডান পায়ে লোহার একটি নকল পাতা লাগনো আর বাঁ পায়ে একটা জুতো সংলগ্ন ফ্রেম মাত্র।

বোকার মত কথা বলে আমার লজ্জা লাগছে। "আমি জানতাম না হ্যান্স।" আমি কৈফিয়ৎ দেই।

সে মাথা নাড়ে। কার্পোথিয়ানসে তার দুটো পায়ে তুষার ঘা হয়। তারপর তাতে পচন ধরে। শেষ পর্যন্ত দুটো পায়ের পাতাই কেটে ফেলতে হয়।

"পা দুটোই যে শুধু গেছে। সে প্রভুর কৃপা।" তার মা দুটো গদি এনে পায়ের তলায় রেখে বলে। "দুঃখ করোনা হ্যান্স, শীগগিরই পা দুটো ঠিক হয়ে যাবে। তখন তুমি নির্বিঘ্নে ঘুরতে ফিরতে পারবে।" তার পাশে বসে মা তার গায়ে হাত বুলোয়।

"হ্যাঁ তাই। তোমার পা দুটো ঠিক হয়ে যাবে।" একটা কিছু বলার জন্য আমি এই কথাগুলো বলি।

"হ্যাঁ আমিও তাই বলি।" সে জওয়াব দেয়।

আমি তাকে একটা সিগারেট দেই। এমনি মুহূর্তে আর কি করা যায়? যা কিছু ভাবা যায় তাই বেখাপ্পা মনে হয়। সদিচ্ছা নিয়ে করলেও আমরা এই করুণ পরিবেশে কতকক্ষণ আলাপ করি। কিন্তু আলবার্ট বা আমি যখন ঘোরাফেরা করি হ্যান্স আমাদের পায়ের দিকে করুণ বিমর্ষ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। তার মাও তখন তার

অনুসরণ করে। সব সময় পায়ের দিকে দৃষ্টি--তোমাদের পা আছে, আমার নেই।

হ্যান্স এ ছাড়া অন্য কথা ভাবে না, আর তার মাও সদা সর্বদা তাকে নিয়েই ভাবে। আলবার্ট যে তাতে দুঃখ পাচ্ছে তারা তা চিন্তা করে না। দীর্ঘক্ষণ এই অবস্থায় থাকা যায় না।

"আলবার্ট, এবার আমাদের রিপোর্ট করতে যাওয়া উচিত।" তাকে এই পরিবেশ থেকে মুক্তির সুযোগ দেবার জন্য আমি এই কথা বলি।

"হ্যাঁ।" সে আগ্রহ প্রকাশ করে।

বাইরে বেরিয়ে আমরা মুক্তির নিশ্বাস ফেলি। জলসিক্ত পাকা সড়কে রাত্রি প্রতিফলিত হয়। বাতাসে রাস্তার আলো কাঁপে। আলবার্টের দৃষ্টি সামনের দিকে। "এতে আমার কিছু করার নেই।" সে বলে যায়। "কিন্তু আমি যখন তাদের দু'জনের মাঝখানে এমনি করে তাদের দেখি তখন আমার মনে হয়, দোষটা আমারই। আমার দুটো পা এখনও আছে বলে আমি লজ্জা পাই। আমার দেহটা নিখুঁত আছে বলেই আমি অপরাধী অবাঞ্ছিত চক্ষুশূল। কোন পঙ্গু ব্যক্তি নিখুঁত দেহীর উপস্থিতি কামনা করে না। ক্ষতবাহু লুদভিগও পছন্দ করবে না।"

আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি। সে প্রবোধ মানে না। কিন্তু আমি তাতে স্বস্তি পাই।

আমরা এবার উইলির বাড়িতে যাই। তার ঘরটা অগোছালো হয়ে আছে। তার খাটটা খুলে ফেলে দেয়ালের পাশে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। এটাকে আরও বড় করতে হবে। সেনাবাহিনীর উইলি এত বড় হয়েছে যে এই খাটে তার অবস্থান হয় না। তক্তা হাতুড়ি আর করাত ইতস্ততঃ পড়ে আছে। একটা চেয়ারের উপর আলুর স্যালাদ সাজানো। উইলি অনুপস্থিত। তার মা জানায় যে সে এক ঘণ্টা ধরে গোসলখানায় শরীর মেজেঘষে পরিষ্কার করছে।

উইলির মা উইলির বোচকার সামনে জানু পেতে বসে বোচকার জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করে দেখছে। সে বোচকা থেকে একটা ন্যাকড়া বের করছে। "এক কালে এটা ছিলো এক জোড়া মোজা। এখন ছিঁড়ে গেছে।" মা বিড় বিড় করে।

"কমদামী জিনিস।" আমি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলি।

"কমদামী বটে! জিনিস চেননা, তাই একথা বলছ। সবচেয়ে ভালো পশমের তৈরি মোজা। এটা খুঁজে বের করতে আট দিন আমাকে ছুটোছুটি করতে হয়েছিলো। আর দেখ, শেষ হয়ে গেছে। এমন সরেস ভালো জিনিস কোথাও পাবে না। আমার বিশ্বাস, সপ্তাহে অন্তত একবার পা থেকে খুলে ধোওয়ার সময় পাওয়া যেতো। গতবার যাবার সময় চার জোড়া মোজা সঙ্গে নিয়েছিলো। দু জোড়া মাত্র ফিরিয়ে এনেছে। এগুলোরও এই অবস্থা।"

আমি তার হয়ে কিছু বলতে যাব ঠিক এমন সময় সে বিজয়ীর বেশে ঘরে ঢুকে উচ্চ স্বরে চেঁচায়, "এই যে, এক টুকরো সৌভাগ্য নিয়ে এসেছি। আর একজন প্রার্থীও যে হাজির! আজ রাতে চাটনি দিয়ে মজা করে খাওয়া যাবে, কি বল?"

তার হাতে একটা মোটা তাজা মোরগ নিশানের মতন দুলছে। মোরগটার সবুজ-সোনালী লেজ চক্‌চক্ করছে। ঝুঁটিটা টক্‌টকে লাল। ঠোঁট দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।

আমি বাড়ি থেকে পেট ভরে ভালো খাবার খেয়ে এসেছি, তবু লোভে আমার মুখে পানি জমছে।

উইলি মোরগটাকে আনন্দে নাড়ছে। তার মা সোজা হয়ে চেঁচাচ্ছে, "উইলি, এটা কোথায় পেয়েছ?"

উইলি বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করে যে, সে এটাকে ঘরের পিছনে দেখে ধরে ফেলে জবাই করেছে। দুই মিনিটে সব খতম। সে তার মায়ের পিঠে চাটি মেরে বলে, "যুদ্ধে গিয়ে সামান্য কিছু শিখেছি দেখতেই পাচ্ছ। উইলি অনর্থক অস্থায়ী উপ-বাবুর্চির কাজ করেনি। এ কথা ও বলে দিচ্ছি।"

তার মা এমন করে তার পানে তাকায় যে, সে যেন একটা বাচ্চাকে খুন করেছে। তারপর স্বামীকে ডেকে বলে, "অস্কার! এসে দেখ কি কাণ্ড হয়েছে। সে বাইণ্ডিং এর ভালো জাতের মোরগটা মেরে ফেলেছে!"

"বাইণ্ডিং? ওটা আবার কে?" উইলি জিজ্ঞেস করে।

"হায় প্রভু, পাশের বাড়ির গোয়ালা বাইনডিং! এই মোরগটা তার। এমন কাজ কেমন করে করলে?" তার মা একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

"একটা চমৎকার রোস্ট ঘুরে ঘুরে বেড়াবে আমি তা হাত ছাড়া করতে পারিনি," বিস্মিত কণ্ঠে উইলি বলে, "যখন তা আমি হাতের মুঠোয় পেয়েছি।"

তার মা কিছুতেই প্রবোধ মানে না। "এ নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী হবে আমি জানি। বাইন্‌ডিং এর যা বদমেজাজ।"

"আমাকে তুমি কি ভাবছ?" নিজকে সত্যি অপমানিত মনে করে সে প্রতিবাদ করে। "আমরা এটাকে আরাম আয়েশে খাব। বাইন্‌ডিং তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না।" সে মোরগটাকে নাড়া দিয়ে বলে, "তোমাকে খেতে নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু লাগবে। আচ্ছা, সিদ্ধ করে খাব না রোস্ট করে?"

"তুমি কি ভাবছ আমি এই মোরগের একটা টুকরোও মুখে দেব?" তার মা রেগে বলে, "এখ্‌খুনি এটাকে আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও।"

"আমার মাথা খারাপ হয়নি।" উইলি জওয়াব দেয়।

"কিন্তু তুমি যে এটা চুরি করেছ।" তার মা বিলাপের সুরে বলে।

"চুরি করেছি?" উইলি অট্টহাসি হাসে। "চমৎকার একটা কথা বলেছ! আমি এটাকে জোর করে কাজে লাগিয়েছি বলা যায়। আমি এটাকে উঠিয়ে নিয়েছি, তাও বলতে পার। কিন্তু চুরি করেছি? যদি কেউ এমনি উপায়ে টাকা পয়সা নেয় তাকে চুরি বলা চলে, তবে খাওয়ার জন্য একটা কিছু উঠিয়ে নিলে তাকে কোন মতেই চুরি বলা চলে না। তা হলে ত আমাদের কালে আমরা অনেক কিছু চুরি করেছি। তাই না আর্নস্ট?"

"নিশ্চয়ই উইলি।" আমি বলি, "এটা তো তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিলো। আমি তা জোর করেই বলতে পারি। স্টেডেনে যে ঘটনা ঘটেছিলো তোমার মনে নেই? দুই নম্বর ব্যাটারীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের মোরগটা ত তাই করেছিলো। আর তুমি তা রান্না করে কোম্পানীর সবাইকে খাইয়েছিলে।"

উইলির মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উনুনটা সে পরীক্ষা করে। "ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।" সে নিরাশ হয়ে মাকে উদ্দেশ করে বলে, "কয়লা আছে?"

উত্তেজনায় তার মায়ের মুখ দিয়ে কথা সরে না। মাথা নাড়ে মাত্র। উইলি হাত নেড়ে তার মাকে নিশ্চয়তা দেয়, "কিছু ভেবো না। কাল আমি তোমার জন্য কয়লা যোগাড় করে আনব। আপাতত এই পুরান চেয়ারটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নি; এটা অকেজো হয়ে গেছে।"

তার মা হতভম্ব হয়ে ছেলের দিকে তাকায়। তারপর ছেলের হাত থেকে চেয়ারটা আর মোরগটা ছিনিয়ে নিয়ে মোরগটা নিয়ে গোয়ালা বাইন্‌ডিং-এর বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়।

উইলি এবার ন্যায়সঙ্গত কারণেই রেগে যায়। "ব্যাপারটা দেখলে আর্নস্ট?"

আমি বেশ বুঝি যে চেয়ারটা নেওয়া হয়ত ঠিক হয় না যদিও ফ্রন্টে আমরা একবার গোশত রান্না করার জন্য একটা পিয়ানো জ্বালিয়েছিলাম। বাড়িতে বসে আমাদের সবকিছুতে হাত লাগানো উচিত নয়। কিন্তু ফ্রন্টে যে-কোন খাদ্যবস্তু প্রভুর দান হিসাবে গণ্য; এর সঙ্গে কোন নৈতিক সমস্যা জড়িত আছে বলে মনে করি না। তবে ঐ একটা মৃত মোরগ মালিকের কাছে নিয়ে গিয়ে অনর্থক গোলমালের সৃষ্টি করা যে পাগলামি তা একজন রঙরুটও বুঝতে পারে।

"এমন হলে আমাদের উপোস করতে হবে।" হতভম্ব উইলি মন্তব্য করে। "যুদ্ধ ফ্রন্টে থাকলে আধ ঘন্টার মধ্যে মোরগের রোস্ট তৈরি হয়ে যেতে। ভাবতেও কেমন লাগে।"

সে একবার উনুন আর একবার দরজার দিকে তাকায়। "এখান থেকে উধাও হয়ে গেলেই সবচেয়ে ভালো হয়।" আমি প্রস্তাব করি। "একটা যুদ্ধ বেঁধে উঠছে মনে হয়।"

কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্রাঁ হোমেয়ার—উইলির মা—ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "সে বাড়িতে নেই।" ক্ষোভে ক্রোধে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো ঠিক তখন তার চোখে পড়ে যে উইলি পোশাক পরছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মা সবকিছু ভুলে যায়। "তুমি কি এখনই চলে যাচ্ছ?"

"একটু ঘুরে আসি মা।" সে হেসে বলে।

তার মা এবার কাঁদতে শুরু করে। বিব্রত উইলি তার মায়ের কাঁধে মৃদু চাটি দিতে দিতে বলে, "ঠিক ফিরে আসব। এখন থেকে আমরা বার বার ফিরে আসব, বরং খুব তাড়াতাড়িই—"

পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমরা পাশাপাশি ক্যাসল স্ট্রীট ধরে চলতে থাকি। "লুদভিগকে সঙ্গে নিয়ে এলে ভালো হয় না?" আমি বলি।

উইলি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। "না, সে ঘুমোক; ঘুমটা তার পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয়।" শহরে বিক্ষোভ। নৌ-সেনা বোঝাই মটর লরীগুলো সগর্জনে রাজপথে আনাগোনা করছে। লাল ঝাণ্ডা উড়ছে।

টাউন হলের সামনে ইশতাহারের তাড়া লরী থেকে নামিয়ে বিলি হচ্ছে। নৌ-সেনাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সমবেত জনগণ সেগুলোর উপর সাগ্রহে চোখ বুলোয়। তাদের চোখ উল্লাসে নেচে ওঠে। দমকা হাওয়ার ঝাপটা ইশতাহারের তাড়ায় লাগতেই ইশতাহারগুলো এক ঝাঁক পায়রার মতন আকাশে উড়তে থাকে। কাগজের ইশতাহারগুলো রিক্তপত্র বৃক্ষশাখায় আটকে পতপত খসখস করে। ধূসর ওভারকোট গায়ে একজন বয়স্ক লোক ভাষণ দেয়। "কমরেডবৃন্দ, এবার অবস্থার উন্নতি হবে।" তার ওষ্ঠ কাঁপতে থাকে।

"হ্যালো! ঐখানে একটা কিছু ঘটছে মনে হয়।" আমি উইলির মনোযোগ আকর্ষণ করে বলি।

আমরা জোর কদম এগিয়ে যাই এবং ক্যাথাড্রেল স্কোয়ারের যতই নিকটতর হই ভিড়ের চাপও তত বেশি দেখতে পাই। স্কোয়ারটা লোকে লোকারণ্য। একজন সৈনিক সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। একটা গ্যাস বাতির শাদাটে আলো তার চোখ মুখের উপর কেঁপে কেঁপে পড়ছে। তার বক্তব্য আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। কারণ, দমকা হাওয়ার ঝাপটায় তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে।

একটা অস্পষ্ট থমথমে উত্তেজনা সেখানে বিরাজ করছে। জনতার ভিড়ে প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সবাই সেনাবাহিনীর লোক। কেউ কেউ আবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। লৌহ শিরস্ত্রাণের নিচে তাদের নির্বাক স্তব্ধ মুখাবয়বে ইস্পাত কঠিন অভিব্যক্তি। সীমান্তের ওপারে অবস্থিত দুশমন সেনাদের পানে তাকাবার সময় এমনি অভিব্যক্তি তাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে। কিন্তু এই অভিব্যক্তির সাথে এই মুহূর্তে আরও কিছু মিশে আছে—ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা, মধুর উজ্জ্বল নব জীবনের কুহকিনী আশা।

মঞ্চের দিক থেকে সোরগোলের শব্দ আসে; অন্য দিকে এর একটা অস্পষ্ট প্রত্যুত্তরও কানে আসে। উইলি হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে. "আসল দল। এবার মজা হবে।" সবাই হাত তোলে। সবাই সহসা চেঁচিয়ে ওঠে, "বন্ধুগণ, এবার অগ্রসর হও।" গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দে মিছিলটা পথ ধরে এগিয়ে চলে। আমরাও মিছিলের সারিতে দাঁড়িয়ে যাই। আমাদের ডান পাশে একজন গোলন্দাজ সৈনিক; সামনে জনৈক ইঞ্জিনিয়ার। আমরা স্কোয়াডে স্কোয়াডে বিভক্ত হয়ে যাই। আমরা

পরস্পরের অপরিচিত। কিন্তু নিমেষেই আমরা পরস্পরের বিশ্বাসভাজন হয়ে পড়ি। তারা আমাদের সহকর্মী কমরেড, তাই যথেষ্ট। "এসো, অটো ঢুকে পড়।" আমাদের সামনের ইঞ্জিনিয়ার একজনকে আহ্বান জানায়। সেই লোকটা তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে দ্বিধা করে। তার সঙ্গে তার স্ত্রী রয়েছে। তার স্ত্রী স্বামীর হাতে হাত গলিয়ে স্বামীর মুখের পানে তাকায়। সে বিব্রত হাসি হেসে বলে, "পরে হবে ফ্রান্স।"

উইলি মুখ বেঁকিয়ে বলে, "মেয়েমানুষ মাথা গলালেই বন্ধুত্বের অবসান হবে, তা আমি জোর গলায় বলছি।"

"আরে ধ্যাৎ! বাজে কথা।" ইঞ্জিনিয়ার প্রতিবাদ করে উইলিকে একটা সিগারেট দেয়। "নারী জাতি জীবনের অর্ধেক বটে, কিন্তু সব-কিছুরই একটা সময় অসময় আছে!"

অনিচ্ছা হলেও আমাদের পা তাল মিলিয়ে চলে। কিন্তু আমরা যেভাবে পথ চলায় অভ্যস্ত, এই চলা সেই মার্চের চলা নয়। পাকা রাজপথে আমাদের পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়। বিদ্যুতের মতন ক্ষণিক একটা প্রবল আশার আলো মিছিলেব সারির উপর চিক দিয়ে ওঠে, যেন এই রাজপথ আমাদের সরাসরি একটা স্বাধীন ও ন্যায়পরায়ণ নব জীবনের তোরণ দ্বারে পেঁৗছে দেবে।

কিন্তু কয়েক শত গজ পথ চলার পরই মেয়রের বাড়ির সামনে পেঁৗছে মিছিল থেমে যায়। জনকয়েক বাড়ির সদর দরজায় খটখট করতে থাকে। বাকি সব নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন মহিলার বিবর্ণ মুখ বন্ধ জানালার পিছনে ক্ষণিকের জন্য দেখা দেয়। খট্‌খটানী প্রচণ্ডতর হয়। কে জানালায় একটা ঢিল ছোঁড়ে, তারপর আর একটা ঢিল। জানালার কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে ঝনাৎ করে সামনের বাগানে পড়ে।

এবার মেয়র দোতালার বারান্দায় এসে দেখা দেয়। চেঁচিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কেউ তার কথা শুনতে চায় না। "বেরিয়ে এসো। আমাদের সঙ্গে এসো।" কে যেন চেঁচায়।

মেয়র মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। কয়েক মিনিট পরেই সে মিছিলের আগে আগে চলতে থাকে।

পরবর্তী যে ব্যক্তিকে টেনে হেঁচড়ে বের করা হয় সে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ দফতরের প্রধান। তারপরে আসে হতভম্ব টেকো মাথা অতিমুনাফাখোর

মাখন ব্যবসায়ী। এক শস্য ব্যবসায়ীকে আমরা ধরতে পারলাম না। আমাদের আগমন সংবাদ পেয়েই সে দরজা বন্ধ করে আত্মগোপন করেছে।

মিছিল এবার জেলা সদর দফতরের সামনে গিয়ে সমবেত হয়। একজন সৈনিক সিঁড়ি বেয়ে ছুটে ভিতরে প্রবেশ করে। আমরা বাইরে অপেক্ষা করি। জানালা দিয়ে বাতি দেখা যাচ্ছে। অবশেষে দরজা খোলে। আমরা গ্রীবা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, হাতে একটা পোর্টফোলিও নিয়ে একজন লোক বেরিয়ে আসছে। কয়েকটা কাগজ সামনে রেখে একঘেঁয়ে সুরে সে তার বক্তব্য পড়তে শুরু করে। আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি, কিন্তু ভালো করে শুনতে পাইনে। উইলি কানে হাত দিয়ে শোনে। আমাদের চেয়ে এক মাথা উঁচু বলে তার শুনতে সুবিধে হয়। সে সহজে কথাগুলো বোঝে এবং সেগুলো উচ্চস্বরে পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু কথাগুলো আবোল তাবোল মনে হয়। আমাদের মনে কোন রেখাপাত করতে পারে না; আমাদের মনে উৎসাহ চাঞ্চল্যও জাগায় না। বাজে বকুনির মতন তা শূন্যে মিলিয়ে যায়।

আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি। আমরা কথায় বিশ্বাস করিনা, কাজে বিশ্বাস করি। আমরা কাজ করে অভ্যস্ত। কিন্তু এই লোকটা এবার আমাদের শান্ত থাকতে আর পরিণামের কথা চিন্তা করতে অনুরোধ করছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ ত অশান্তির সৃষ্টি করেনি বা অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়নি।

অবশেষে সে চলে যায়। "লোকটা কে?" আমি নিরাশ হয়ে প্রশ্ন করি।

আমাদের পাশের গোলন্দাজ সেনা সবকিছু জানে। "সৈনিক ও শ্রমিক পরিষদের সভাপতি। আগে দাঁতের ডাক্তারি করত।"

"ওহো।" উইলি তার লাল চুলো মাথাটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে। "কি নিস্তেজ নির্জীব ক্লান্ত কণ্ঠ! আর আমি ভাবছিলাম, এখনি স্টেশনে গিয়ে সোজা বার্লিন পেঁছিব।"

ভিড়ের মধ্য থেকে চীৎকার শোনা যায়! "মেয়র—আমরা মেয়রের বক্তৃতা শুনতে চাই।" তাকে মঞ্চোপরে ঠেলে দেয়া হয়। ধীর শান্ত কণ্ঠে সে ব্যাখ্যা করে বলে যে, ব্যাপারটা খতিয়ে তলিয়ে দেখা হচ্ছে। তার পাশেই দুই অতিমুনাফাখোর জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তারা ঘামছে। তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। তাদের কিছু গালাগালি করা হয় মাত্র। কেউ তাদের গায়ে হাত তুলে কষ্ট করে না।

"যাক", উইলি মন্তব্য করে, "যাই হোক, মেয়রের সাহস আছে। আমি এতটুকু বলব।"

"আরে ছাড়!" গোলন্দাজ সেনা বলে ওঠে, "এ কাজে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে; কয়দিন পর পরই তাকে এমনি করে টেনে হিঁচড়ে আনা হয়।"

আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তার পানে চাই। "তুমি কি বলতে চাও এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটে?" আলবার্ট প্রশ্ন করে।

অন্যজন সম্মতি জানায়। "নতুন নতুন সৈন্যদল হামেশাই ফিরে আসছে। তারা মনে করে তারা একটা সুব্যবস্থা করে ফেলবে। আর শেষ পর্যন্ত এমনি করেই সব শেষ হয়—"

"ধ্যাৎ ছাই! আমি এ সব বুঝিনা—" বিরক্তিভরে উইলি বলে।

গোলন্দাজ সেনা প্রকাণ্ড হাই তুলে বলে, "আমিও বুঝিনা।" আমি নিজেও অন্য রকম আলাপ করেছিলাম। "বেশ, এবার তা হলে বিদায়; বরং তাড়াতাড়ি ঘরের বুড়ীর কাছেই যাই। সেটাই সবচেয়ে বিবেচনার কাজ।"

অন্যরাও তার অনুসরণ করে। স্কোয়ারটা প্রায় নির্জন হয়ে গেছে। এবার দ্বিতীয় প্রতিনিধি বক্তৃতা দিচ্ছে। সেও শান্ত থাকার উপদেশ দেয়। নেতারা এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করবে। তারা এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই লেগে আছে। সে আলোকিত জানালাগুলো দেখিয়ে বলে যে এখন ঘরে ফিরে যাওয়াই হবে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সমীচীন কাজ।

"তা হলে শেষ পর্যন্ত এই হলো?" আমি বিরক্ত হয়ে বলি।

এই জনতায় যোগ দেয়াটা আমাদের অন্যায় হয়েছে। আমরা যখন এখানে এসেছিলাম, তখন আমরা আসলে কি চেয়েছিলাম? উইলিরও মোহ-মুক্তি ঘটেছে।

আমরা দুজন আবার পথে পা বাড়াই।

আমি উইলির সঙ্গে তার বাড়ি পর্যন্ত যাই। তারপর একলা নিজের বাড়িতে ফিরে আসি। এক অদ্ভুত ব্যাপার—আমার বন্ধুদের কেউ এখন সঙ্গে নেই বলে আমার চতুর্দিকে সবকিছু যেন দুলতে থাকে। সবকিছু অলীক অবাস্তব মনে হয়। কতকক্ষণ আগেও এই সবকিছু ছিলো নিশ্চিত বাস্তব। এখন সবকিছুর প্রতি যেন মন শিথিল নিরাসক্ত হয়ে গেছে। সমস্ত ব্যাপারটা এমনি অভিনব ও বিস্ময়কর যে, আমি বুঝতেই

পারছি না আমি স্বপ্ন দেখছি কিনা। আমি কি এখানে আছি? সত্যি কি আমি আবার আমার গৃহে ফিরে এসেছি?

এখানে পাকা সুবিন্যস্ত রাজপথ আর পরিষ্কার চকচকে বাড়ির ছাদ রয়েছে। কোথাও হাঁ-করা গর্ত বা শেল বিধ্বস্ত জায়গা নেই। অক্ষত প্রাচীর-গুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নীল আকাশের পটভূমিকায় বাড়ির কার্নিশ আর বন্ধ বারেন্দার কালো ছায়ামূর্তি দৃশ্যমান। এখানকার কোন কিছুতেই যুদ্ধের সর্বনাশা দংশন পড়েনি ; কাঁচের শার্সিগুলো অক্ষত, জানালার উজ্জ্বল রঙিন পর্দার পিছনে শান্ত নিভৃত পৃথিবী। এই পৃথিবী মৃত্যু বিভীষিকাময় আর্তনাদপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক ভিন্ন। সেই পৃথিবীতে আমি এই সে দিন পর্যন্ত বসবাস করে এসেছি।

একটা বাড়ির নিচ তলার জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ভিতরে আলোর আভা পড়ছে। আমি বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি। ঘর থেকে সঙ্গীতের অনুচ্চ সুর ভেসে আসে। জানালার আধখোলা পর্দার ফাঁক দিয়ে ভিতরটা দেখা যায়।

একজন বসে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে। ঘরে সে একলা। একটা-মাত্র ল্যাম্পের আলো স্বরলিপির সাদা পৃষ্ঠায় পড়ছে। ঘরের অন্যান্য অংশ রঙিন আলোর আভায় ম্লান। একটা সোফা, দুটো আরাম কেদারা আর গদিআঁটা আসবাব বাড়ির অধিবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিপূর্ণ জীবনের ইঙ্গিত বহন করছে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন পলকহীন চোখে চেয়ে থাকি। মেয়েটা উঠে। নীরবে টেবিলের দিকে যাচ্ছে দেখে আমি দ্রুতপদে পিছনে সরে যাই। আমার বুক দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে। রকেটের উৎকট ঝলসানিতে আর সীমান্তের যুদ্ধবিধ্বস্ত গাঁয়ের মাঝখানে বসে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, এমন শান্তিময় জীবনের অস্তিত্ব এখনও আছে—এমন কার্পেট পাতা বন্ধ প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ, এমন উষ্ণতা, এমন নারী সাহচর্য। আমার বাসনা জাগে, দুয়ারটা খুলে ভিতরে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে উষ্ণ কোমল শয্যায় শুয়ে পড়ি। আমার বাসনা জাগে, শয্যায় শুয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সেখানকার উষ্ণতা উপভোগ করি। এই উষ্ণতার প্লাবন আমার উপর দিয়ে বয়ে যাক। আমার বাসনা জাগে, সেখানে গল্প করে আমার অতীত জীবনের কঠোরতা হিংস্রতা ঝেড়ে মুছে ফেলি—নোংরা জামার মতন অতীতকে টেনে ছুঁড়ে ফেলি। ঘরের আলোটা নিভে যায়। আমি আবার পথ চলতে থাকি।

কিন্তু সহসা রাত্রির বুক করুণ আর্তনাদ আর অস্পষ্ট ধ্বনি, চেনামুখ আর অতীত ঘটনাবলী এবং প্রশ্নোত্তরে ভরে ওঠে। আমি ঘুরে ঘুরে শহর সীমার বহু বাইরে গিয়ে ক্লাস্টার বার্গের ঢালু ভূমিতে গিয়ে পৌঁছি। নিম্নে রজতোজ্জ্বল শহর, নদীতে চন্দ্র কিরণ প্রতিবিম্বিত। শহরের চূড়াগুলো যেন শূন্যে ভাসছে। সব অবিশ্বাস্য স্তব্ধ নিঝুম।

সেখানে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার রাজপথ ধরে বাড়িতে ফিরে যাই। অন্ধকারে হাতড়িয়ে আমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠি। মা, বাবা প্রতীক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁদের শ্বাস নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। মায়ের শ্বাস-নিশ্বাস শান্ত, বাবার গম্ভীর। এত দেরিতে বাড়ি ফিরেছি বলে লজ্জা বোধ করি।

ঘরে বাতি জ্বালাই। ঘরের কোনে আমাব শয্যা নতুন চাদরে ঢাকা। কতকক্ষণ শয্যার উপর চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকি। অবশেষে ক্লান্তি নেমে আসে। যন্ত্রচালিতের মতন সটান শুয়ে কম্বলটা টেনে নিই। হঠাৎ আবার উঠে বসি। ভুলে কাপড় বদলাইনি। ফ্রণ্টে থাকতে আমরা যে কাপড় পরে থাকতাম তাই নিয়ে ঘুমোতাম। ধীরে গায়ের উর্দিটা খুলি, বুট জোড়া ছেড়ে এক কোণে রেখে দিই। সহসা দেখতে পাই. আমার শয্যায় কিনারে রাতে পরার একটা সার্ট ঝুলছে। সার্টটা চেনাও যায় না। আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। বিছানার চাদরটা ঝেড়ে মুছে আমি বালিশে মাথা রাখি। বালিশটা আমি আবার বুকে টেনে নেই। এবার নিজেকে ঘুমের আস্তরণে ঢেকে দিই। জীবনের গভীরে ডুব দিই। আমি একটি মাত্র সত্য উপলব্ধি করি: আমি এখানে আছি— এখানে—আমার স্বগৃহে।

৩

অ্যালবার্ট আর আমি কাফে মেয়রে জানালার পাশে বসে আছি। আমাদের সামনে মার্বেল পাথরের টেবিলের উপর দুই গ্লাস ঠাণ্ডা কফি। তিন ঘণ্টা হলো এখানে এসেছি। এখনো সিদ্ধান্ত করতে পারিনি এমন তেতো পানীয়টা খাব কিনা। যুদ্ধ সীমান্তে অবশ্য সব রকম পানীয়ের সাথে পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু এই পানীয়টা সরাসরি কয়লার আগুনে গরম করা।

মাত্র তিনটে টেবিলে গ্রাহক রয়েছে। একটাতে দু'জন মুনাফাখোর বসে এক গাড়ি বোঝাই খাদ্যপণ্য নিয়ে দর কষাকষি করছে আর একটায় এক বিবাহিত দম্পতি বসে খবরের কাগজ পড়ছে। আর তৃতীয় টেবিলে আমরা দু'জন অসভ্যের মতন হাত পা ছড়িয়ে লাল কাপড়ের ঢাকনি দেয়া গদী আঁটা আসনে ঠেস দিয়ে আছি।

ঘরের পর্দাগুলো ধুলো ময়লায় নোংরা ; পরিচারিকাটি হাই তুলছে। ঘরের হাওয়াটা গুমট ভরা। সব মিলে এখানকার পরিবেশের অনুকূলে বেশি কিছু বলার নেই। কিন্তু আমাদের মনে বেশ কিছু বলার আছে। আমরা হৃষ্টচিত্তে বসে আছি। আমাদের অফুরন্ত অবসর। অর্কেস্ট্রা বাজছে। আমরা জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখতে পারছি।

আমরা বসে আছি। শেষ পর্যন্ত বাজনদাররা তাদের যন্ত্রপাতি গুটিয়ে ফেলে ; পরিচারিকাও বিরক্ত হয়ে আমাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে। আমরা কফির দাম চুকিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ি। এমনি করে এক দোকানের জানালা থেকে অন্য দোকানের জানালায় অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে চমৎকার লাগে। কোন ভাবনা চিন্তা নেই—মুক্ত মানুষের মতন ঘুরে বেড়ানো মাত্র। মুক্ত বিহঙ্গের ডানা মেলে আকাশের ওড়ার অধীর আনন্দ।

স্ট্রবেন স্ট্রীটে পৌঁছে আমরা থমকে দাঁড়াই। "বেকারকে দেখতে গেলে কেমন হয়?" আমি বলি।

"চমৎকার কথা বলেছ। চলো, সে অনেক কথা বলবে। আমি বাজি ধরে বলছি।" আলবার্ট আমার প্রস্তাব সমর্থন করে।

স্কুল জীবনে অনেক সময় আমরা বেকারের দোকানে কাটিয়েছি। হরেক রকম জিনিসের দোকান। খাতা-পত্র, ছবি আকার সরঞ্জাম, ফড়িং ধরার জাল, মাছ পালার বাক্স, ডাক টিকেটের সংগ্রহ, পুরানো বই পত্র এবং বীজ গণিতের নোট বই। তার দোকানে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম। এখানেই আমরা গোপনে ধূমপান করতাম। আর এখানেই আমরা পিটি স্কুলের মেয়েদের সাথে গোপন সাক্ষাৎ করতাম। বেকার ছিলো আমাদের অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি।

আমরা দোকানে ঢুকতেই স্কুলের দুটো ছাত্র চট করে তাদের হাতের সিগারেট লুকিয়ে ফেলে। আমরা হেসে মুরুব্বীয়ানার ভাব দেখাই। একটা মেয়ে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করে, আমরা কি চাই।

"আমরা হের বেকারের সাথে দেখা করতে চাই। যদি মেহেরবানী করে ডেকে দাও তবে" আমি তাকে বলি।

মেয়েটা দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে "আমাকে দিয়ে কি হবে না?"

"না ফ্রলিন, বরং হের বেকারকে ডেকে দাও।" আমি বলি।

মেয়েটা চলে যায়। আমরা সগর্ব ভঙ্গিতে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে অপেক্ষা করি। এই ভাব ভঙ্গি দেখলে মেয়েটা বেকারকে ডেকে আনবে।

আমরা দরজা খোলার অতি পরিচিত শব্দ শুনতে পাই। বেকার ঘরে প্রবেশ করে। ঠিক আগের মতন ছোট মানুষটি, অবিন্যস্ত এলোমেলো চুল। এক মুহূর্ত সে মিটমিট করে তাকিয়ে আমাদের চিনতে পারে। "আরে! বিরখলস আর ট্রসকি যে! ফিরে এসেছ দেখছি।" সে বলে।

"হ্যাঁ," উত্তরটা দিয়ে আরো কিছু আবেগপূর্ণ উক্তি শুনব বলে অপেক্ষা করি। "খুব ভালো। কি চাও? সিগারেট?" সে প্রশ্ন করে।

আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খাই। বিব্রত বোধ করি। কিছু একটা কিনব বলে আমরা আসিনি।

"হ্যাঁ, দশটা।" অবশেষে আমি নিজকে সামলে নিয়ে জওয়াব দেই।

সে আমাদের দশটা সিগারেট দেয়। "আচ্ছা, আবার দেখা হবে," বলে সে প্রস্থান করে। আমরা ওখানে মুহূর্ত খানেক দাঁড়িয়ে থাকি। বেকার পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করে "কিছু ভুলে রেখে যাচ্ছ নাকি?"

"না, না।" জওয়াব দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি।

বাইরে এসে বলি, "ও মনে করছে, আমরা হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।"

আলবার্ট নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে, "বেসামরিক মাথামোটার দল।"

আমরা ঘুরে বেড়াই। শেষ সন্ধ্যায় আমরা উইলির বাড়িতে পেঁৗছে সেখান থেকে সবাই মিলে ব্যারাকের দিকে যাত্রা করি।

পথ চলতে চলতে উইলি সহসা পথে এক পাশে লাফিয়ে পড়ে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে পথের উপর গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ি। শেল উড়ে আসার নির্ভুল আওয়াজ। তারপর হতভম্বের মতন চারদিকে চেয়ে আমরা হেসে উঠি। শেলের আওয়াজ নয়। বিজলী চালিত ট্রামের শব্দ মাত্র।

জাপ আর ভ্যালেইনন্টিন কেমন যেন মন-মরা নিঃসঙ্গ। একটা সম্পূর্ণ পল্টনের বসবাসের জন্য নির্ধারিত শূন্য কক্ষে দু'জন বসে আছে। মনে হলো জাদেন এখনো ফেরেনি। সে এখনো বেশ্যা বাড়িতে পড়ে আছে সন্দেহ নেই। আমাদের দেখা মাত্র তাদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এখন তারা স্কেট খেলার সাথী পাবে।

এই কয়দিনেই জাপ সেনাপরিষদের সদস্য হয়ে গেছে। সে নিজেই নিজেকে এই পদে নিয়োগ করে নিয়েছে এবং এখনও তার সদস্য পদ বহাল আছে। কারণ ব্যারাকে এত হট্টগোল আর বিশৃঙ্খলা যে, সদস্য অসদস্যের মধ্যে কোন পার্থক্য বিচার নেই। আপাতত এতেই তার চলে যাবে। কারণ বেসামরিক চাকরিটা তার গেছে। যে সলিসিটারের অধীনে কলোনে সে চাকরি করতো. সেই সলিসিটার তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, মেয়েরাই আজকাল খুব চমৎকার কাজ করছে এবং অনেক সস্তায়। অন্য দিকে জাপ এত দিন সেনাবাহিনীতে থেকে নিশ্চয়ই অফিসের কাজকর্ম ভুলে গেছে। সলিসিটার দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে, দিন কাল বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে সলিসিটার চিঠিতে জাপের ভবিষ্যৎ সুদিন কামনা করেছে। জাপ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, "এই কয় বছর সকলেই চেয়েছে যাতে যুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যেতে না হয়, কিন্তু এখন সবাই সেনাবাহিনীতে লেগে থাকতে পারলে বর্তে যায়। সুতরাং কলোনে থাকা আর এখানে থাকা একই কথা, দুটোই সমান। যাক, আমার ডাক আঠার।"

উইলি ভালো হাত পেয়েছে। আমি তার হয়ে হাঁকি, "বিশ। এবার ভ্যালেনটিন তোমার পালা।"

সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে হাঁকে, "চব্বিশ।"

জাপ চল্লিশ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কার্ল ব্রোগার এসে হাজির হয়। "ভাবলাম তোমরা কি করছ তাই একবার দেখে যাই।" সে বলে।

"তুমি দেখতে এলে, তাই না?" উইলি বোকার মতন হেসে নড়ে চড়ে আরাম করে বসে। "অবস্থা বিশেষে ব্যারাকই সৈন্যদের আসল বাড়ি। একচল্লিশ।"

"ছয়চল্লিশ" ভ্যালেনটিন যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে হাঁক ছাড়ে।

"আট চল্লিশ" উইলি গর্জন করে।

"হায় প্রভু! ডাক যে অনেক উঠে গেলো।" আমরা আরও ঘেঁষাঘেঁষি করে বসি। উইলি পিছনে আরামে হেলান দিয়ে ভ্যালেনটিনের অজ্ঞাতসারে আমাদের তার হাত দেখায়। বড়, খুব বড় হাত। কিন্তু ভ্যালেনটিন দাঁত বের করে কুটিল হাসি হাসে। তার হাত আরও বড়।

ব্যারাক জীবন চমৎকার আরামদায়ক। টেবিলের উপর একটা মোমবাতি কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। জাপ কোথেকে বড় এক টুকরো পনির যোগাড় করে এনেছে। তাই সে বেয়নেটের মাথায় লাগিয়ে সবাইকে টুকরো টুকরো দেয়। আমরা তা তৃপ্তি ভরে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই।

"পঞ্চাশ"। ভ্যালেনটিন হাঁক ছাড়ে।

ঘরের দরজাটা খুলে যায় আর জাদেন ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে। "সি—সি" সে তোতলাতে থাকে আর উত্তেজনায় তার হেঁচকি উঠে।

তার হাত দুটো উঁচু অবস্থায় আমরা তাকে নিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াই। উইলি সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করে "মাগীগুলো কি তোমার সব পয়সা-কড়ি কেড়ে নিয়েছে?"

সে মাথা নাড়ে আর তোতলায়, "সি—সি।" "হল্ট্!" উইলি হুকুম করে। জাদেন এটেনশন হয়ে দাঁড়ায়। তার হেঁচকি থেমে যায়। "সিলিগ—আমি সিলিগকে আবিষ্কার করেছি।" সে খুশিতে উপচে পড়ে। "শোন ছোকরা! যদি মিথ্যে বল, তবে তোমাকে জানালা দিয়ে ফেলে দেব, মনে রেখো।" উইলি গর্জে ওঠে।

সিলিগ ছিলো আমাদের কোম্পানীর সার্জেণ্ট মেজর; এক নম্বরের একটা শূয়র। দুঃখের বিষয় বিপ্লবের দু মাস আগে বদলি হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তার পাত্তা মেলেনি। জাদেন এবার বুঝিয়ে বলে যে, সিলিগ একটা মদের দোকান দিয়েছে. 'কনিগ উইলহেলম।' সেখানে চমৎকার বিয়ার পাওয়া যায়।

"এসো সেখানে যাই।" বলতেই সবাই এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। "কিন্তু ফাডিন্যাণ্ডকে ফেলে কিন্তু যাব না।" উইলি জানিয়ে দেয়। "তাকে আগে বের করতে হবে।" শ্রোডারের হয়ে সিলিগের সাথে তার একটা বোঝাপড়া রয়েছে।

কসোলের বাড়ির সামনে পৌছে আমরা শিস দিই; ম্যাও ম্যাও করে বিড়ালের ডাক ডাকি। সে রাতের পোশাক পরেই রেগে গরগর করতে

করতে জানালার কাছে আসে। "এত রাতে তোমরা কি নষ্টামী করতে এসেছ? তোমরা জাননা, আমি বিবাহিত মানুষ?"

"তার জন্য অনেক সময় আছে।" উইলি গর্জে জওয়াব দেয়। "গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে এসো, আমরা সিলিগকে আবিষ্কার করেছি।"

ফার্ডিন্যাণ্ড এবার উৎসাহিত হয়ে ওঠে। "সত্যি বলছ?" সে শুধায়।

"আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা যেমন সত্য, তেমন সত্য।" জাদেন তাকে নিশ্চয়তা দেয়।

"বেশ, আমি আসছি। যদি আমাকে অনর্থক বাঁদর নাচ নাচাও তবে প্রভুই জানেন তোমাদের কি দশা হবে।" সে বলে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিচে নেমে সে সব ব্যাপারটা জেনে নেয়। আমরা বেরিয়ে পড়ি।

হুক স্ট্রীটে ঢোকার পথে উইলির উত্তেজনায় একজন পথচারীর গায়ে উইলির ধাক্কা লাগে ; লোকটা উল্টে পড়ে যায়।

"বেটা, গুণ্ডা কোথাকার!" ভূলুণ্ঠিত লোকটা উইলিকে গালি দেয়।

উইলি তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। লোকটার মাথার উপর দাঁড়িয়ে মারমুখো হয়ে বলে, "তুমিই কি এই মাত্র কথা বলছিলে?"

লোকটা কোন মতে উঠে উইলির পানে চেয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই জওয়াব দেয়, "কিছু বলেছি বলে ত আমার মনে পড়ছে না।"

"তোমার জন্য ভালোই হলো। আমাকে অপমান করার মতন দৈহিক বলিষ্ঠতা তোমার নেই।" উইলি বলে দেয়।

পার্কটা কোণাকুণি পার হয়ে আমরা 'কনিগ উইলহেলমের' সামনে সমবেত হই। 'কনিগ উইলহেলম' নামটা রঙ দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। বর্তমান নাম—এভেলওয়েস। উইলি দরজার ছিটকিনিতে হাত দেয়। "একটু থাম।" এই বলে কসোল তার বিরাট থাবাটা ধরে। "উইলি," সে প্রায় কাতর কণ্ঠে বলে, "যদি একটা মারামারি বাধেই তবে আমিই তা করব। রাজী আছ? কথা দাও।"

"বেশ তাই হবে," উইলি সম্মতি দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলে।

চেঁচামেচি চোখ ধাঁধানো আলো আর ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলি আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। অর্কেস্ট্রা থেকে মার্চের সুর বাজছে। কাউন্টার সংলগ্ন

মদের পিপার নলটা চকমক করছে। ঘরের এক কোণে দুটো মেয়ে গ্লাসের ফেনা সাফ করছে আর হাসছে। তাদের হাসির ঘূর্ণি ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের চারপাশে জনকয় লোক এদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করছে। মেঝের ছলকানো জলে মেয়ে দুটোর স্ফুরিত হাত ও মুখের প্রতিবিম্ব পড়ছে। এক গোলন্দাজ সেনা মদের অর্ডার দেয়ার সময় মেয়েটার নিতম্ব দেশে চিমটি কেটে মনের আনন্দে বলে, "যুদ্ধপূর্ব কালের আসল মাল চাই, বুঝলে লীনা?"

আমরা লোকজনদের ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করি। "তাই ত! ঐ যে বেটা ছেলে।" উইলি বলে।

কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে সিলিগ মদ ঢালছে। তার আস্তিন গোটানো, সার্টের বোতাম খোলা, তার গা বেয়ে ঘাম ঝরছে। তার মেদবহুল হাতের নিচে রাখা গ্লাসে সোনালী রঙিন মদ রয়েছে। এবার সে চোখ তুলে তাকায়। আমাদের দেখে তার সারা মুখে হাসি ফোটে। "হ্যালো, তোমরা এসেছ। কি চাই? কড়া না হালকা?"

"হালকাই দাও সার্জেন্ট মেজর।" জাদেন উদ্ধত কণ্ঠে জওয়াব দেয়। সিলিগ চোখ বুলিয়ে আমাদের সংখ্যা গুণতে থাকে।

"সাত," উইলি বলে দেয়।

"সাত", সিলিগ কথাটার পুনরাবৃত্তি করে একবার ফার্ডিন্যাণ্ডের দিকে তাকায়। "ছয়—আর কসোল! কি আশ্চর্য।"

ফার্ডিন্যাণ্ড কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের কোণে দু হাত ভর দিয়ে দাঁড়ায়। "সিলিগ, তোমার এখানে রাম আছে?"

ব্যস্তত্রস্ত সিলিগ থতমত খেয়ে বলে, "রাম? হঁ্যা, নিশ্চয়ই আছে।"

কসোল তার পানে চেয়ে বলে, "এই জিনিসটার প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব আছে, আমার যতটুকু মনে পড়ে।"

সিলিগ এক সারি গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলে, "আসলেই রাম আমি পছন্দ করি।"

"শেষ বার তুমি যে 'রাম' টেনে বেসামাল হয়েছিলে সে কথা তোমার মনে পড়ে?"

"না, তা ত মনে পড়ছে না—"

"আমার কিন্তু মনে পড়ছে।" কসোল কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ষাঁড় যেমন করে শিকারের পানে তাকায় তেমনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সিলিগের পানে তাকিয়ে গর্জে ওঠে। "স্রোডারের নাম কখনো শুনেছ?"

"স্রোডার? এটা একটা মামুলি নাম।" সিলিগ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে।

কসোলের পক্ষে এই জওয়াব অসহনীয়। সে সিলিগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়, কিন্তু উইলি তাকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়। "মদটা খেয়ে নাও—সাতটা হালকা—" সে কাউন্টার লক্ষ্য করে বলে।

কসোল নীরব। আমরা একটা টেবিলে গিয়ে বসি। সিলিগ নিজেই মদের বোতলগুলো নিয়ে আসে, "তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।" সে বলে।

"তোমার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।" জাদেন জওয়াব দেয়। আমরা এবার চুমুক দিই। জাদেন পিছনে হেলান দিয়ে বসে। "আমি সিলিগের অবস্থানের কথা সত্যি বলিনি?"

ফার্ডিন্যাণ্ডের দৃষ্টি সিলিগকে অনুসরণ করে। "স্রোডারকে কবর দেওয়ার রাতে এই নচ্ছারের গা থেকে রামের কি উৎকট গন্ধই না বেরোচ্ছিলো—" ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিড় বিড় করে।

সে সহসা ছুটে যায়। "ঘায়েল না করে ফিরবে না।" জাদেন চাপা কণ্ঠে বলে দেয়।

কসোলের কথাগুলো সহসা যেন আমাদের স্মৃতির দুয়ার থেকে একটা পর্দা টান মেরে সরিয়ে নিলো। এর আগে এই পর্দাটা মৃদু মৃদু দুলতো, নড়াচড়া করতো। এবার কক্ষাভ্যন্তরে একটা বিষণ্ণ ও ভৌতিক নির্জনতা বিরাজ করতে লাগলো; কক্ষের গবাক্ষগুলো যেন শূন্যে মিলিয়ে গেলো। কক্ষের মেঝে ভেদ করে অতীতের স্মৃতি যেন ধূমায়িত কক্ষে ডানা ঝাপটে উড়তে লাগলো।

কসোল ও সিলিগের মধ্যে কোন দিনই সদ্ভাব ছিলো না। কিন্তু ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসের পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে কোন ভয়ঙ্কর দুশমনির সৃষ্টি হয়নি। আমরা তখন ফ্রণ্ট লাইনের পিছনে একটা বিধ্বস্ত ট্রেঞ্চ অধিকার করে রেখেছিলাম।

সারা রাত আমাদের একটা এজমালী কবর খুঁড়তে হয়েছিলো। কবরটা খুব গভীর করে খনন করা সম্ভবপর হয়নি। কারণ শীগগরিই মাটির

তলা থেকে পানি উঠতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত এক হাঁটু কাদায় দাঁড়িয়ে আমাদের খনন কাজ করতে হয়।

বেথকি, ভেসলিং আর কসোল কবরের কিনারগুলো সমান করার কাজে ব্যস্ত ছিলো। অবশিষ্টরা আমাদের সামনের অঞ্চলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাশগুলো কুড়িয়ে এনে কবরের কাছে পাশাপাশি সারিবদ্ধভাবে রাখছিলাম। কবর খোঁড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত লাশগুলো এখানে থাকুক। আমাদের সেকশন কর্পোরেল আলবার্ট ট্রুসকি। সে লাশগুলোর দেহ থেকে সনাক্ত-চাকতি আর বেতনের বইগুলো সংগ্রহ করছিলো।

কয়েকটা লাশ ইতিমধ্যেই পচে গেছে, মুখ কালচে হয়ে গেছে। বর্ষার মওসুমে লাশ খুব দ্রুত পচতে শুরু করে, তবে গ্রীষ্মের মতন তখন লাশগুলো এত দুর্গন্ধময় হয় না। কয়েকটা লাশ ভিজে স্পঞ্জের মতন হয়ে গেছে। একটা লাশ ঈগল পাখির মতন হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে। লাশটা তুলতে গিয়ে দেখলাম গায়ের ছেঁড়া উর্দির টুকরো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার দেহটা পচে মণ্ডের মত হয়ে গেছে। দেহে সনাক্ত-চাকতি পাওয়া গেলো না। কোথায় পড়ে গেছে। তার উর্দিতে একটি তালি দেখে তবে চিনতে পারলাম যে, এটা ল্যান্স কর্পোরেল গ্রেজারের লাশ। তার দেহের ওজন হাল্‌কা হয়ে গেছে; কারণ তার দেহের অর্ধেকের মতন নেই। তাকে তুলে আনতে কষ্ট হয়নি।

লাশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আমরা একটা ওয়াটার প্রুফ সিটে আলাদা করে রেখে দিলাম। "তাতেই চলবে।" বেথকি গ্রেজারের লাশটা আনার পর বললো, "আর এনে কাজ নেই।"

আমরা কয়েক বস্তা ক্লোরাইড অব লাইম আনি। জাপ একটা শাবল দিয়ে তা কবরে ছড়িয়ে দেয়। একটু পরেই আমাদের অস্থায়ী ভাণ্ডার থেকে সে কয়েকটা ক্রুস নিয়ে আসে। আমাদের অবাক করে দিয়ে সিলিগও অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে হাজির হয়। আমাদের হাতের কাছে কোন পাদ্রী নেই; আমাদের দুজন অফিসারও অসুস্থ। তাই সিলিগকে সম্ভবত মৃতদের শেষকৃত্য পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই সে বিরক্ত। একে ত সে রক্ত দেখলেই ভয় পায়, তার উপর সে স্থূলকায়। তা ছাড়া, সে রাত-কানা; অন্ধকারে সে বড় একটা দেখতে পায় না। সব মিলে তাকে এত ভীত-সন্ত্রস্ত আর অস্থির চঞ্চল করে তোলে যে সে পা বাড়াতে গিয়ে নিজেই কবরের গর্তে পড়ে যায়। জাদেন অট্টহাসি

হেসে চাপা গলায় বলে, "শাবল চালাও ছেকারার দল। ওকেও শাবল চালিয়ে চাপা দিয়ে দাও।"

ঘটনাক্রমে কসোল ঠিক সেই জায়গায়ই কবরটা খুঁড়ছিলো। পড়বি ত পড় সিলিগ ঠিক তার মাথার উপরই পড়লো। ঠিক দুই হন্দর ওজনের একটা জেন্দা লাশের বোঝা। কসোল খুন করবে বলে শাসানি দেয়। সার্জেণ্ট মেজরকে চিনতে পারলো, কিন্তু সে নিজে পুরানো সৈনিক—১৯১৮ সালের ব্যাপার—তাই সে দমলো না। সার্জেন্ট মেজর নিজে নিজেই কোন রকমে উঠে সামনে কসোলকে দেখে গালাগালি আরম্ভ করলো, কিন্তু কসোলও সমান তালে তাকে গালাগালি দিলো। বেথকি নীচেই ছিলো। সে তাদের দুজনকে থামাতে চেষ্টা করলো। ক্রুদ্ধ সার্জেন্ট মেজর কসোলকে গালাগালি দিতে থাকে। কসোলকে সাহায্য করার মানসে উইলিও লাফ দিয়ে নিচে নামে। কবরের ভিতর থেকে তুমুল চেঁচামেচি বেরিয়ে আসে।

কে একজন হঠাৎ বলে উঠলো, "শান্ত হও!" কণ্ঠস্বর যদিও ধীর স্থির তবু মুহূর্তে সব চেঁচামেচি থেমে গেলো। সিলিগ হাঁপাতে হাঁপাতে কবর থেকে উঠে পড়লো। তার উর্দি চুর্ণে সাদা হয়ে গেছে। তাকে সারা গায়ে চিনিমাখা খোকার মতন দেখাচ্ছে। কসোল আর বেথকিও কবর ছেড়ে উঠে পড়ে।

কবরের উপরে ছড়ির উপর ভর দিয়ে লুদভিগ ব্রেয়ার দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ সে পরিখার সামনের খোলা জায়গাটায় গায়ে দুটো গ্রেট কোট চাপিয়ে শুয়েছিলো। সেটাই তার আমাশয়ে প্রথম আক্রমণ।

"কিসের গোলমাল?" সে প্রশ্ন করে। তিনজন একই সঙ্গে তাকে বলতে চায়। শ্রান্তভাবে সে তাদের থামিয়ে দেয়। "যাক, এতে এমন কি হয়েছে?"

সার্জেন্ট মেজর অভিযোগ করে যে কসোল তার বুকে আঘাত করেছে। তা শুনে কসোল আবার রেগে ওঠে।

"চুপ কর।" লুদভিগ আবার বলে। আবার সবাই চুপ করে। "আলবার্ট, সব সনাক্ত চাকতি পেয়েছ?" "হ্যাঁ," ট্রসকি জওয়াব দেয়। তারপর কসোল যাতে শুনতে না পায় সে আস্তে বলে, "স্রোডারের সনাক্ত-চাকতিটাও।"

এক মুহূর্ত একে অপরের পানে চেয়ে থাকে। তারপর লুদভিগ বলে, "তা হলে সে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা পড়েনি। কোনটা তার লাশ? কোথায়?"

আলবার্ট তাকে সঙ্গে করে লাশের সারির পাশ দিয়ে নিয়ে যায়। ব্রোগার আর আমি তাদের অনুসরণ করি। গ্রোডার আমাদের সঙ্গে একই স্কুলে পড়তো। আলবার্ট একটা লাশের সামনে এসে দাঁড়ায়। লাশটার মাথা একটা বস্তা দিয়ে ঢাকা। ব্রেয়ার মাথা নুয়ালে আলবার্ট তাকে টেনে ধরে মিনতি করে, "না, তার মুখ থেকে বস্তাটা সরিয়োনা লুদভিগ!" ব্রেয়ার ফিরে দাঁড়ায়।

গ্রোডারের দেহের উর্ধ্বাংশে চেনার মতন কিছু অবশিষ্ট নেই; থেৎলে চেপ্টা হয়ে গেছে। চেহারার কেবল দাঁতের মাড়িসহ কালো মুখ গহ্বরটিই দৃষ্ট হয়! ব্রেয়ার নিঃশব্দে মুখটা ঢেকে দেয়। কসোল যেখানে কবর খুঁড়ছে সেদিক তাকিয়ে লুদভিগ বলে, "সে জানে?" আলবার্ট মাথা নাড়ে। "সার্জেন্ট মেজর যাতে এখান থেকে সরে যায় সে ব্যবস্থা কর, নতুবা একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যাবে।" আলবার্ট বলে।

গ্রোডার ছিলো কসোলের বন্ধু। এই বন্ধুত্বের কারণ আমরা সঠিক কখনো বুঝতে পারিনি। কারণ গ্রোডার ছিলো কোমল স্বভাব, একেবারে ছেলেমানুষ, ফার্ডিন্যাণ্ডের ঠিক উল্টো; তবু ফার্ডিন্যাণ্ড ঠিক মায়ের মতন তাকে আদর ও স্নেহ যত্ন করতো।

আমাদের পিছনে কে যেন দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। সিলিগ আমাদের অনুসরণ করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। "এমন বীভৎস দৃশ্য আমি কোন দিন দেখিনি: কেমন করে এমনটি হলো?" সে তোতলিয়ে বলে।

কেউ তার কথার জওয়াব দেয় না। আট দিন আগেই গ্রোডারের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু সিলিগ তাকে আর কসোলকে দেখতে পারতো না বলে তাতে বাধ সাধে। গ্রোডারের বাড়ি যাওয়া হয়নি। আর আজ সে এখানে মরে পড়ে আছে।

আমরা সেখান থেকে চলে আসি। এই মুহূর্তে ঘেন্নায় সিলিগের পানে তাকাতে ইচ্ছে করছিলো না। ব্রেয়ার হামাগুড়ি দিয়ে আবার গ্রেট কোটের ভিতর ঢুকে পড়ে। আলবার্ট একলা সেখানে রয়ে যায়। সিলিগ লাশটার পানে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে। মেঘের আড়াল থেকে

চাঁদটা উকি দিতেই চাঁদের আলো মুখটার উপর পড়ে। সার্জেন্ট মেজর তার মেদবহুল দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে গ্রোডারের বিবর্ণ বীভৎস মুখটার পানে পলকহীন চেয়ে থাকে। সেই মুখে একটা ভীতির অব্যক্ত অভিব্যক্তি ; একটা জমাট বাঁধা যন্ত্রণা যেন নীরবে আর্তনাদ করছে।

"এবার বরং প্রার্থনা শেষ করে এখান থেকে বিদায় নাও।" আলবার্ট অবজ্ঞার সুরে সিলিগকে বলে দেয়।

সার্জেন্ট মেজর কপাল মোছে। "আমি পারব না।" সে অস্ফুট কণ্ঠে বলে। সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই আছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটা লোক হয়ত কিছুই অনুভব করছে না। তারপর সহসা এমন একটা কিছু নতুন অদৃশ্যপূর্ব ঘটনা ঘটে যায় যাতে তাকে ভেঙ্গেচুরে দিয়ে যায়। সিলিগ বিবর্ণ মুখে টলতে টলতে সেখান থেকে পালিয়ে পরিখায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

জোর বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। সার্জেন্ট মেজর আর ফিরে না। অবশেষে আমরা ব্রেয়ারকে তার গ্রেট কোট থেকে আবার টেনে বের করে আনি। শান্ত কণ্ঠে সে শেষ প্রার্থনা আবৃত্তি করে।

লাশগুলোকে একে একে আমরা কবরে নামাই। ওয়েল লাশের নিচে হাত রেখে আমাদের হাত থেকে লাশগুলো নিয়ে কবরে শুইয়ে দেয়। লক্ষ্য করলাম, সে কাঁপছে আর অতি অস্ফুট কণ্ঠে বলছে, "তোমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।" বার বার সে এ কথাগুলো আবৃত্তি করে। আমি বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে থাকি।

"তোমার হলো কি?" আমি তাকে প্রশ্ন করি। "এই ত প্রথম লাশ দাফন নয় তা তুমি জান। সকলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে নিতে তোমার কাজও শেষ হয়ে যাবে।" তখন সে আর কিছু বলে না।

প্রথম কয়েকটা সারির দাফন শেষ হয়ে গেলে জাপ আর ভ্যালনটিন হোঁচট খেতে খেতে একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে আসছে।

"এই বেটা এখনো জীবিত আছে।" স্ট্রেচারটা নামাতে নামাতে জাপ বলে।

কসোল লোকটার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলে "আর বেশিক্ষণ নয়। অপেক্ষা করা যাক।" স্ট্রেচারে শায়িত লোকটার নাভিশ্বাস উঠেছে। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তার থুৎনী বেয়ে রক্ত পড়ছে।

"তাকে কি স্ট্রেচার থেকে নামিয়ে রাখব?" জাপ জিজ্ঞেস করে।

"স্ট্রেচারেই রাখ আর নামিয়েই রাখ ও ঠিকই মরবে," তার রক্তের দিকে ইশারা করে আলবার্ট বলে।

লোকটাকে আমরা পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়ে আমাদের কাজে লেগে যাই। ম্যাকস ওয়েল কাছে থাকে। এখন ভ্যালেনটিন আমাকে সাহায্য করছে। আমরা গ্লেজারের লাশটা নামাই। "হায় প্রভু। এর স্ত্রীর কথা একবার ভেবে দেখ দেখি।" ভ্যালেনটিন বিড় বিড় করে।

"এই যে স্রোডারের লাশ।" ওয়াটারপ্রুফটা গা থেকে খুলতে খুলতে জাপ আমাদের ডেকে বলে।

"চুপ কর।" ব্রোগার ফিস ফিস করে।

লাশটা তখনও কসোলের কোলে। "কার লাশ?" সে যেন ব্যাপারটা আদৌ উপলব্ধি করতে পারছে না।

"স্রোডার", ফার্ডিন্যাণ্ড ব্যাপারটা জানে মনে করে জাপ নামটা আবৃত্তি করে।

কসোল ক্রোধে গর্জন করে ওঠে। "কৌতুক করোনা. বেকুফ কোথাকার! সে যুদ্ধ বন্দী হয়েছে।"

"ফার্ডিন্যাণ্ড, সত্যি এটা স্রোডারের লাশ," পাশে দণ্ডায়মান আলবার্ট ট্রসকি বলে দেয়।

আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে থাকি। কসোল লাশটা নিয়ে উপরে উঠে যায়। পকেট থেকে টর্চটা বের করে লাশের মুখের উপর আলো ধরে। সে বিধ্বস্ত মুখটার উপর নুয়ে পড়ে তা পরীক্ষা করে।

"প্রভুকে ধন্যবাদ, সার্জেন্ট চলে গেছে।" কার্ল অস্ফুট কণ্ঠে বলে।

আমরা কয়েক সেকেণ্ড অনড় দাঁড়িয়ে থাকি। কসোল এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, "একটা শাবল দাও।" আমি তার হাতে একটা শাবল দিই। আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে একটা খুনোখুনি হবে। কিন্তু কসোল শাবলটা নিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করে। আমাদের কাউকে সাহায্য করতে না দিয়ে সে একলাই আলাদা করে একটা কবর প্রস্তুত করে সে নিজেই লাশটাকে কবরে স্থাপন করে। সিলিগের কথা ভাববার মতন মানসিক অবস্থা তার নেই। সে এতই শোকাভিভূত!

সকালের আগে দাফনের কাজ শেষ হয়ে যায়। আহত লোকটা ইতিমধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। তাই তাকেও আমরা অন্যদের সঙ্গে দাফন করে দিই। জায়গাটাকে মাড়িয়ে শক্ত করে আমরা তার উপর ক্রুশগুলো পুঁতে ফেলি। একটা পেন্সিল দিয়ে কসোল সোডারের ক্রুসের উপর তার নামটা লিখে সেখানে একটা লৌহ শিরস্ত্রাণ ঝুলিয়ে দেয়।

লুদভিগ আর একবার আসে। আমরা আমাদের শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলি। সে তখন দ্বিতীয় প্রার্থনা আবৃত্তি করে। আলবার্ট তার পাশে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্রোডার স্কুলে তার সহপাঠী ছিলো। তাই কসোল অত্যন্ত শোকাভিভূত। সে বিবর্ণ জরাগ্রস্ত নীরব।

আমরা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। একটানা বৃষ্টি পড়তে থাকে। তারপর বিশ্রামের নির্ধাচিত সময় আমাদের জন্য কফি আসে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন্ট মেজর নিকটবর্তী একটা পরিখা থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা ভাবছিলাম সে অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে। তার মুখ থেকে রামের তীব্র গন্ধ বেরোচ্ছে। সে এখন যুদ্ধ সীমান্ত থেকে পিছনে পালালেই বাঁচে। তাকে দেখা মাত্র কসোল গর্জে ওঠে। ভাগ্যিস উইলি কাছে ছিলো। লাফিয়ে গিয়ে সে কসোলকে ধরে ফেলে। তাকে ধরে রাখতে আমাদের চারজনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। ছাড়া পেলে সে সিলিগকে খুন করতো। পুরো এক ঘণ্টা লাগলো তার শুভ বুদ্ধির উদয় হতে। সিলিগের পিছনে লাগলে সে নিজের বিপদই টেনে আনবে। তবে গ্রোডারের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সে দিব্যি করে যে, সিলিগের উপর সে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

আর এখন এই ত সিলিগ কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাঁচ গজের চেয়েও কম ব্যবধানে কসোল বসে। কিন্তু দুজনের কেউ এখন আর সৈনিক নয়। অর্কেস্ট্রা বাজছে।

"আর এক রাউণ্ড বন্ধু।" জাদেন চেঁচিয়ে হুকুম দেয়। তার শূয়রের মতন চোখ দুটো চক চক করে। "আসছি," বলে সিলিগ গ্লাস নিয়ে আসে। "তোমাদের স্বাস্থ্য কামনা করি কমরেড বৃন্দ!"

কসোল তার পানে বিদ্বিষ্ট দৃষ্টি হানে। "তুমি আমাদের কমরেড নও।" সে ঘোঁত ঘোঁত করে। "না? বেশ—তাই হোক।" সে জওয়াব

দিয়ে বারের পিছনে চলে যায়। ভ্যালেনটিন গ্লাসের মদটা গিলে ফেলে। "গিলে ফেল, কার্ডিন্যাও? এটাই আসল কাজ।"

উইলি আর এক রাউণ্ডের হুকুম দেয়। জাদেন ইতিমধ্যেই আধ-মাতাল হয়ে গেছে। "এই সিলিগ নচ্ছাব, এখন আর শাস্তি দিতে পারছ না। এসো আমার সঙ্গে এক গ্লাস খেয়ে নাও।" এই বলে সে তার পুরানো দিনের অফিসারের পিঠে এমনি প্রচণ্ড থাপ্পড় মারে যে তাতে সিলিগের শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসে। এক বছর আগে এমনটি হলে, নির্ঘাত তাকে কোর্ট মার্শাল বা পাগলা গারদে যেতে হতো। কসোল একবার তার গ্লাসের দিকে একবার কাউন্টারের পাশে উপবিষ্ট সিলিগের পানে তাকিয়ে মাথা দোলায়।

"আমাদের পরিচিত সিলিগ নয়, আর্নস্ট। অনেক বদলে গেছে।" কসোল বলে।

"আমার তাই মনে হয়। সিলিগকে আমি এখন যেন চিনতেই পারছি না। আমার স্মৃতির ফলকে সে উর্দি পরে আর হাতে নোট বই নিয়ে এমনিভাবে আঁকা রয়েছে যে আমি তখন কল্পনাই করতে পারতাম না যে বেসামরিক পোশাক পরলে তাকে কেমন দেখাবে। মদ্য ব্যবসায়ী হিসেবে কেমন দেখাবে, সে-কথা ছেড়েই দাও। আর আজ সে নিজ হাতে গ্লাসে ঢেলে মদ নিয়ে আসছে। আর যে জাদেনকে যুদ্ধক্ষেত্রে একটা মানুষ বলেই সে বিবেচনা করতোনা, সেই জাদেন তার পিঠে চাপড় মারছে। সেই জাদেনকে সে পুরানো বন্ধু বলে সম্বোধন করছে। হলো কি? দুনিয়াটা একবারে উল্টে গেছে।" উইলি কসোলকে চেতিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কসোলের বুকে ঘুষি মেরে বলে, "কি হলো!"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না।" দিশেহারা কার্ডিন্যাও সাড়া দেয়। "তাকে একটা ঘুষি লাগিয়ে দেব কিনা তাই তুমি ভাবছ। অবস্থা যে এমন দাঁড়াবে, তা ভাবিনি। দেখছি এই বেটা কেমন করে ছুটোছুটি করে সবার মন যোগাচ্ছে। তাকে আঘাত করতে আমার মন চাইছে না।"

জাদেন হুকুমের পর হুকুম দিয়ে যাচ্ছে। তার উর্ধ্বতন অফিসার ছুটোছুটি করে তার হুকুম তামিল করছে। তাতেই সে মজা পাচ্ছে।

সিলিগের মনেও স্ফূর্তি ধরে না। মদ্য পানের ফলে আজ কতকটা ভালো ব্যবসায় হচ্ছে বলে।

"এবার শেষ করা যাক। আমি আমার খরচে এক চক্ প্রাক-যুদ্ধ যুগের রাম খাওয়াব," সিলিগ প্রস্তাব করে। "কি খাওয়াবে বললে?" কসোল বুক চিতিয়ে প্রশ্ন করে। "রাম আমার কাছে এখনও দু-এক বোতল অবশিষ্ট আছে।" সরল মনে জওয়াব দিয়ে সিলিগ রামের বোতল আনতে যায়। কসোলকে মনে হয় কে যেন তার মুখে আঘাত করেছে। তার চোখ সিলিগকে অনুসরণ করে।

"সে পুরানো কথাটা একদম ভুলে গেছে, নইলে সে এই ঝুঁকি নিতো না।" উইলি কসোলকে বলে।

সিলিগ ফিরে এসে গ্লাসে রাম ঢালে। কসোল কটমট করে তার পানে চায়।

"তোমার হয়ত মনে পড়ছে না যে একবার তুমি নিছক ভয় পেয়ে রাম খেয়ে মাতাল হয়েছিলে। তাই নয় কি? তোমাকে কিন্তু শব ব্যবস্থাগারের নৈশ প্রহরী হওয়া উচিত ছিলো; তাই তোমাকে মানাতো।"

সিলিগ ইশারায় তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। "তা অনেক দিনের কথা। সে কথা এখন অর্থহীন।" বলে সে কথাটা চাপা দিতে চায়।

কার্ডিন্যাও আবার নীরব হয়ে যায়। সিলিগ তার প্রশ্নের কড়া জওয়াব দিলেই মজা শুরু হতো। তার এই বশ্যতা কসোলকে বিভ্রান্ত করে দেয়। সে মনস্থির করতে পারে না।

জাদেন মদের উচ্ছিষ্ট উপভোগের মানসে গ্লাসটা শোঁকে, আমরাও নাক উঁচিয়ে শুঁকতে থাকি। উত্তম রাম, তাতে সন্দেহ নেই।

কসোল গ্লাসটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। "আমাকে বিনে পয়সায় তোমার কিছু খাওয়াতে হবে না।"

"আহ্! বেটা, আমাকে দিয়ে দিলেই পারতে।" জাদেন চেঁচিয়ে ওঠে। সে তার আঙুলের সাহায্যে মদ তুলতে চেষ্টা করে, কিন্তু বেশি তুলতে পারে না।

জায়গাটা ধীরে ধীরে খালি হতে থাকে। "দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গেলো ভদ্র মহোদয়বৃন্দ।" সিলিগ উচ্চকণ্ঠে সমবেত গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বলে। খড়খড়ি বন্ধ করে। আমরাও বেরিয়ে পড়ব বলে উঠে দাঁড়াই।

"কি হলো ফার্ডিন্যাণ্ড?" আমি শুধাই। সে মাথা নাড়ে, মনস্থির করতে পারছে না। "এই বেটা পরিচারক মাত্র, আসল সিলিগ নয়।"

সিলিগ আমাদের জন্য দরজাটা খুলে দেয়, "পরবর্তী সাক্ষাৎ পর্যন্ত বিদায় ভদ্র মহোদয়গণ। বিদায়! তোমাদের স্বপ্ন সুখের হোক!"

"ভদ্র মহোদয়গণ!" জাদেন ব্যঙ্গ করে বলে, "ভদ্র মহোদয়গণ! অথচ এই বেটা যুদ্ধক্ষেত্রে শূয়র ছাড়া কাউকে অন্য সম্বোধন করতো না।"

কসোল প্রায় ঘরের বাইরে পৌঁছে পিছনের পানে তাকায়। তার দৃষ্টি সিলিগের পায়ের উপর পড়ে। তার পায়ে ঠিক পুরানো দিনের সামরিক ধরনের আঁটসাঁট ইজার, তার প্যান্টও পুরানো সামরিক কায়দায় তৈরি—আঁটসাঁট কোমর থেকে পা পর্যন্ত ডোরাওয়ালা। কোমরের উর্ধ্বাংশ মদের দোকানী, নিম্নাংশ সার্জেন্ট মেজর। এই পোশাক দেখেই তার মনের দ্বিধা কেটে যায়। সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ফার্ডিন্যাণ্ড হঠাৎ পিছন ফিরে সিলিগকে ধাওয়া করে। সিলিগ পালায়। সিলিগকে পাকড়াও করে সে শ্লেষের সুরে বলে, "এবার কেমন? গ্রোডার। গ্রোডার, গ্রোডার। এই নামটা এবার মনে পড়ছে, ঘৃণ্য কুত্তা কোথাকার? এই নাও গ্রোডারের হয়ে একটা।" বলে সে বা হাতে সিলিগকে একটা ঘুষি মারে। "এই নাও এজমালী কবরের হয়ে আর একটা অভিনন্দন।" বলে আবার সে একটা ঘুষি মারে। সরাইওয়ালা তা এড়িয়ে কাউন্টারের পিছনে লাফিয়ে পড়ে। একটা হাতুড়ি তুলে সে কসোলকে লক্ষ্য করে মারে। আঘাতটা তার মুখে লেগে কাঁধের উপর দিয়ে ফসকে যায়। কসোল এমনি ক্রোধোন্মত্ত হয়ে গেছে যে হাতুড়ির আঘাতে সে ভ্রূক্ষেপও করে না। সে সিলিগকে চেপে ধরে কাউন্টারে তার মাথা ঠুকতে থাকে। গ্লাস ভাঙ্গার ঝন ঝন শব্দ। সে বিয়ার ঢালার নলটা খুলে সিলিগের মাথাটা তার নীচে চেপে ধরে বলে "এবার যত পার রাম গেলো: শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ডুবে মর।"

সিলিগের ঘাড় বেয়ে বিয়ার তার সার্টে আর ইজারে গড়িয়ে ঢুকতে থাকে। তার পা দুটো বেলুনের মতন ফুলে ওঠে। সিলিগ ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়ে। ক্রোধের কারণ, এমন ভালো বিয়ার এখন দুর্লভ! অবশেষে কোন রকমে নিজেকে মুক্ত করে সে একটা গ্লাস দিয়ে কসোলের থুতনিতে আঘাত করে।

"বে-আইনী কাজ" বলে দোরগোড়া থেকে উইলি চেঁচায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সে তামাশা দেখছে। "তার উচিত ছিলো প্রথম তাকে তলপেটে গুঁতো মেরে তবে নিজকে মুক্ত করা।" উইলি মন্তব্য করে।

আমরা কেউ হস্তক্ষেপ করি না। এটি কসোলের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে বেদম মার খেলেও আমরা তাকে সাহায্য করতাম না। আমরা দাঁড়িয়ে শুধু দেখছিলাম সিলিগকে কেউ যেন সাহায্য না করে। জাদেন সংক্ষেপে সবাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছে। তাই স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা প্রত্যেকেই সচেতন।

ফার্ডিন্যাণ্ডের মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত ঝরছে। সে এবার সত্যি পাগল হয়ে গেছে। সে অতি দ্রুত সিলিগের দফারফা করে দেয়। সে চোয়ালে একটা ঘুষি দিয়ে সিলিগকে ভূপাতিত করে। তারপর তার উপর চেপে বসে মেঝেতে তার মাথাটা বার বার ঠুকে ঘষে ক্ষান্ত হয়। তার মনে হয় এবার যথেষ্ট হয়েছে।

এবার আমরা বিদায় হই। লীনা পনিরের মতন ফ্যাকাশে মুখে তার জখমী মনিবের পাশে এসে দাঁড়ায়। "ওকে বরং এবার ঠেলাগাড়ি করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।" উইলি যেতে যেতে বলে। "আমার মনে হয় দুই কি তিন সপ্তাহেই সেরে উঠবে। জখম খুব গুরুতর নয়।"

কসোল আনন্দে শিশুর মতন হাসছে। ঘোড়ারের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, এই তৃপ্তিতে। "চমৎকার লাগলো।" মুখের রক্ত মুছতে মুছতে বলে। "এবার বউয়ের কাছে যেতে হচ্ছে, নইলে পাড়া-প্রতিবেশীরা নানা কথা ভাববে। কি বল?"

বাজারের কাছে পৌঁছে আমরা আলাদা হয়ে যাই। জাপ আর ভ্যালেনটিন ব্যারাকে চলে যায়। জ্যোৎস্না প্লাবিত সড়কে তাদের জুতোর মচ্‌মচ্‌ ধ্বনি শোনা যায়।

"তাদের সঙ্গে আমিও চলে গেলে পারতাম।" আর্নস্ট সহসা বলে ওঠে।

"আমি বুঝতে পারি।" মোরগের ব্যাপারটার চিন্তা করে উইলি সায় দেয়। "এখানকার লোকদের বিচার-বুদ্ধি বেশ পণ্ডিতসুলভ। তাই নয় কি?"

আমি মাথা নেড়ে সমর্থন জানাই। "আমার মনে হয় শীগগিরই আবার আমাদের স্কুলে যাওয়া-আসা শুরু করতে হবে—"

আমরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে হাসি। আবার স্কুলে যাওয়ার চিন্তায় জাদেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। হাসতে হাসতে সে জাপ আর ভ্যালেনটিনের পিছনে ছুট দেয়।

উইলি মাথা চুলকোয়। "তুমি কি ভাবছ তারা আমাদের দেখে খুশী হবে? আমরা ত আগের মতন সুশীল সুবোধ নই।"

"তারা আমাদের বীর হিসেবেই পছন্দ করতো। আর এখন--" কার্ল মন্তব্য করে।

উইলি ব্যাখ্যা করে, "কেমন মজাটা হবে, তাই দেখার আশায় আছি। আমাদের বর্তমান মেজাজ রুক্ষ ইস্পাত কঠিন; যা তারা বলতো।"

8

আমাদের কোম্পানী ভেঙে দেয়ার সময় সঙ্গে করে আমাদের রাইফেল নিয়ে আসতে হয়েছিলো। আমাদের উপর নির্দেশ ছিলো যে, শহরে পৌঁছে ওগুলো জমা দিতে হবে। তাই আমরা রাইফেলগুলো ব্যারাকে জমা দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের বরখাস্তের মাইনে বাবদ পঞ্চাশ মার্ক এবং ভরণ-পোষণ ভাতা বাবত পনর মার্ক দেয়া হলো। তা ছাড়া, একটা গ্রেট কোট, এক জোড়া জুতো, এক সেট অন্তর্বাস এবং এক সেট উর্দি আমাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য।

আমরা এ সব নেয়ার জন্য উপর তলায় যাই। কোয়ার্টার মাস্টার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, "এখান থেকে তোমাদের প্রাপ্য জিনিসগুলো বেছে নাও।"

উইলি দ্রুত জিনিসগুলো খতিয়ে খতিয়ে দেখে মুরুব্বীয়ানার সুরে বলে, "শোন, এগুলো রংরুটদের জন্য রেখে দাও। এগুলো নূহের নৌকো থেকে আনা হয়েছে। নতুন কিছু দেখাও।"

"নতুন জিনিস নেই।" কোয়ার্টার মাস্টার নীরস কণ্ঠে বলে দেয়।

"তাই নাকি?" উইলি কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তারপর একটা এল্যুমিনিয়ামের সিগারেট কেস বের করে কোয়ার্টার মাস্টারের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলে, "ধূমপানের অভ্যেস আছে?"

কোয়ার্টার মাস্টার তার টেকো মাথাটা নেড়ে নেতিবাচক ইঙ্গিত দেয়।

"তা হলে চিবোনোর অভ্যেস?" উইলি পকেট হাতড়াতে থাকে।

"না।"

"বেশ, তা হলে পানাভ্যাস?" উইলি তদবিরের কোন ব্যবস্থাই বাকি রাখেনি। সে তার বুকের একটু স্ফীতি হাত দিয়ে অনুভব করে।

"সে অভ্যাসও নেই," কোয়ার্টার মাস্টার চট করে জওয়াব দেয়।

"তা হলে তোমার লম্বা নাকে দুটি ঘুষি মারা ছাড়া অন্য উপায় নেই।" উইলি অমায়িক কণ্ঠে বলে। "যা হোক, আমরা নতুন জিনিস না নিয়ে এখান থেকে যাচ্ছি না।"

সৌভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে জাপ এসে উপস্থিত হয়। জাপ এখন সেনা পরিষদের সদস্য। সুতরাং উপর মহলে তার খুবই দহরম মহরম প্রতিপত্তি। সে কোয়ার্টার মাস্টারকে চোখ টিপে বলে. "হেনরিখ, এরা সব আমার দোস্ত মানুষ. পদাতিক বাহিনীর ঝানু লোক। এদের মালগুদামে নিয়ে যাও।"

কোয়ার্টার মাস্টারের চোখে মুখে হাসির দীপ্তি ফুটে ওঠে। "আরে, এ কথা আগে বলতে হয়।"

আমরা তার সাথে পিছনের একটা ঘরে যাই। সেখানে সব নতুন টাটকা জিনিস মওজুদ রয়েছে। আমরা কাল বিলম্ব না করে আমাদের পুরানো কাপড় চোপড় ছেড়ে নতুন কাপড়চোপড় পরি। উইলি অনুরোধ করে যে তার দুটো গ্রেট কোট দরকার। কারণ প্রুশিয়ানদের অধীনে থেকে তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কোয়ার্টার মাস্টার দ্বিধা করে। জাপ তার হাত ধরে তাকে ঘরের কোণে নিয়ে গিয়ে টাকা পয়সার লেনদেনের আলাপ করে। দুজন ফিরে এলে দেখি যে, কোয়ার্টার মাস্টার শান্ত হয়ে গেছে। সে জাদেন আর উইলির পানে তাকায়—এরা দুজনই বেশ মুটিয়ে গেছে। "তা বেশ, আমার জন্য একই কথা," সে জোর গলায় বলে, "অনেকে ত কষ্ট করে তাদের পাওনা কাপড়চোপড় নিতেই আসে না। তাদের নিশ্চয়ই অভাব অনটন নেই। আসল কথা, কাগজে আমার হিসেবপত্র থাকলেই হলো।"

আমরা আমাদের সবকিছু পেয়েছি বলে সই করে দেই। "তুমি একটু আগেই ধূমপানের কথা বলছিলেনা?" কোয়ার্টার মাস্টার উইলিকে জিজ্ঞেস করে।

উইলি প্রথমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারপর হেসে তার সিগারেট কেসটা বের করে দেয়।

"চিবোনোর কথা?" কোয়ার্টার মাস্টার নাছোড়বান্দা। উইলি তার টিউনিকের পকেটে হাত দিয়ে বলে, "মদ তুমি নিশ্চয়ই খাও না।"

"আসল ব্যাপারটা বরং উল্টো।" কোয়ার্টার মাস্টার শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দেয়। "ডাক্তাররা আমাকে মদ খাওয়ার ব্যবস্থাই দিয়েছে। আসলে আমি রক্তাল্পতায় ভুগছি। বোতলটাই বরং তুমি রেখে যাও।"

"আচ্ছা, এক মুহূর্ত সবুর কর।" উইলি বোতলের ছিপি খুলে বোতলে মুখ লাগিয়ে এক সুদীর্ঘ চুমুক দেয়, যাতে বোতলের কিছুটার অন্তত সদ্ব্যবহার করা যায়। তারপর সে আধশূন্য বোতলটা বিস্মিত কোয়ার্টার মাস্টারের হাতে দিয়ে দেয়। অথচ এক মুহূর্ত আগেও বোতলটা ভরা ছিলো।

জাপ ব্যারাকের সদর দরজা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসে। "আন্দাজ কর ত এখানে আর কে আছে," সে বলে, "ম্যাকস ওয়েল। সেনা পরিষদের সদস্য।"

"সে সেনা পরিষদেরই যোগ্য লোক।" কসোল মন্তব্য করে। "আরামের চাকরি বটে। আমি তাই বলব। তাই নয় কি?"

"মন্দ নয়।" জাপ জওয়াব দেয়, "আপাতত ভ্যালেনটিন আর আমি এক শাখায়ই আছি! যদি তোমাদের কোন কিছুর দরকার পড়ে—রেলওয়ে পাশ বা এমনি ধরনের কিছু—আমিই তার মালিক, এ কথা ভুলো না।"

"তাহলে আমাকে একটা পাশ দাও—আগামী কালই আমি এডলফকে দেখে আসতে পারি।" আমি বলি।

সে একটা বই বের করে একটা পাশ ছিঁড়ে দেয়। "শূন্য স্থানগুলো পূর্ণ করে নিয়ো। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাবে কিন্তু।"

"নিশ্চয়ই"।

বাইরে এসে উইলি তার গ্রেট কোটের বোতাম খোলে। এর ভিতরে আর একটা গ্রেট কোট। "ভালোই হলো যে এটা এনেছি, নইলে কোন জোচ্চোর হয়ত এটা আর কারো কাছে বিক্রি করে দিতো। তাছাড়া, আমি যে আধ ডজন শেলের টুকরোর ঘা খেয়েছি, তার বিনিময়ে প্রুশিয়ানরা এই গ্রেট কোটটা আমার কাছে ধারে।"

আমরা হাই স্ট্রীট ধরে চলি। কসোল বলে যে তাকে আজ বিকেলে পায়রার খোপ মেরামত করতে হবে। পায়রা পোষার কাজটা সে আবার

আরম্ভ করতে চায়। যুদ্ধের আগে সে সংবাদবাহী পায়রা এবং কালো শাদা রঙের ডিগবাজ পায়রা পুষতো। ফ্রণ্টে থাকার সময় থেকেই নাকি সে এই ইচ্ছা পোষণ করে আসছে।

"এর পর কি করবে, ফার্ডিন্যাণ্ড?" আমি প্রশ্ন করি।

"কাজ খুঁজব।" সে সোজা জওয়াব দেয়। "তুমি জান আমার বউ আছে। উনুনে যাতে হাঁড়ি চড়ে, সে ব্যবস্থা রাখতেই হবে।"

হঠাৎ সেন্ট মেরি গীর্জার কাছাকাছি কোথাও থেকে গুলির আওয়াজ আসে। আমরা কান পেতে শুনি। "রাইফেল এবং সার্ভিস রিভলভারের গুলি।" পেশাগত অভিজ্ঞতায় উইলি বলে দেয়। "দুটো রিভলভার আর একটা রাইফেলের গুলি।"

"যাক গে," জাদেন তার নতুন বুট জুতোর ফিতে ধরে ঝুলোতে ঝুলোতে মনের আনন্দে হাসতে হাসতে বলে, "তবু ফ্ল্যাণ্ডার থেকে এখানটা অনেক শান্ত।"

একটা পুরুষদের পোশাকের দোকানের সামনে এসে উইলি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। জানালার সামনে কাপড়ের তৈরি একটা পোশাকের নমুনা প্রদর্শিত রয়েছে। উইলি এই পোশাকটির দিকে বড় একটা তাকায় না, কিন্তু এর পাশেই একটা অত্যাধুনিক ধরনের পোশাকের নমুনা দেখে সে বিমোহিত হয়ে যায়। সে সেই জামাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে যে সে একটা ওভার কোট কেটে এমনি একটা কোট তৈরী করিয়ে কালো রঙ করিয়ে নেবে। এই ভাবনায় সে আনন্দে আত্মহারা। কার্ল তার উৎসাহ এক ফুৎকারে নিবিয়ে দেয়। "এই কোটের সঙ্গে মানিয়ে পরার মতন তোমার ডোরাকাটা প্যান্ট আছে?"

উইলি কয়েক মুহূর্ত হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে থেকে জওয়াব দেয়, "তাতে কি হলো? দোকানে ঐ ডোরা কাটা প্যান্টটা আছে না? ঐটা মেরে দেব! আর ঐ যে ওয়েস্টকোটটা আছে না, তাও হাত সাফাই করে মেরে দেব। একবারে বিয়ের পোশাক হয়ে যাবে। উইলিকে তোমরা কি ভাবছ?" সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে একবার আমাদের পানে চোখ বুলিয়ে বলে। "আমরা আবার জীবনোপভোগ করব। চুলোয় যাক বাকি সব।"

বাড়ি ফিরে মাইনের অর্ধেকটা মায়ের হাতে তুলে দিই। "লুদভিগ, ব্রেয়ার এসেছে। সে তোমার ঘরে অপেক্ষা করছে।" মা খবর দেয়।

"সে একজন লেফটান্যান্ট।" বাবা সংযোজন করে।

"হ্যাঁ, তুমি তা জানতে না?" আমি তাকে বলি।

লুদভিগকে দেখে মনে হলো সে ভালো আছে। আমাশা অনেক ভালো হয়ে গেছে। সে হেসে বলে, "উইলি, আমি তোমার কাছে কয়েকটা বইয়ের জন্য এসেছি।"

"সে বইগুলো তুমি নিয়ে যাও।" আমি জওয়াব দেই।

"তা হলে, তোমার কোন বইয়ের দরকার নেই?"

আমি মাথা নাড়ি। "অন্তত আপাতত দরকার নেই। মাত্র কাল একটু পড়তে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার কি জান? আমি কোন মতেই পড়ায় মনোযোগ দিতে পারলাম না। দুই কি তিন পৃষ্ঠা পড়ার পরই মনে হলো বইয়ের বিষয়বস্তু ছেড়ে আমার মন অন্য জগতে বিচরণ করছে। আমি যেন শূন্য দেয়ালের পানে চেয়ে আছি। আচ্ছা তুমি কি এই চাও—উপন্যাস?"

"না" কয়েকটা বই বাছাই করে সে বলে। বইগুলোর নামের দিকে তাকিয়ে বলি, "এগুলো যে নীরস গম্ভীর বই, এতে তোমার কি লাভ হবে?"

সে সামান্য বিব্রত বোধ করে; তারপর হেসে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে, "আর্নস্ট, তুমি জান যুদ্ধ-সীমান্তেও আমার মাথায় অনেক ভাবনার উদয় হতো। কিন্তু সেগুলোর কোন সদুত্তর পেতাম না। এখন যুদ্ধের অবসান হয়েছে। আমি এখন অনেক কিছু বুঝতে চাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—পরিস্থিতিটা যে এমন দাঁড়াল সে ব্যাপারে মানব জাতি কি করতে চায়। এ নিয়ে মনে অনেক জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এইসব জিজ্ঞাসার মীমাংসা আমাদের করতে হবে। এ সবের সঙ্গে আমরা জড়িত। তোমার মনে আছে, পূর্বে জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা ভিন্ন ছিলো, কিন্তু এখন সব পাল্টে গেছে। তাই আমি অনেক কিছু জানতে চাই, আর্নস্ট—"

বইগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে আমি বলি, "তুমি কি মনে কর, এইগুলোতে তোমার জিজ্ঞাসার সমাধান পাবে?"

"চেষ্টা করে দেখতে চাই। আজকাল আমি সারা দিন—সকাল থেকে রাত পর্যন্ত—পড়াশোনা করি।"

অনতিবিলম্বে সে বিদায় নেয়। আমি চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকি। ভাবি, এতদিন কি করে দিন কাটাচ্ছি? লজ্জায় একটা বই হাতে

নিই, কিন্তু অবিলম্বেই তা আবার রেখে দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। এমনি করে ঘন্টার পর ঘণ্টা আমি শূন্যে তাকিয়ে থাকতে পারি। আগে সবকিছুই ভিন্ন ছিলো; তখন আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমি সদা অবহিত থাকতাম।

মা ঘরে প্রবেশ করে বলেন, "আর্নস্ট, তুমি ত আজ রাত তোমার চাচা কার্লের বাড়ি যাচ্ছ। যাচ্ছ ত?"

আমি বিষণ্ণ কণ্ঠে বলি, "হ্যাঁ, যাব আশা করি।"

"তিনি প্রায়ই আমাদের খাবার পাঠাতেন।" মা বিচক্ষণের মতন কথাটা বলেন।

আমি মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানাই। জানালা দিয়ে দেখি গোধূলির অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নামতে শুরু করেছে। চেস্টনাট গাছের নীল ছায়া মৃদু মৃদু কাঁপছে। আমি মাথাটা ঘুরিয়ে মাকে প্রশ্ন করি। "মা, গ্রীষ্মকালে কি প্রায়ই তুমি পপলার গাছের পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করতে?" আমি হঠাৎ মাকে প্রশ্ন করি। "নিশ্চয় তা খুব চমৎকার লাগতো..."

"না, আর্নস্ট এই কয় বছরে একদিনও যাই নি।"

"কেন মা?" আমি বিস্ময়ে আবার জিজ্ঞেস করি। "আগে ত তুমি প্রতি রোববার যেতে।"

"বেড়ানো আমরা একদম ছেড়ে দিয়েছিলাম।" মা শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দেন। "বেড়ানোর পর এত খিদে পায়! আর তখন অনেক সময় আমাদের ঘরে কোন খাবারই থাকতোনা।"

"তাই"—আমি অনুচ্চ কণ্ঠে বলি। "কিন্তু কার্ল চাচার ঘরে ত নিশ্চয়ই প্রচুর খাবার থাকতো?"

"আর্নস্ট, তিনি প্রায়ই আমাদের জন্য খাবার পাঠাতেন।"

হঠাৎ আমি ভগ্নোদ্যম হয়ে বলি, "কিন্তু এ সবের মধ্যে কি মঙ্গল রয়েছে মা?"

তিনি আমার হাতে মৃদু আঘাত করে বলেন "নিশ্চয়ই। এতে নিশ্চয়ই কোন মঙ্গলেচ্ছা নিহিত ছিলো। উপরওয়ালা প্রভু জানেন। সে সম্বন্ধে তুমি স্থিরনিশ্চিত থাকতে পার।"

কার্ল চাচা আমাদের পরিবারের বিখ্যাত ব্যক্তি। একটি ভিলার মালিক। যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন বেশ উঁচু দরের সরকারী কর্মচারী, মুখ্য বকশী।

আমার কুকুর "উলফ্" আমার সঙ্গে যায়, কিন্তু ভিতরে তার প্রবেশ নিষেধ, কারণ আমার চাচী যে-কোন কুকুর অপছন্দ করেন। আমি ঘন্টা টিপি।

একজন ধোপ দুরস্ত পোশাক পরা কায়দা দুরস্ত লোক দরজা খুলে দেয়। আমি হতচকিত হয়ে তাকে "গুড ইভেনিং স্যার" বলে অভিবাদন জানাই, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারি লোকটা নিশ্চয়ই গৃহভৃত্য। সেনা-বাহিনীতে থেকে এ ধরনের ব্যাপার আমি একদম ভুলে গেছলাম।

লোকটা আমাকে খতিয়ে খতিয়ে দেখেন—বেসামরিক পোশাক পরা ব্যাটালিয়ান কমানডারের মতন। আমি হাসি, কিন্তু লোকটা হাসে না। সে গম্ভীর। গ্রেট কোটটা গা থেকে খোলার সময় লোকটা আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। "যাক দরকার নেই, একজন প্রাক্তন সৈনিক হিসেবে আমি নিজের কাজ করতে পারি, তাই না ?" বলে আমি নিজেই কোটটা খুলে একটা খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখি।

লোকটা কোন কথা না বলে মুরুব্বীয়ানার চালে গ্রেট কোটটা অন্য একটি খুঁটিতে সরিয়ে রেখে দেয়। "বেচারা নিকৃষ্ট জীব।" মনে মনে এই কথা বলে আমি ভিতরে প্রবেশ করি।

কার্ল চাচা জুতোর নাল ঠক ঠক করে আমার দিকে আসেন। এটা আমার প্রতি তার অনুগ্রহ প্রদর্শন, কারণ আমি সামান্য একজন সৈনিক মাত্র। আমি বিস্ময়ে তার জাঁকালো সামরিক পোশাক পরিচ্ছদের পানে চেয়ে থাকি। আমি রসিকতা করতে গিয়ে বলি, "আজ খাওয়া হবে কি ? ঘোড়ার রোস্ট ?"

"ঘোড়া ? তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না।" তিনি বিহ্বল কণ্ঠে বলেন।

"আপনি ভোজ সভায় নাল লাগা জুতো পরেছেন কিনা তাই, বলছি।" আমি হেসে জওয়াব দেই।

তিনি বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি যেন অকারণে তার দুর্বলতায় আঘাত করেছি। সমর দফতরের কলম পেষাদের এমনি মনোবৃত্তি। জুতোর নাল আর তলোয়ারের প্রতি এদের প্রবল আসক্তি।

তার মনে কোন আঘাত দিতে চাইনি। এই কথাটা বুঝিয়ে বলার

আগেই আমার চাচী হুড়মুড় করে এসে হাজির। তিনি ঠিক আগের মতনই আছেন--নীরস গোলগাল। আমার সঙ্গে কথা বলছেন আর ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছেন।

আমি বিব্রত বোধ করি। অনেক লোকের ভিড়—অনেক মহিলা। আর সবচেয়ে খারাপ—অনেক আলো, এই পরিবেশ আমার পক্ষে অসহনীয়! যুদ্ধ সীমান্তে একটা তেলের প্রদীপ ছাড়া আর কোন আলোর ব্যবস্থা থাকতো না। কিন্তু এখানকার ঝাড় বাতির চোখ ধাঁধানো আলো নির্মম। এই আলোতে কোন কিছু গোপন করা যায় না। অসোয়াস্তিতে আমি পিঠ চুলকোই।

"কিন্তু এ কি করছ?" আমার চাচী তার কথার মাঝখানে আমাকে প্রশ্ন করেন।

"ওহো, একটা উকুন হয়তো পৃষ্ঠদেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।" আমি ব্যাখ্যা করি। "সীমান্তে উকুনের এত উৎপাত ছিলো যে, একবার ধরলে সাত দিনের আগে ওগুলো ছাড়ানো যেতো না—"

চাচী ভয়ে পিছিয়ে যান। "ভয়ের কোন কারণ নেই।" আমি তাকে প্রবোধ দেই। "ওগুলো লাফ দিতে পারে না, উড়তে পারে না," "প্রভুর দোহাই," তিনি ঠোঁটের উপর আঙ্গুল চেপে এমনি এক অদ্ভুত মুখ-ভঙ্গি করলেন যে, আমি যেন ভয়ঙ্কর অশ্লীল কথা বলে ফেলেছি। যাক, এমনই তাদের প্রকৃতি। আমরা বীর হতে পারি, কিন্তু উকুন সম্বন্ধে একটা কথাও বলা যাবে না।

অনেকগুলো লোকের সাথে করমর্দন করে করে আমি ক্লান্ত হয়ে ঘামতে থাকি। এখানকার লোকগুলো আমাদের লোকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আমাকে এদের মাঝখানে বেমানান মনে হয়। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, তারা যেন দোকানের জানালায় বসে আছে। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় তারা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছে। আমি সন্তর্পণে আমার হাত দুটো লুকোতে চেষ্টা করি; ট্রেঞ্চের ময়লা আমার হাতে বিষের মতন লেগে রয়েছে। আমি গোপনে আমার ট্রাউজারে হাত মুছে নেই, কিন্তু কোন মহিলার সাথে করমর্দন করতেই তা আবার ঘামে ভিজে যায়।

আমি ঘুরে ঘুরে এক দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়ি। সে দলে একজন চাটার্ড একাউন্টেন্ট অন্যদের সামনে তার মতামত জাহির করছে।

"ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন ত।" সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, "একজন ঘোড়ার জিন ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ব্যবসায়ী—ভেবে দেখুন—একটা সাম্রাজ্যের প্রেসিডেন্ট। কল্পনা করুন, সে দরবারে বসে জনগণের আবেদন অভিযোগ শুনছে। এমন কথা শুনলে বিড়ালেরও হাসি পাবে।"

লোকটা উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করে। "এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি তরুণ যোদ্ধা?" আমার কাঁধ চাপড়ে লোকটা প্রশ্ন করে।

"আসলে এই সম্বন্ধে আমি কখনো চিন্তা করিনি।" আমি অনিশ্চিত মনে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, "হয়ত এ ব্যাপারে তার জ্ঞান আছে—"

একাউন্টেন্ট স্থির দৃষ্টি মেলে আমার পানে এক মুহূর্ত চেয়ে স্মিতমুখে বলে, "সাম্রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে তার হয়ত কিছুটা জ্ঞান আছে; না, না, তরুণ বন্ধু, জন্মগত জ্ঞান থাকা চাই। যদি জন্মগত না হয় তবে একজন দর্জি বা মুচি কি দোষ করলো?"

এই বলে সে অন্যদের পানে তাকায়। তার কথা আমার ভালো লাগে না। মুচিদের সম্বন্ধে তার এই তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক উক্তি আমার ধাতে সয়না। তারাও ভদ্রলোকদের মতন দক্ষ যোদ্ধা হতে পারে। এডলফ বেতকি ত একজন মুচি ছিলো। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারটা সে অনেক মেজরের চেয়েও ভালো বুঝতো। আমাদের কাছে মানুষ হিসেবে লোকের মূল্য ছিলো। তার পেশায় নয়। আমি একাউন্টেন্টের পানে ভর্ৎসনাসূচক দৃষ্টিতে তাকাই। সে গালভরা বুলি আওড়াচ্ছে। সে হয়ত সভ্য সমাজের স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছে। তবে আবার কোন দিন যদি যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদের মুখে আমাকে পড়তে হয়, আমি কাল বিলম্ব না করে এডলফ বেতকির উপরই নির্ভর করব। এর উপর নয়।

অবশেষে খাবার টেবিলে বসতে পেরে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। আমার পাশে এক সুবেশিনী সুন্দরী তরুণী। তাকে আমার ভালো লাগে, কিন্তু তার সাথে কি সম্বন্ধে আলাপ করব, সে ধারণা আমার নেই। সৈনিক কথা বলে কম। আর মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেই না। অন্যরা নির্দ্বিধায় আলাপ করে যাচ্ছে, তাই আমি তাদের আলাপ শুনতে চেষ্টা করি যাতে আলাপের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দু একটা ধারণা পেতে পারি।

অদূরে টেবিলের প্রান্তে বসে একাউন্টেন্ট তখন অন্যদের বুঝাচ্ছে যে, আর কিছু সময় শত্রু বাহিনীকে বাধা দিয়ে রাখতে পারলে আমরা নির্ঘাত জিতে যেতাম। এই ধরনের বাজে রদ্দি কথা শুনলে আমার মন-মেজাজ

বিগড়ে যায়। সেনাবাহিনীর যে-কোন লোক জানে, আমাদের গোলা বারুদ অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে গিয়েছিলো। জনশক্তিও নিঃশেষিত। এ সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই। তার উল্টো দিকে এক মহিলা তার স্বামী সম্বন্ধে আলাপ করছে। স্বামী তার যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তার কথার ধরনধারন দেখে মনে হয় সে নিজেই বুঝি মারা গেছে; তার স্বামী নয়। আরও দূরে উপবিষ্ট কয়জন মিলে নিরাপত্তা আর শান্তি চুক্তির শর্তাদি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করছে। যারা এ ব্যাপার নিয়ে সত্যিকার মাথা ঘামাচ্ছে, তাদের চেয়ে এরাই যেন এ ব্যাপার সম্বন্ধে বেশি ওয়াকিবহাল। একজন বাঁকা নাকওয়ালা লোক তার বন্ধুর স্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। তার কথা এমনি কৃত্রিম সহানুভূতিপূর্ণ যে আমার ইচ্ছে করে যে তার এই গোপন বিদ্বেষ প্রচারের পুরস্কারস্বরূপ আমার বিয়ার তার মুখের উপর ঢেলে দেই।

এসব কথা শুনে শুনে আমি নির্বোধ বনে যাই। এদের কোন কথার অর্থই যেন আমার মাথায় ঢোকে না। সুবেশিনী তরুণীটি আমাকে তাচ্ছিল্য-ভরে প্রশ্ন করে, সীমান্তে অবস্থানকালে আমি বোবা হয়ে গেছি কি-না।

"পুরোপুরি হইনি," তাকে এই জওয়াব দিয়ে আপন মনে ভাবি। আজ তোমার সঙ্গে এখানে কসোল আর জাদেন বসতে পারলে কত ভালোই না হতো! তারা তোমার তোষামোদ শুনে হাসতো, তোমার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতো, তুমি গর্ব অনুভব করতে। সঙ্গে সঙ্গে এই লোকগুলো সম্বন্ধে আমার কি ধারণা তা স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারছি না বলে আমার অন্তরে জ্বালা ধরে যায়; কসোলের অন্তরে জ্বালা ধরতো না। কারণ এদের কি বলতে হবে, সে তা জানতো। তার বক্তব্য হতো সময়োপযোগী আর যথাযথ।

প্রভুকে ধন্যবাদ! ঠিক এই মুহূর্তে মচমচে ভাজা চপ টেবিলে পরিবেশন করা হয়। আমি গন্ধ শুঁকি। গোশতের খাঁটি চপ, খাঁটি চর্বিতে ভাজা। দেখেই মনে সান্ত্বনা পাই। সব দুঃখ গ্লানি মুছে যায়। একটা ভালো চপ মুখে পুরে মনের সুখে চিবোতে থাকি। চমৎকার স্বাদ। কত দিন আগে একবার টাটকা চপ খেয়েছিলাম। ফ্লাণ্ডার্সে আমরা শূয়রের দুটো কচি বাচ্চা শিকার করে খেয়েছি। হাড়গোড় পর্যন্ত বাদ দেইনি। গ্রীষ্মের এক মনোরম সন্ধ্যায়। ক্যাটজিনস্কি তখনো বেঁচে আছে। হ্যাঁ, ক্যাট আর হ্যায় ওথেস্থাস এই লোকগুলোর চেয়ে তারা

ছিলো অনেক ভালো। আমি টেবিলের উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে বর্তমান পরিবেশের কথা একদম ভুলে যাই। আমার চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা পরিষ্কার ভেসে ওঠে। শূয়রের বাচ্চা দুটো ছিলো কত কচি আর মোলায়েম। আমরা আলুর চপও বানিয়েছিলাম। লিয়ার সেখানে ছিলো আর পল বমার—হ্যাঁ পলও ছিলো—এখন আমার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দুইই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমি স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছি—

চাপা হাসির শব্দে আমি জেগে উঠি। টেবিলের চারদিকে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করছে। লীনা চাচীর মুখে লজ্জা, ভয় ও বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। পাশের মেয়েটা হাসি চাপছে। সবাই আমার পানে বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

দেহে আমার স্বেদ প্রবাহ বইছে। ফ্লাণ্ডার্সে যে ভঙ্গিতে বসেছিলাম এখানেও আমি তেমনি বসে আছি—আনমনা। হাতের কনুই দুটো টেবিলের উপর ন্যস্ত, আমার দু'হাতে হাড়ের টুকরো, আঙ্গুলগুলো চর্বি মাখা। আমি চপের শেষ টুকরোটা কামড়াচ্ছি। আর সবাই ছুরি কাঁটা দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে খাচ্ছে।

লজ্জায় সরমে লাল হয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আমি হাড়ের টুকরোটা রেখে দেই। আমি কেমন করে এমনিভাবে নিজের কথা ভুলে গেছলাম? আসল কথা, আমি জানিই না, কেমন করে বাইরের সমাজে চলতে হয়। সীমান্তে ত আমরা এভাবেই আহার করতাম। কাঁটা দিয়ে খেতাম, কোন সময়ই আমাদের ভাগ্যে প্লেট জুটতোনা।

এই বিব্রত বোধের মাঝেও আমার মনে কার্ল চাচার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছে। তিনি এই মুহূর্তে জোর গলায় যুদ্ধ-ঋণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। আমার ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছে এখানে সমবেত সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে যারা নিজেদের সম্বন্ধে এত উঁচু ধারণা পোষণ করে, নিজেরা এত বুদ্ধিমানের মতন কথা বলে, ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছে সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরুদ্ধে যারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, আনন্দের আবেশে জীবন যাপন করছে, যেন বিভীষিকাময় এ কয়টি বছর—যখন জীবন ও মৃত্যুর ভাবনা ছাড়া অন্য কোন ভাবনাই ছিলো না—অতীতে কখনো আত্মপ্রকাশ করেনি।

কঠোর চিত্তে নীরবে আমি যথাসাধ্য গলাধঃকরণ করি। পেট ভরা চাই। তারপর যত শীগগির সম্ভব আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।

ধোপ-দুরস্ত ভৃত্যটাকে দেখতে পাই। আমার কাপড়চোপড়গুলো গুছিয়ে নিয়ে তাকে বলি, "তুমি বানরকে যুদ্ধ সীমান্তে পেলে দেখে নিতাম।" আমি থুথু ফেলে কথার জের টেনে বলি, "তোমাকে আর এখানে যারা আছে সবাইকে", এই বলে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাই।

আমার কুকুরটা বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে আমার উপর লাফিয়ে ওঠে। "এসো উলফ্" আমি তাকে ডাক দেই। সহসা আমি উপলব্ধি করি যে, চপ খাওয়ার ব্যাপারটা আমার মনটাকে বিষিয়ে তোলেনি। এই সত্যটাই আমার মনকে বিষিয়ে দিয়েছে যে, কতকগুলো প্রাচীন নির্জীব স্বার্থান্বেষী আত্মতৃপ্ত জীব আগের মতন এখনও প্রভুত্ব করছে আর চাল-চলনে হাবভাবে তা প্রকাশ করছে। "এসো উলফ্, এই লোকগুলো আমাদের মতন নয়। আমরা সীমান্তের যে-কোন টমির সাথে এদের চেয়ে ভালো মানিয়ে চলতে পারব। তারা হাতের সাহায্যে আহার করে উদগার তুললেও এদের চেয়ে অনেক ভালো।"

আমার কুকুর আর আমি জোর কদমে চলি ; যত দ্রুত পারি ছুটে চলি। কুকুরটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ঘেউ ঘেউ করে। পাগলের মতন আমরা ছুটি। "এরা সব নিপাত যাক। আমরা বেঁচে আছি উলফ্। বাঁচার মতন বেঁচে আছি।"

৫

লুদভিগ ব্রেয়ার, আলবার্ট ট্রসকি আর আমি স্কুলে যাচ্ছি। আবার আমাদের লেখাপড়া শুরু হবে। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমরা টিচার্স কলেজের ছাত্র ছিলাম। কিন্তু আমাদের জন্য কোন বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়নি। গ্রামার স্কুল থেকে যেসব ছেলেরা যুদ্ধে গিয়েছিলো, তাদের বরং কিছুটা সুবিধে হয়েছিলো ; তাদের অনেকেই বিশেষ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলো। যুদ্ধে নাম লেখাবার আগে বা যুদ্ধের সময় ছুটি নিয়ে বাড়ি এসে তারা পরীক্ষা দিয়েছিলো। বাকীদের ভাগ্য আমাদেরই মতন। তাদের সবাইকে আমাদের সাথে আবার পড়তে হবে। কার্ল ব্রোগার তাদের অন্যতম।

আমরা গীর্জার পাশ দিয়ে যাই। এককালে গীর্জা চূড়ার আবরণ-রূপে ব্যবহৃত তামার সবুজ পাতগুলোর বদলে ধূসর রঙের পশু লোমজাত আবরণ লাগানো হয়েছে। দেখতে খারাপ লাগছে। গীর্জাটাকে তাই

এখন কারখানার মতন দেখাচ্ছে। তামার পাতগুলো গলিয়ে কামানের গোলা তৈরি করা হয়েছে।

"আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে এমন কাণ্ড যে ঘটবে প্রভু তা স্বপ্নেও ভাবেনি।" আলবার্ট বলে ওঠে।

গীর্জার পশ্চিমে একটা বাঁকা গলির উপর টিচার্স কলেজ। তার প্রায় বিপরীত দিকে গ্রামার স্কুল। এর ঠিক পিছনেই নদী আর বাঁধ। বাঁধের পাশেই সারিবদ্ধ গাছ। যুদ্ধে যাওয়ার আগে এই দালান-কোঠাগুলোই ছিলো আমাদের পৃথিবী ; তারপর সীমান্তে ট্রেঞ্চগুলোই আমাদের পৃথিবী হয়ে দাঁড়ালো। আবার আমরা এখানে ফিরে এসেছি। কিন্তু এগুলো আর আমাদের পৃথিবী নয়। ট্রেঞ্চের পৃথিবীর কাছে এই পৃথিবী হার মেনেছে।

গ্রামার স্কুলের সামনে পুরানো বন্ধু জর্জ রাহের সাথে দেখা। সে ছিলো একটা কোম্পানীর দায়িত্বে নিয়োজিত একজন লেফটান্যান্ট। ছুটিতে এসে সে কেবল মদ খেয়ে ঘুরে বেড়াতো। পরীক্ষার কথা ভাবতোনা। তাই সেও আবার স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। দু'দুবার পরীক্ষা না দিয়ে সে পিছিয়ে পড়েছে।

"সত্যিই কি জর্জ, যুদ্ধ সীমান্তে বসে তুমি একজন লাতিন ভাষার পণ্ডিত হয়েছ?" আমি তাকে প্রশ্ন করি।

সে প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে হেসে গ্রামার স্কুলের দিকে চলে যায়।

আমি পিছন থেকে ডেকে বলি, "সাবধান, স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য যেন না জোটে।"

গত ছয় মাস সে ছিলো বিমান সেনা। চার চারটে ইংরেজকে সে ভূপাতিত করেছে। কিন্তু এখন আমার মনে হয় না যে সে জ্যামিতির একটা উপপাদ্যও বুঝতে পারবে।

আমরা টিচার্স কলেজে যাই। সমস্ত পথে উর্দিপরা ছেলেদের ভীড় লেগে আছে। প্রায় ভুলে যাওয়া সব মুখ একে একে সামনে এসে হাজির হয়। অনেক দিন থেকে তাদের নাম পর্যন্ত শোনা যায়নি। হ্যান্স ওয়ালডরফ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসে। উনিশ শো সতর সালের নভেম্বর মাসে হাঁটু ভাঙ্গা অবস্থায় তাকে আমরা উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। কোমর পর্যন্ত তার পাটা কেটে ফেলা হয়েছে। এখন সে একটা ভারি কাঠের পা লাগিয়েছে। দপ দপ করে চলে। কার্ট লেইপোল্ড এসে হাসিমুখে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলে, "ভদ্র মহোদয়গণ, আমি লোহার হাতওয়ালা

গডক্রে।" তার ডান হাতটা কৃত্রিম। তারপর একজন সদর দরজায় এসে গনগনে মোটা গলায় বলে, "তোমরা হয়ত আমাকে চিনতেই পারছ না, তাই না?"

আমি তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাই। যদি এটাকে এখনও মুখ বলা যায়। কপালের কোনাকুনি একটা প্রশস্ত লাল দাগ বাঁ চোখ পর্যন্ত নেমে গেছে। সেখানে মাংসটা বেড়ে এমনি হয়ে গেছে যে তাতে তার ছোট্ট চোখটা ঢাকা পড়ে গেছে। তবে চোখটা স্বস্থানে বিদ্যমান আছে; এই যা। ডান চোখটা নিথর—কাঁচের চোখ। নাকটা পরিষ্কার উধাও হয়ে গেছে। নাকের জায়গাটা জুড়ে একটা কালো দাগ। এই দাগটা নিম্নাভিমুখী হয়ে মুখটাকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। মুখটা স্ফীত, তাই কথা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট। দন্তপাটি কৃত্রিম; কৃত্রিম দাঁতের বন্ধনীটা দেখা যায়। আমি তাকে নিঃসন্দেহে চিনতে না পেরে তার পানে চেয়ে থাকি। সে তার গনগনে মোটা গলায় বলে, "আমার নাম পল রেডেমাচের।"

আমি এবার তাকে চিনতে পারি। হ্যাঁ তাইত। এই ত তার সেই ডোরাকাটা ধূসর রঙের স্যুট। "আচ্ছা পল, তুমি এখন কি করছ?"

"দেখতে পাচ্ছ না?" সে ঠোঁটদুটো সোজা করার চেষ্টা করে বলে, "বোমার টুকরো লেগে এই অবস্থা। এটাও তার সঙ্গে গেছে।" সে একটা হাত দেখায়; তিনটে আঙুল নেই। একটা চোখ তার বিষণ্ণভাবে মিট মিট করছে আর একটা নিথর চোখ সামনে তাকিয়ে আছে। "আবার যদি স্কুলের শিক্ষকতার চাকরিটা পেতাম! আমার উচ্চারণ অত্যন্ত খারাপ; তাই না? তুমি কি আমার কথা বুঝতে পার?"

"নিশ্চয়ই।" আমি জওয়াব দেই। "আর ক্রমে ক্রমে আমার উচ্চারণ আরও ভালো হবে। তা ছাড়া পরে অস্ত্রোপচারও করা যাবে।"

সে নীরবে কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়। সে খুব আশান্বিত বলে মনে হয় না। অস্ত্রোপচার সম্ভব হলে ইতিমধ্যেই যে তা করা হতো তাতে সন্দেহ নেই।

সর্বশেষ খবরটা দেয়ার জন্য উইলি আমাদের কাছে এগিয়ে আসে। বকম্যান তার ফুসফুসের জখমে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে, তার ক্ষয়রোগও হয়েছিলো। হেনজও আত্মহত্যা করেছে। সে যখন বুঝলো যে মেরুদণ্ডের জখমের জন্য সারা জীবন তাকে পঙ্গু চেয়ারে কাটাতে হবে তখনই যে সে গুলি করে আত্মহত্যা করে তাতে সন্দেহ নেই। সে ছিলো আমাদের

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়। স্রেয়ার গত সেপ্টেম্বর মাসে নিহত হয়েছে আর লিচটেনফেলড্‌ জুন মাসে। লিচটেনফেলড্‌ মাত্র দুদিন যুদ্ধ ফ্রন্টে ছিলো।

আমরা সহসা থমকে দাঁড়াই। আমাদের সামনে এক ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে।

"না? ওয়েস্টার হোলট?" উইলি অবিশ্বাসের সুরে বলে।

"ঠিকই বলেছ। সেই ব্যক্তি।" সে জওয়াব দেয়।

উইলি ভ্যাবাচ্যাকা খায়। "কিন্তু তুমি ত মরে গেছ।"

"না, এখনও মরিনি।" সে অমায়িক কণ্ঠে জওয়াব দেয়।

"কিন্তু খবরের কাগজে যে দেখলাম।"

"আজকাল আর কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই।" মাথা নেড়ে উইলি বলে, "আমি ত ভেবেছিলাম অনেক আগেই কীট পোকায় খেয়ে তোমাকে সাবাড় করে দিয়েছে।"

"তোমাকে খেয়ে তবে আমাকে খাবে, উইলি।" সে শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দেয়। "লাল চুলওয়ালা লোকেরা দীর্ঘজীবী হয় না।"

আমরা কলেজে প্রবেশ করি। চতুষ্কোণ কলেজ প্রাঙ্গণ—যেখানে আমরা রোজ দশটার সময় মাখন রুটি খেতাম। শ্রেণী কক্ষ বারান্দা সব ঠিক ঠিক আগের মতনই আছে, তবু কেন যেন আমাদের মনে হয় যে এটা অন্য জগৎ। কেবল কক্ষটার গন্ধটাই পরিচিত মনে হয়, কতকটা ব্যারাকের গন্ধের মতন। বড় অর্গেনটা হল ঘরে চক চক করছে। ডান দিকে শিক্ষকেরা একত্র দাঁড়িয়ে আছে। প্রিন্সিপালের ডেস্কের উপর টবে বসানো দুটো পাতা বাহারের গাছ। পাতাগুলো খসখসে আর শুকনো। তার সামনে ফিতেয় বাঁধা দুটো মালা। প্রিন্সিপালের পরিধানে ফ্রক কোট। তাই মনে হয়, আজ আমাদের সংবর্ধনা উৎসব।

আমরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছি। কেউ সামনের সারিতে বসতে চায় না। একমাত্র উইলি নিঃসঙ্কোচে সেখানে জায়গা নেয়। আধ অন্ধকার ঘরে তার মাথাটা বারবণিতার বাড়ির সামনের লাল বাত্তির মতন চকচক করছে।

আমি শিক্ষকদের পানে চাই। এক কালে তারা আমাদের চোখে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মানুষ বলে বিবেচিত হতো। তারা আমাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলো বলেই নয়, তাদের নিয়ে আমরা যতই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতাম তারা ছিলো আমাদের বিশ্বাসভাজন। আর আজ তারা আমাদের কি শিখাতে পারে? এখন জীবনকে আমরা তাদের চেয়ে অনেক ভালো করে জেনেছি। আমরা ভিন্ন জ্ঞান অর্জন করেছি; যে জ্ঞান রক্তাক্ত, নির্মম, অপ্রতিরোধ্য। সে জ্ঞান এখন আমরা তাদের শিখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কে এই জ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাবে? এখনই যদি এই ঘরে সহসা একটা অতর্কিত হামলা হয় তবে তারা সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এক দল কুকুরের মতন ছুটোছুটি করবে; কি করতে হবে সে ধারণা তাদের নেই। অথচ আমাদের মধ্যে কেউ দিশেহারা হবো না। আমাদের প্রথম কাজ হবে তারা যাতে আমাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্য চুপে চুপে তাদের ঘর বন্ধ করে তালা আটকে দেয়া; তারপর আত্মরক্ষার কাজে লেগে যাওয়া।

প্রিন্সিপাল বক্তৃতা দেবার জন্য গলাটা পরিষ্কার করে নেন। তার কণ্ঠ নিঃসৃত কথাগুলো মোলায়েম। তিনি যে একজন চমৎকার বক্তা, তা স্বীকার করতেই হবে। তিনি তার বক্তৃতায় সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা, যুদ্ধের কথা, বিজয়ের কথা, সাহসিকতার কথা সুন্দর সুললিত ভাষায় প্রকাশ করেন। কিন্তু এসব সুন্দর কথাগুলোর মাঝখানেও আমার মনে হয় কোথায় যেন জোড়াতালি রয়েছে। কারণ যুদ্ধ কর্মটা এমন মধুর ও মোলায়েম নয়। আমি লুদভিগের পানে তাকাই, সেও আমার পানে তাকায়। আলবার্ট ওয়ালডরফ, ওয়েস্টার হোল্ট এদের কারোরই এইসব কথা মনঃপুত নয়।

প্রিন্সিপাল তার বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বীরত্বের প্রশংসাই করছেন না, যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরের শান্ত পরিবেশে যে বীরত্ব প্রদর্শিত হয়েছে তারও প্রশংসা করছেন। "আমরাও নিজ নিজ জায়গায় থেকে আমাদের কর্তব্য পালন করেছি। আমরা সেনাবহিনীদের স্বার্থে অনশনে দিন কাটিয়েছি। আমরাও যন্ত্রণা ভোগ করেছি, আতঙ্কগ্রস্তও হয়েছি। তা ছিলো বড় দুঃসময়, কখনো কখনো হয়ত আমরা সীমান্তে যুদ্ধে নিয়োজিত আমাদের ছেলেদের চেয়েও বেশি দুঃখকষ্ট ভোগ করেছি।"

"বাঃ, বাঃ, সাবাস!" ওয়েস্টার হোল্ট চেঁচিয়ে ওঠে। চারদিকে

অস্পষ্ট গর্জন শোনা যায়। বুড়ো আমাদের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে আবার শুরু করে। "কিন্তু এসব ব্যাপার তৌলদণ্ডে ওজন করে বিচার করা যায় না। তোমরা নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুর মোকাবেলা করে তোমাদের মহান কর্তব্য পালন করেছ। যদিও শেষ পর্যন্ত আমরা জয়ী হতে পারিনি। তবু আমরা পিতৃভূমির প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একতাবদ্ধ হব, সমস্ত বিরোধী শক্তিকে তুচ্ছ করে দেশকে নতুন করে গড়ে তুলব। আমাদের পরলোকগত মহান গুরু গ্যাটে যেমনটি চেয়েছিলনে, ঠিক তেমনি করে গড়ে তুলব। সুদূর অতীত থেকে আমাদের এই দুর্দিনে তার কণ্ঠধ্বনি ভেসে আসছে, ক্ষমতালোভীরা আমাদের উপর আক্রমণ করুক, আমরা বাঁচব, আমরা জয়ী হব।"

বুড়োর কণ্ঠস্বর নীচু পর্দায় নেমে আসে। কণ্ঠ তার আবেগপ্রবণ, বিষাদক্লিষ্ট। শিক্ষকদের মধ্যেও একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; তাদের চোখে-মুখে আত্মসংযম আর গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে। বুড়ো বলে যায়, "আজ আমরা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সেই সুযোগ্য সন্তানদের স্মরণ করব যারা সানন্দে স্বদেশ ভূমি রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রাণাহুতি দিয়েছে। একুশ জন বীর যোদ্ধা আর আমাদের মধ্যে নেই; একুশ জন বীর সন্তান বীরের মৃত্যু বরণ করেছে। একুশ জন বীর পুরুষ যুদ্ধের কোলাহল থেকে মুক্তি পেয়ে বিদেশে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাটির তলে দীর্ঘ নিদ্রা সুখ উপভোগ করছে—"

সহসা অট্টহাসির গুরু গম্ভীর ধ্বনি শেনা যায়। প্রিন্সিপাল দিশেহারা হয়ে থেমে যান। এটা উইলির অট্টহাসি। ক্রোধদীপ্ত রক্তিম তার মুখ।

"সবুজ তৃণ! সবুজ তৃণ!" সে দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে "দীর্ঘ নিদ্রা সুখ? শেল বিধ্বস্ত গর্তে তারা পড়ে আছে—তাদের দেহ পচে গলে টুকরো টুকরো হয়ে কাদায় মিশে আছে। সবুজ তৃণ। এটা সঙ্গীত শিক্ষার আসর নয়।" তার বাহু দুটো ঝঞ্ঝা তাড়িত হাওয়া কলের মতন ভনভন করে ঘোরে। "বীরের মৃত্যু। সে মৃত্যু কত বীভৎস সে সম্বন্ধে আপনার ধারণা আছে? আপনি কি জানতে চান তরুণ হয়্যার কেমনভাবে মারা গেলো? সারাদিন সে কাঁটা তারের উপর পড়ে চিৎকার করলো। তার নাড়িভুঁড়ি লেইয়ের মতন পেট থেকে বেড়িয়ে পড়েছে। এক টুকরো শেল তার এক হাতের আঙ্গুলগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে, ঘণ্টা দুই পরে আর একটা শেল তার পাটা আলগা করে ফেলেছে। তবু সে

বেঁচে রইলো ; অন্য হাতটা দিয়ে সে তার নাড়িভুড়িটা পেটের ভিতর ঠেসে রাখতে চেষ্টা করছে। রাতের বেলায় তার জীবন লীলার অবসান হলো। অন্ধকারে আমরা তাকে উঠিয়ে আনতে গেলাম। আপনার সাহস থাকলে তার এই মৃত্যু বিবরণী তার মাকে শুনিয়ে আসুন।"

প্রিন্সিপালের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি ভাবছেন, আমাদের উপর জোর করে নিয়মানুবর্তিতা চাপিয়ে দিবেন, না আমাদের খুশী রাখবেন, কিন্তু মনস্থির করতে পারছেন না।

"প্রিন্সিপাল সাহেব," এবার আলবার্ট ট্রুসকি শুরু করে, "আমরা আমাদের কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করেছি। যদিও দুর্ভাগ্যবশত আমরা জয়ী হতে পারিনি। এসব কথা শুনতে আমরা এখানে আসিনি। এমন কথার উপর প্রিন্সিপাল দমে যান, সঙ্গে সঙ্গে অন্য শিক্ষকেরাও। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, "আমার অনুরোধ, অন্তত কথাবার্তায় তোমরা শালীনতা—"

"বিষ্ঠা। বিষ্ঠা। বিষ্ঠা। একশ বার বলব।" ট্রুসকি আবার জোর দিয়ে বলে। "বছরের পর বছর আমরা প্রতি দিন কথায় কথায় এই বুলি উচ্চারণ করেছি, আপনাদের তা জানা উচিত ছিলো। মনে হচ্ছে, আপনারা কোন কিছুর খবর রাখেন না। আমরা আর আপনাদের সেই সুশীল সুবোধ ছাত্র নই, আমরা এখন সৈনিক।"

"কিন্তু ভদ্র মহোদয়গণ, বুড়ো প্রায় মিনতির সুরে বলেন, "আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে; ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক ভুল বোঝাবুঝি।"

তিনি তার বক্তব্য শেষ করতে পারেন না। হেলমুথ রেইনাসম্যান তাকে বাধা দেয়। সে তার আহত ভাইকে গোলা বৃষ্টির মাঝখানে যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে কাঁধে বয়ে এনেছিলো, কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে এনে নামানো হলে দেখা গেলো যে তার ভাইয়ের দেহে প্রাণ নেই।

সে ক্রোধোন্মত্ত কণ্ঠে বলে "আপনারা তাদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। এ জন্য তারা প্রাণ দেয়নি। তারা ছিল আমাদের কমরেড, তাদের এই পরিচয়ই যথেষ্ট। এ নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করে কাজ নেই।"

হট্টগোল বিরাজ করছে; অসহায় প্রিন্সিপাল ভয়ে সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে থাকেন। অন্য শিক্ষকদেরও অপরাধীর মত দেখায়। মাত্র দুজন শিক্ষক শান্ত নির্ভীক; তারা দুজন যুদ্ধফেরত সৈনিক।

যে করেই হোক আমাদের খুশী করে, এই বুড়োর ইচ্ছে। আমরা সংখ্যায় অনেক। উইলি তার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। কে জানে, এই উচ্ছৃঙ্খল হতভাগারা কখন কি কুকাণ্ড করে বসে। তারা ইচ্ছে করলে পকেট থেকে বোমাও বের করতে পারে। তিনি দেবদূতের পাখা ঝাপটানির মতন শূন্যে দুহাত নেড়ে আমাদের শান্ত হতে ইঙ্গিত করেন। কিন্তু কেউ তাতে কান দেয় না। হট্টগোল চলতে থাকে। সহসা হট্টগোল থেমে যায়। লুদভিগ ব্রেয়ার সামনে এগিয়ে এসেছে। চারদিক স্তব্ধ। "প্রিন্সিপাল সাহেব", স্পষ্ট কণ্ঠে লুদভিগ বলে, "আপনারা আপনাদের পছন্দসই যুদ্ধ দেখেছেন। নিশান উড়ছে; সমর সঙ্গীত বাজছে। কি জাঁকজমক! কিন্তু আপনারা যুদ্ধটা দেখেছেন মাত্র স্টেশন পর্যন্ত। যেখান থেকে আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করি। আপনাদের দোষ দেই না। আমরাও আপনাদের মতন ভেবেছিলাম, কিন্তু তারপর আমরা এর অন্যদিকটাও দেখেছি। তা দেখে যুদ্ধের বীরত্ব আমাদের চোখে একেবারে ম্লান হয়ে গেছে। তবু যে আমরা লড়াই করে গেছি, তার পিছনে গভীরতর একটা কিছু ছিলো। যা আমাদের এক সূত্রে বেঁধে রেখেছিলো। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই তার সন্ধান মিলে। তা হয়ত ছিলো আমাদের দায়িত্বের বোধ। এ সম্বন্ধে আপনাদের কোন উপলব্ধি নেই আর তা বক্তৃতার বিষয়-বস্তু হতে পারে না।"

লুদভিগ এক মুহূর্ত থেমে শূন্য দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে তাকায়। কপালটা মুছে নিয়ে আবার বলে যায় "আমরা এখানে হিসেব নিকেশ নিতে আসিনি। তা নির্বুদ্ধিতা হবে। তখন কেউ জানতো না ভবিষ্যতে কি ঘটবে। এ ব্যাপারে আমরা কি ভাবব আপনাদের কাছ থেকে সেই বিধান আমরা চাই না। আমরা মহা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের কণ্ঠে ছিলো পিতৃভূমির জয়গাঁথা। তার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম আমাদের বুকে অক্ষয় হয়ে আছে। আমাদের অনুরোধ, এবার আপনারাও নীরবতা অবলম্বন করুন। অনেক চমৎকার শ্রুতিমধুর কথা বলা হয়েছে। কথাগুলো অর্থহীন, অসঙ্গতিপূর্ণ। আমাদের মৃত কমরেডদের জন্যও এই কথাগুলো যথাযোগ্য নয়। আমরা তাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছি। সেই করুণ স্মৃতি এখনও আমাদের হৃদয়ে এত অমলিন হয়ে রয়েছে যে, তাদের স্মৃতিচারণ আমাদের আনন্দ দেয় না। তারা যে আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়েছে তা তাদের স্মৃতি চারণের চেয়ে মহত্তর।

এবার সর্বত্র স্তব্ধতা বিরাজ করে। বৃদ্ধ প্রিন্সিপাল হাত জোড় করে শান্ত কণ্ঠে বলেন, "কিন্তু ব্রেয়ার আমি—আমি তা বলতে চাইনি—"

লুদভিগ তার বক্তৃতা শেষ করেছে।

একটু পরে প্রিন্সিপাল বলেন, "তা হলে এখন বল, তোমরা কি চাও?"

আমরা পরস্পরের পানে তাকাই! আমরা কি চাই? এক কথায় তা বলাটা যদি এত সহজ হতো। এ সম্বন্ধে আমাদের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে বটে, কিন্তু কথায় তা প্রকাশ করা? আমাদের দাবিগুলো এখনও আমার ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না, তবে পরে হয়ত তা পারব।

এক মুহূর্ত নীরবতার পর ওয়েস্ট হোল্ট সবাইকে ধাক্কিয়ে এগিয়ে এসে প্রিন্সিপালের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। "কাজের কথা কিছু বলুন। তা শুনতেই আমরা এখন এখানে এসেছি। আমরা এখানে সত্তর জন সৈনিক উপস্থিত। আমাদেরকে আবার স্কুলে ফিরে যেতে হবে। আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করবেন বলে স্থির করেছেন? আমি এই কথাও এখনই বলে দিতে চাই যে, পুঁথির বিদ্যা আমাদের নেই বললেই চলে। আর আমাদের ইচ্ছা যে, আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত একটা দিনও এখানে থাকতে রাজী নই।"

প্রিন্সিপাল তার অসন্তোষ চেপে রাখেন। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে, এ সম্বন্ধে তিনি কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশ পাননি। আপাতত আমরা যে শ্রেণীতে থেকে স্কুল ত্যাগ করেছিলাম সেই শ্রেণীতেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। অবশ্য পরে দেখা যাবে, এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা করা যায়।

এই কথায় আমাদের মধ্যে গুঞ্জন ও হাস্য ধ্বনি ওঠে। উইলি রেগে বলে, "আপনি কিন্তু এই ধারণা নিয়ে এখান থেকে পালাবেন না যে, আমরা সেইসব বাচ্চাদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসবো যারা কোন দিন যুদ্ধ দেখেনি। আর কিছু শিখতে পারলেই সুশীল সুবোধ বালকের মতন চুপ করে থাকব। আমরা সবাই এক সঙ্গে থাকছি।------"

"আমরা ভাবতে আরম্ভ করছি যত সব মজার ব্যাপার। বছরের পর বছর তারা আমাদের গুলি করতে, ছোরা মারতে আর হনন করতে দিয়েছে, আর এখন কিনা এ ব্যাপারটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে যে, আমরা কোন শ্রেণীতে পড়ার সময় এসব কাজ করার জন্য স্কুল ত্যাগ করে-ছিলাম। এক ক্ষেত্রে তারা দুটো অজানা সংখ্যার সঙ্গে সমীকরণ করছে আর অন্য ক্ষেত্রে একটি সংখ্যার সঙ্গে সমীকরণ করছে অর্থাৎ একটি সংজ্ঞার দু রকম ব্যাখ্যা করছে। এই পার্থক্যটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিন্সিপাল কথা দেন যে, আমাদের জন্য একটা বিশেষ পাঠ্যসূচী নির্ধারণের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবেন।

"আমরা আপনার এই কথার উপর ভরসা করে অপেক্ষা করতে পারিনা।" ট্রুসকি কাটখোট্টা জওয়াব দেয়। "আমরা নিজেরাই বরং এর বিহিত ব্যবস্থা করব।"

প্রিন্সিপাল কোন জওয়াব না দিয়ে নীরবে দরজার দিকে পা বাড়ান। অন্যান্য শিক্ষকরা তার অনুসরণ করেন। তাদের পিছনে পিছনে আমরাও বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু উইলির কাছে এমন শান্ত পরিবেশ ভালো লাগে না। সে টেবিলের উপর থেকে টব দুটো উঠিয়ে মেঝেতে আছাড় মেরে চুরমার করে দেয়। "নিরামিষ খেতে আমার কোন দিন ভালো লাগে না।" —বিদ্বেষ সহকারে সে বলে ওঠে। মালাটা ওয়েস্টার হোল্টের মাথায় জড়িয়ে দিয়ে সে বলে, "এটা দিয়ে সুপ বানিয়ে—"

সিগারেট আর পাইপের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। গ্রামার স্কুলের যুদ্ধফেরত ছাত্রদের নিয়ে আমরা সভা জমিয়ে বসি। সব মিলে শতাধিক সৈনিক, আঠার জন লেফটান্যান্ট, ত্রিশ জন ওয়ারেন্ট অফিসার এবং নন-কম।

ওয়েস্টার হোলট স্কুলের নিয়মাবলীর একটা পুরানো বই নিয়ে এসেছে। সে সাহস করে তা পড়ে শোনায়। পড়া এগোয় না। কারণ প্রত্যেকটা অনুচ্ছেদের পরই হাসি হুল্লোড় চলে। আমাদের বিশ্বাসই হয় না যে এককালে এসব নিয়মাবলী আমাদের উপর প্রযোজ্য ছিলো।

ওয়েস্টার হোলট বিশেষ আমোদ পায়। যুদ্ধের আগে শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত রাত নয়টার পর আমাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিলো। উইলি তাকে শুনিয়ে দেয়। "তুমি আর বেশি রংবাজী করতে যেয়োনা আলউইন। তুমি তোমার শিক্ষককে সবচেয়ে বেশি ঠকিয়েছ। কোথায় মরে পড়েছিলে আর এখন কিনা প্রিন্সিপালের অন্ত্যেষ্টি ভাষণ শুনতে এসেছ। প্রিন্সিপাল তোমাকে প্রশংসা করে বলছেন। তুমি একজন বীর যোদ্ধা এবং আদর্শ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলে আর তারপর তুমি জীবিত হয়ে ফিরে এসেছ। তুমি বুড়োকে কি বিপাকেই ফেলেছ!

"ভাষণে তিনি তোমার মৃতদেহের উপর যেসব প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেছেন সেসব বাণী তাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। তবে আমি তোমার

সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তুমি সব সময়ই বীজগণিত আর রচনায় অতীব রদ্দি ছিলে।”

আমরা একটা ছাত্র পরিষদ নির্বাচন করি। কারণ আমাদের শিক্ষকরা হয়ত আমাদের মগজে কিছু জ্ঞান ঢুকিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আমরা আর তাদের কখনও আমাদিগকে শাসন করার অধিকার দেব না। আমাদের নিজেদের মধ্য থেকে আমরা লুদভিগ ব্রেয়ার হেলমুথ রেইনাসম্যান আর আলবার্ট ট্রসকিকে প্রতিনিধি মনোনীত করি, আর গ্রামার স্কুল থেকে প্রতিনিধি মনোনীত হয় জর্জ রাহে এবং কার্ল ব্রোগার।

তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, তিনজন প্রতিনিধি পরদিন সকাল বেলায় প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয়ে আমাদের পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষার ব্যাপারটা উপস্থাপন করবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা উইলি, ওয়েস্টার হোল্ট আর আলবার্টকে মনোনীত করি। লুদভিগ যেতে পারবে না। কারণ সে এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেনি। তিন জনের বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের জন্য আমরা পাশ এবং রেলওয়ের অনুমতি পত্র দেই। আমাদের হাতে অঢেল পাশ ও অনুমতি পত্র রয়েছে আর সেগুলো সই করার জন্য সেনা পরিষদের সদস্যও রয়েছে।

হেলমুথ রেইনাসম্যানের এই খেয়াল যে, স্থান কাল ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ডেলিগেশনের বেশভূষা হওয়া উচিত। তার ইচ্ছা উইলি তার নতুন পোশাকের বদলে ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরিধান করুক।

উইলি নৈরাশ্য ভরা কণ্ঠে বলে, “তা কেন?”

“তাতে মাছিমারাদের কাছে একশ যুক্তির চেয়ে বেশি কাজ হবে,” হেলমুথ তাকে বুঝিয়ে বলে।

উইলি প্রতিবাদ করে। নতুন পোশাকটা তার অত্যন্ত পছন্দসই; এই পোশাকটা দেখিয়ে কাফেতে বসে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। “ইনসপেকটরের টেবিলের উপর সজোরে চাপড়ালে কি কাজ হাসিল হবে না?”

কিন্তু হেলমুথকে কিছুতে নিরস্ত করা যায় না। উইলি, এতে কোন কাজ হবে না। ওদের সবাইকে ত আর মাথা ফাটিয়ে দেয়া যাবে না! একবার ত এই লোকগুলোর প্রয়োজন আমাদের পড়বে। যদি ছেঁড়া পোশাক পড়ে তাদের টেবিল চাপড়াও তবে তোমার এই পোশাক পরে

চাপড়ানোর চেয়ে অনেক বেশী কাজ হবে। আমি এই জন্যই কথাটা বলছি।

উইলি এবার হেলমুথের যুক্তিটা মেনে নেয়। হেলমুথ এবার ওয়েস্টার হোলটকে নিয়ে পড়ে। ওয়েস্টারহোলটকে কেমন যেন ন্যাংটা ন্যাংটা মনে হয়; তাই লুদভিগের সম্মান পদকটা তার বুকে পিন দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়। "এই পদকটা থাকলে একজন আণ্ডার সেক্রেটারীর কাছে তোমার বক্তব্য খুব যুক্তিপূর্ণ মনে হবে," হেলমুথ বলে দেয়।

আলবার্টের অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। তার যা আছে, তাই যথেষ্ট। তিনজনকে ভালো করে সাজিয়ে হেলমুথ তাদেরকে আপাদমস্তক দেখে নেয়। "চমৎকার! একবার শালগমখেকোদের দেখিয়ে দাও, সত্যিকার যুদ্ধ ফ্রণ্টের মানুষখেকোদের কেমন দেখায়।"

"এ সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার।" উইলি বলে। আসল উইলি।

পাইপ আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। কামনা, ভাবনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিলে উত্তেজনাময় চাঞ্চল্য। প্রভুই জানেন, ভবিষ্যতে এদের ভাগ্যে কি ঘটবে। একশ তরুণ সৈনিক, আঠার জন লেফটান্যান্ট, ত্রিশজন ওয়ারেন্ট অফিসার আর নন-কম। সবাই এখানে সমবেত। সবাই নতুন করে বাঁচতে চায়। এদের যে-কেউ শত্রুর গোলাগুলির সামনে একটা কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এদের মধ্যে এমনি একজনও নেই যে দ্বিধাহীন চিত্তে নির্ভুলভাবে তার কর্তব্য সম্পাদান করবে না। এরা প্রত্যেকে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকেই একজন নিখুঁত সৈনিক। এর বেশীও নয়, কমও নয়।

কিন্তু শান্তি কালে? আমরা কি যোগ্য ব্যক্তি? আমরা কি যুদ্ধ-কর্ম ছাড়া অন্য কর্মের উপযুক্ত?

তৃতীয় অধ্যায়

১

স্টেশন থেকে আমি এডলফ বেথ্‌কির বাড়ি যাচ্ছি। তার বাড়িটা চিনতে দেরি হয় না। ফ্রন্টে থাকতে সে কতবার তার বাড়ির বর্ণনা আমাকে শুনিয়েছে।

একটা ফলের বাগান। এখনো আপেল গাছের সব আপেল কুড়ানো হয়নি। গাছের তলায় অনেকগুলো পড়ে আছে। দরজার সামনে কতকগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। পাথরের টেবিলের উপরে আর নীচে অনেকগুলো ঝরা পাতা। ঝরা পাতার ফাঁকে ফাঁকে চেস্টনাট ফল আর খোসা চক চক করছে। এমন দৃশ্যের অস্তিত্ব তা হলে এখনো পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান আছে! আমি চারদিক তাকাই। এমন মনোরম দৃশ্যের অস্তিত্বের কথা আমি ভাবতে পারি না। এমন রহস্যময় সবুজ অরণ্যভূমি। হ্যাঁ, অরণ্যভূমিই বটে, কেবল গোলাবিধ্বস্ত বৃক্ষের কাণ্ড নয়। মাঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত মৃদু বাতাস। বারুদের ধোঁয়া আর গ্যাসের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধমুক্ত নির্মল বাতাস। আর বর্ষার ভিজে মাঠের সোঁদা সোঁদা সুরভি। ঘোড়ার দল লাঙ্গল টানছে আর চাষীরা ঘোড়ার পিছনে পিছনে চলছে। চাষীরা তা হলে যুদ্ধ সীমান্ত থেকে স্বগৃহে ফিরেছে। তাদের গায়ে সামরিক পোশাক।

একখণ্ড মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে। কিন্তু তার রজত-শুভ্র কিরণ-রেখা মেঘের পিছন থেকে চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ছেলেরা রঙ-বেরঙের ঘুড়ি উড়াচ্ছে। তারা আরামে স্নিগ্ধ হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। কামান বন্দুক নেই গোলা বারুদ নেই; বুকে ব্যথা-যন্ত্রণার অনুভূতি নেই; কোমর বন্ধের বোঝা নেই। নেই তাদের সেই শত্রুর আক্রমণের যন্ত্রণাদায়ক সতর্ক প্রতীক্ষা; নেই সেই বীভৎসতা আর মৃত্যু ভীতি। আমি বুক টান করে হাত দুলিয়ে পথ চলি আর এই দুর্লভ তৃপ্তিপূর্ণ মুহূর্তগুলো উপভোগ করি। আমি এখানে আমার কমরেড এডলফকে দেখতে এসেছি।

বাড়ির দরজাটা আধখোলা। ডান দিকে রান্না ঘর। আমি দরজায় করাঘাত করি। কোন সাড়া নেই। নাম ধরে ডাক দেই, তবু কোন সাড়া নেই। আরও এগিয়ে ভিতরের আর একটা দরজা খুলি। কে যেন টেবিলের সামনে বসে আছে। এবার সে আমার পানে চোখ তুলে তাকায়। উস্ক-খুস্ক চেহারা, পুরানো উর্দি পরা বেথকি।

"এডলফ!" আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠি। "তুমি আমার ডাক শুনতে পাও নি? ঘুমিয়েছিলে নাকি?" সে নড়ে না। যেখানে বসেছিলো সেখান থেকেই হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

"ভাবলাম, তোমাকে দেখে যাই এডলফ।" আমি বলি।

"এ তোমার ভালো মানুষী আর্নস্ট।" বিষণ্ণ কণ্ঠে সে জওয়াব দেয়।

"কিছু একটা হয়েছে এডলফ?" আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি।

"আহা, সে কথা জিজ্ঞেস করো না আর্নস্ট—"

আমি তার পাশে বসি। "কিন্তু এডলফ, তোমার হয়েছে কি?"

সে সোজা জওয়াবটা এড়িয়ে গিয়ে বলে, "কিছুই হয় নি। আমি বেশ আছি। আমাকে নিরিবিলি থাকতে দাও। দেবে কি? তোমাদের মধ্যে একজন যে শেষ পর্যন্ত এসেছ তাই ভালো।" সে দাঁড়ায়। "এমনি করে একলা থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায়—"

আমি এদিক ওদিক তাকাই; কোথাও তার স্ত্রীর সাড়া-শব্দ পাই না।

সে অল্পক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ বলে উঠে, "তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে।" বলে সিগারেট খুঁজতে থাকে। আমরা দুজনে দুই গ্লাস মদ নেই।

জানালার সামনে বাগান। সহসা বাতাসের ঝাপটায় গীর্জার ঘড়িতে ঘন্টা বাজে। ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে মেঝে দণ্ডায়মান একটা ঘড়ি সময় সঙ্কেত দেয়।

"তোমার স্বাস্থ্য কামনা করি, এডলফ।"

"তোমার স্বাস্থ্য কামনা করি, আর্নস্ট।"

একটা কালো বিড়াল চুপে চুপে ঘরটা পেরিয়ে এক লাফে একটা সেলাই কলের উপর উঠে ম্যাও ম্যাও করতে শুরু করে। একটু পরে এডলফ কথা আরম্ভ করে। "তারা—আমার আত্মীয় স্বজনেরা আর মেরীর

আত্মীয় স্বজনেরা এসে আলাপ-আলোচনা করে, কিন্তু তারা আমার মন বোঝে না আর আমিও তাদের বুঝতে পারি না। আমরা সবাই যেন বদলে গেছি।" সে হাতের উপর মাথা ন্যস্ত করে বলে যায় "তুমি আমাকে বুঝতে পার, আমিও তোমাকে বুঝতে পারি; কিন্তু এইসব লোক আর আমার মাঝখানে যেন একটা বাধার প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে।"

তারপর আমি সমস্ত কাহিনীটা আদ্যপান্ত শুনতে পাই।

পিঠে বোচকাভর্তি ভালো ভালো জিনিসপত্র, কফি, চকোলেট, এক প্রস্থ রেশমী কাপড়—যা দিয়ে একটা সম্পূর্ণ পোশাক বানানো যায়—নিয়ে বেথকি বাড়িতে এসে পেঁৗছে।

তার ইচ্ছে ছিলো চুপে চুপে বাড়িতে ঢুকে সে তার স্ত্রীকে চমকে দেবে, কিন্তু কুকুরটা পাগলের মত ঘেউ ঘেউ শুরু করে। তাই বেথকি আর নিজকে ধরে রাখতে পারে না। সে দ্রুত পায়ে আপেল গাছের পাশের পথটা দিয়ে ঘরের দিকে রওয়ানা হয়—তার বাড়ি, তার পথ, তারই স্ত্রী। তার বুকটা তখন কামারের হাপরের মতন দুরু দুরু করছে। সে ধড়াস করে দরজটা খুলে ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে ডাকে "মেরী— "

সে মেরীকে দেখতে পায়; চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে তার স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়—এই যে তার বাড়ি, এই ম্লান আলো এই ঘড়ি, এই টেবিল, এই বড় আরাম কেদারা, এই মেরী—সবই তার। সে তার স্ত্রীর পানে এগিয়ে যায়। কিন্তু তার স্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে ভূত দেখে মানুষ যেমন সরে যায়, তেমন করে আঁতকে সরে যায়।

এডলফের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় না। "আমি কি তোমাকে ভয় দেখালাম?" সে হেসে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" তার স্ত্রী ভীত কণ্ঠে জওয়াব দেয়।

"এ ভয় বেশিক্ষণ থাকবে না, মেরী।" উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে তার স্ত্রীকে প্রবোধ দেয়। শেষ পর্যন্ত সে স্বগৃহে ফিরে এসেছে। এই অনুভূতিতে তার সমস্ত সত্তা কাঁপতে থাকে। কত কাল পর সে এ ঘরে ফিরে এসেছে!

"তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে তা আমি জানতাম না, এডলফ।"

তার স্ত্রী এ কথা বলে দূরে দাঁড়িয়ে তার পানে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। মুহূর্তের জন্য তার সব উৎসাহ নিভে যায়; তার নিঃশ্বাস বন্ধ

হয়ে আসে। "আমি ফিরে এসেছি, তাতে কি তুমি একটুও খুশী হও নি?" সে কেমন একটা বিদঘুটে প্রশ্ন করে। "হ্যাঁ, এডলফ। নিশ্চয়ই "

"কোন কিছু কি ঘটেছে?" বোচকাটা কাঁধে রেখেই সে বলতে থাকে।

তারপরই অশান্তি শুরু হয়। তার স্ত্রী মাথাটা টেবিলের উপর রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তখনই ব্যাপারটা তার বোঝা উচিত ছিলো যে অন্যরা আসল ব্যাপারটা তাকে জানিয়ে দেবে যে তার অনুপস্থিতিতে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে তার স্ত্রীর একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। এটা তার পরিকল্পিত কোন ব্যাপার নয়। আচমকা ঘটে যায়। এতে যে কোন দোষ হবে, তাও সে ভাবে নি। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের কথা সে কোন দিন চিন্তা করে নি। এখন তার স্বামী ইচ্ছে করলে তাকে খুন করতে পারে।

এডলফ দাঁড়িয়ে থাকে। সহসা সে লক্ষ্য করে যে বোচকাটা তার পিঠের উপর তখনো বানরের মতন চেপে রয়েছে। সে বোচকাটা নামিয়ে জিনিসপত্রগুলো খুলতে শুরু করে। তার দেহ কাঁপছে। সে মনে মনে চিন্তা করতে থাকে, "না, এটা কখনো সত্যি হতে পারে না।" একটা কিছু তার করা চাই। তাই সে জিনিসপত্রগুলো বোচকা থেকে বের করে। সে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। রেশমী কাপড়ের টুকরোটা তার হাতে খসখস করে। সে সেটা উঠিয়ে বলে "আমি এটা তোমার জন্য এনেছিলাম।" এই কথাটা বলতে বলতেও সে ভাবে— "না, এটা কখনো সত্যি হতে পারে না, সত্যি হতে পারে না।" সে অসহায়ভাবে লাল রঙের রেশমী কাপড়ের টুকরোটা ধরে রাখে। কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা যে ঘটে গেছে তার গুরুত্বটা তখনো তার মগজে ঢোকে না।

তার স্ত্রী কাঁদছে; তার কোন কথাই শুনছে না।· কি ঘটেছে, তা ভাববে বলে সে বসে পড়ে। হঠাৎ তার প্রচণ্ড ক্ষিদে পায়। টেবিলে তার বাগানের কয়েকটা আপেল রয়েছে—পাকা আপেল। সে সেগুলো খেতে থাকে। তাকে একটা কিছু করতেই হবে। এবার সে ব্যাপারের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারে। হাত তার অবশ হয়ে যায়। হঠাৎ তার মাথায় খুন চেপে যায়। কাউকে খুন করতেই হবে। লোকটার সন্ধানে সে ছুটে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু লোকটার সন্ধান সে পায় না। এবার সে শুঁড়ীখানায় যায়। সেখানে সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানায়, কিন্তু কেমন যেন চাপা চাপা ভাব। তারা তার দিকে চেয়ে চুপে চুপে কি যেন বলাবলি করে। তা হলে তারাও এ ব্যাপারটা জানে। সে এমনি ভাব দেখায় যে কিছুই হয় নি। কিন্তু কতক্ষণ? বোতলটা শেষ করে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে কে যেন বলে, "বাড়ি গিয়েছিলে?" সে চলে এলে সেখানে নীরবতা বিরাজ করে। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে সে অনেক রাতে বাড়ির সামেনে এসে হাজির হয়। এখন সে কি করে? সে ঘরের ভিতর যায়। ঘরে আলো জ্বলছে; টেবিলের উপর কফি আর উনুনে একটা কড়াইয়ে আলু ভাজা। "আহ, কেবল সেই ব্যাপারটা সত্যি না হলে কি চমৎকারই না হতো!" সে বিষণ্ণ মনে ভাবে। এমন কি টেবিলের উপর একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড়ও বিছানো আছে। কিন্তু তাতে যে পরিবেশটা আরও কঠিন দুঃখময় হয়ে উঠেছে। তার স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত, কিন্তু এখন আর সে কাঁদছে না। বসার সাথে সাথেই তার স্ত্রী কফি ঢেলে দেয়, আলু ভাজা টেবিলের উপর রেখে দেয়; কিন্তু নিজের বসার জন্য তার স্ত্রী কোন জায়গা করে নি।

সে স্ত্রীর পানে তাকায়। তার স্ত্রীকে অত্যন্ত শীর্ণ মলিন দেখায়। আবার সব কথা নতুন করে তার মনে জেগে ওঠে। অর্থহীন বেদনায় তার মন দলিত মথিত হয়। সে আর কোন কথা জানতে চায় না—সে ঘরের মধ্যে নিজকে আবদ্ধ করে রাখতে চায়, তার বিছানায় শুয়ে থাকতে চায়। সে জড় পদার্থ হতে চায়। কফি থেকে ধোঁয়া উঠছে। সে কফি আর কড়াইটা সরিয়ে দেয়। তার স্ত্রী দূরে সরে যায়। সে জানে, এবার কি ঘটবে।

কিন্তু সে উঠে না; উঠতে পারে না। সে মাথাটা নেড়ে শুধু বলে, "মেরী তুমি যাও।"

তাঁর স্ত্রী কোন প্রতিবাদ করে না। সে তার শালটা কাঁধে জড়িয়ে নিয়ে কড়াইটা স্বামীর দিকে সামান্য এগিয়ে দিয়ে ভীরু কণ্ঠে, "কিছু অন্তত খেয়ে নাও এডলফ্" বলে বেরিয়ে যায়। সে নীরবে ধীর পদক্ষেপে চলে যায়। দরজাটা বন্ধ হয়। বাইরে কুকুরটা ডাকে। বাতাস জানালায় লেগে আর্তনাদ করে। বেথকি নিঃসঙ্গ।

তারপর রাত্রি নামে—

একজন সদ্য যুদ্ধ-ফেরত লোকের পক্ষে এ কয়েক দিনের নিঃসঙ্গ জীবন তার জীবনী শক্তিকে বিনাশ করে দেয়।

এডলফ্ লোকটাকে ধরতে চেষ্টা করে, কিন্তু লোকটা তাকে সময় মতন দেখতে পেয়ে পালিয়ে যায়। এডলফ ওত পেতে থাকে; সব জায়গায় তাকে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু তাকে ধরতে পারে না। এই ধরতে না পারাটাই তার কাল হয়।

তার স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনেরা এসে তার সঙ্গে আলাপ করে; তাকে বুঝাতে চেষ্টা করে। তাকে বুঝিয়ে বলে যে পরিস্থিতিটা তার ভেবে দেখা উচিত। তার স্ত্রী অনেক দিন থেকে ভালো হয়ে গেছে। লোকটারই সব দোষ। তা ছাড়া, দীর্ঘ চার বছর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর যুদ্ধের সময় ত কত জনেই কত কেলেঙ্কারী কাণ্ড-কারখানা করেছে।

"এবার কি করা যায়, আর্নস্ট?" এডলফ আমার কাছে পরামর্শ চায়। আমি তাকে কোন পরামর্শ দিতে পারি না। ব্যাপারটা এমনি কলঙ্কের! "এমনি অবস্থায় ঘরে ফিরে আসার কোন অর্থ হয় আর্নস্ট? কি বল?"

গ্লাসে মদ ভরে আমরা আবার চুমুক দেই। এডলফের ঘরে সিগারেট নেই। সে নিজে দোকানে গিয়ে সিগারেট আনতে চায় না। আমিই সিগারেট আনতে যাই। সে ভয়ানক সিগারেটখোর। কয়েকটা সিগারেট পেলে তার উপকার হবে। তাই আমি এক বাক্স সিগারেট নিয়ে আসি। বীচ পাতার তৈরী বাজে সিগারেট। তবু নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

সিগারেট নিয়ে ফিরে এসে দেখি আর একজনও সেখানে রয়েছে। বুঝলাম, তার স্ত্রী। সে সোজা হয়ে চলে যদিও তার স্কন্ধদেশ ক্ষীণ। নারী জাতির গ্রীবা ও স্কন্ধদেশের সঙ্গে কেমন যেন কারুণ্য জড়িয়ে থাকে। তার স্ত্রীকে ক্ষীণাঙ্গিনী কিশোরীর মতন দেখায়। এমন মেয়ের উপর কেউ কঠোর হতে পারে না। অবশ্য মোটা স্ত্রীলোক—যাদের গ্রীবাদেশ শূয়োরের মতন—তাদের কথা আমি বলছি না।

আমি মাথা থেকে টুপিটা তুলে তাকে স্বাগতম জানাই। সে তাতে কোন সাড়া দেয় না। আমি বাক্সটা এডলফের সামনে রেখে দেই। সে তা স্পর্শ করে না। ঘড়িটা টিক টিক করে চলে। চেস্টনাটের শুকনো পাতা জানালার শার্সি বেয়ে মাটিতে পড়ে। কয়েকটা পাতা জানালায় আটকে থাকে। হেমন্তের মৃত্যু-ছোঁয়া-লাগা ধূসর বিবর্ণ ঝরা পাতার দল।

অবশেষে এডলফ নড়েচড়ে এক অদ্ভুত কণ্ঠে বলে, "তুমি এখন যাও, মেরী।"

সে স্কুলের সুবোধ শিশুর মতন সোজা সামনের দিকে চোখ রেখে চলে যায়। ক্ষীণ গ্রীবা, ভঙ্গুর স্কন্ধ—কেমন করে তা সম্ভব?

"রোজ এমনি করে সে এসে বসে থাকে; একটি কথাও না বলে প্রতীক্ষায় আমার পানে চেয়ে থাকে।" এডলফ বিষাদক্লান্ত কণ্ঠে আমাকে শোনায়। এডলফের জন্য আমার দুঃখ হয়। আর এই নারীর জন্যও আমি দুঃখ অনুভব করি।

"আমার সঙ্গে শহরে চল, এডলফ। এখানে এমনি করে গোমড়ামুখো হয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না।" আমি প্রস্তাব করি।

সে শহরে যাবে না। বাইরে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে। তার স্ত্রী বাগানের গেট দিয়ে নীরবে বেরিয়ে তার বাপের বাড়ি চলে যায়।

"ওকি তোমার কাছে আবার ফিরে আসতে চায়?" আমি তাকে প্রশ্ন করি। সে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে। আমি আর কিছু বলি না। তার ব্যাপার সে নিজে বুঝুক। "তুমি কি সত্যি আমার সঙ্গে যাবে না?" আমি আবার শুধাই।

"আর্নস্ট, আমি পরে যাব।"

"বেশ। একটা সিগারেট নাও।" বলে সিগারেট বাক্সটা তার দিকে এগিয়ে ধরি। সে একটা সিগারেট তুলে নেয়। এবার তার সাথে কর মর্দন করে বলি। "এসে তোমাকে দেখে যাব এডলফ।"

সে সদর ফটক পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসে। আমি সামান্য দূরে এসে হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাই। সে তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পশ্চাতে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার যবনিকা। আমাদের সঙ্গে তার থেকে যাওয়া উচিত ছিলো। এখন সে একাকী অসুখী, আমরা তাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না; করতে পারলে খুশী হতাম। হ্যাঁ, সীমান্তের জীবন অনেক ভালো ছিলো—সেখানে জীবন্ত থাকা পর্যন্ত কারো কোন অসুবিধে অশান্তি ছিলো না।

২

আমি বাহুতে মাথা রেখে সোফার উপর চোখ বুঁজে সটান শুয়ে থাকি। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অসম্ভব এক ভাবনা-জাল আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমার

চৈতন্য বোধ স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকে। দেহ-মন অবসাদক্লান্ত। দূর থেকে কামান-বন্দুকের অস্পষ্ট ধ্বনি, শেলের শোঁ শোঁ আর গ্যাস আক্রমণের সঙ্কেত ধ্বনি ভেসে আসে। কিন্তু গ্যাস মুখোশ হাতড়ে বের করার আগেই তা অন্ধকারে নিশব্দে পালিয়ে যায় ; সব ধ্বনি মিলিয়ে যায়। আমি আবার সোফার উষ্ণতা অনুভব করি। আমার মনের গহনে অস্পষ্ট অনুভূতি জাগে, এটা যুদ্ধক্ষেত্র নয়। এটা আমার স্বগৃহ। গ্যাস আক্রমণের সঙ্কেত টেবিলের উপর মায়ের সতর্ক হস্তের বাসন পেয়ালা সাজানোর টুংটাং শব্দ মাত্র।

আবার মনের অঙ্গনে অন্ধকার নেমে আসে। তার সাথে বহু দূর থেকে অরণ্য আর সমুদ্রের উপর দিয়ে যেন কামান বন্দুকের গর্জন ধ্বনি ভেসে আসছে ; তার সাথে যেন কতকগুলো কথাও ভেসে আসছে। কথাগুলো আমার কাছে ক্রমশ অর্থবহ হয়ে ওঠে। "কার্ল চাচা কাবাব পাঠিয়েছে।" মায়ের এই কথাগুলো অস্পষ্ট কামান বন্দুকের ধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে আমি শুনতে পাই।

শেল-গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করার সময় এই কথাগুলো আমার কানে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মুকুরে একটা সঙ্কীর্ণচেতা আত্মতৃপ্ত মুখ ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। লোকটাকে স্মরণ করে একটা অশ্রাব্য কদর্য গালি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমি শেল-গর্তে নামতে থাকি। ছায়া-মূর্তির দল আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

বাসন পেয়ালার টুংটাং শব্দ আবার আমার কানে ভেসে আসে। আমি আমার সম্বিৎ ফিরে পাই ; চোখ মেলে তাকাই। আমার মা বিবর্ণ শঙ্কিত মুখে আমার পানে নিষ্পলক চেয়ে আছে।

ভয়ে লাফিয়ে উঠে আমি চেঁচিয়ে বলি। "কি হয়েছে মা ? তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ ?"

তিনি মাথা নাড়েন। "না-না, কিন্তু তোমার মুখে এমন কথা—" আমি চিন্তা করি। আমি কি বলেছি। হ্যাঁ, কার্ল চাচা সম্বন্ধে। তাতে কি হয়েছে মা ? এতটা স্পর্শকাতর হয়ো না মা। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। "আসলে কার্ল চাচা একজন মুনাফাখোর, তা তুমিও জান। তিনি কি এখন আর তেমনটি নন ?"

"আমি সেইজন্য মোটেই মন খারাপ করিনি।" মা শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দেন, "কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে অমন কথা বেরোবে—" তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়

আমি কি বলেছিলাম, তা এবার আমার মনে পড়ছে। মায়ের সামনে এমনটি ঘটেছে বলে আমি লজ্জা পাই। আমি ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলি, "মা, কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। যুদ্ধ সীমান্তের অভ্যেস ভুলতে কিছু সময় লাগবে। সেখানে আমাদের ভাষা ছিলো অনেকটা অমার্জিত তা আমি জানি, তবে অমার্জিত হলেও সে ভাষায় সততা ছিলো।"

আমি চুল আঁচড়ে জামাটা গায়ে দেই। একটা সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে লক্ষ্য করি যে মা তখনও আমার দিকে চেয়ে আছে। তাঁর হাত কাঁপছে।

সিগারেট খোঁজা বন্ধ করে তাঁর গলা জড়িয়ে বলি, "মা, এই কথায় সত্যিই এমন খারাপ কিছু নেই। সৈনিকরা এমনই হয়ে থাকে।"

"হ্যাঁ আমি তা জানি।" তিনি প্রতিবাদ করেন, "কিন্তু তুমি—তুমিও কিনা শেষ পর্যন্ত------"

আমি হাসি। আমিও? নিশ্চয়ই আমিও। আমি চেঁচাতে গিয়ে চেপে যাই। মায়ের গলা থেকে হাত সরিয়ে নেই। সহসা একটা কথা মনে জাগে। সোফায় বসে কথাটা ভাবি।

অদূরে বৃদ্ধা মা দাঁড়িয়ে আছেন। উদ্বিগ্ন চিন্তাক্লিষ্ট তাঁর মুখ। এক হাতে আর একটা হাত ধরে আছেন। ক্লান্ত শ্রমক্লিষ্ট বলি-রেখাঙ্কিত হাত দুটো। শিরা উপশিরাগুলো নীলাভ। আমারই জন্য তার এই অবস্থা। এ কথাটা আমি আগে কখনো ভাবি নি। আগে এমন অনেক কথাই ভাবি নি। তখন ছোট ছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারি, এই জীর্ণদেহ মহিলার কাছে দুনিয়ার জন্য যে-কোন সৈনিক থেকে আমি ভিন্ন, কারণ আরি তার সন্তান।

সৈনিক হলেও আমি তার সন্তানই রয়ে গেছি। যুদ্ধ কালে তিনি দেখেছেন একদল বন্য জানোয়ার তার সন্তানের প্রাণ নাশে সচেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এই সত্যটা তার মনে কোনদিন উদয় হয় নি যে তার নিজের এই সন্তানও বন্য জানোয়ার হয়ে অন্য মায়ের সন্তানকে বিনাশ করতে চেয়েছে।

আমার চোখ তার হাত থেকে আমার হাতের উপর পড়ে। উনিশ শো সতর সালের মে মাসে এই হাত দিয়েই আমি একজন ফরাসী সৈনিককে ছোরা মারি। তার উষ্ণ রক্তের ছিটা আমার হাতে লাগতেই আমার দেহটা

ঘৃণায় রিরি করে ওঠে। আমি তখন আতঙ্কে আর ক্রোধে বার বার তার দেহে ছোরা মারতে থাকি। ফরাসী সৈনিকটা তার হাত দিয়ে জখমটা চেপে ধরলে আমি নিজকে সংযত করতে না পেরে তার হাতটার উপরই ছোরা মারতে থাকি। অবশেষে সে কাত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে আমি বসি এবং সারা রাত কেঁদে কাটাই। অনেক করে পর দিন এডলফ বেথকি আমাকে শান্ত করে। তখন আমার বয়েস আঠার। শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণে সেই আমার প্রথম অংশগ্রহণ।

আমি আমার হাত দুটো ধীরে উল্টিয়ে দেখি। জুলাই মাসের প্রথম আমরা যে হামলা করি, তাতে এই হাত দিয়েই আমি তিন জনকে গুলি করেছিলাম। তারা সারাদিন কাঁটা তারের বেড়ার উপর ঝুলে রইলো। শেল বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের দুর্বল হাত তুলে ধরতো। মনে হতো তারা বুঝি এখনো আমাদের ভয় দেখাচ্ছে বা আমাদের সাহায্য ভিক্ষা করছে। তাদের একজনের চুল ছিলো বরফের মতন শাদা, তার জিভটা মুখ গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো। আর একবার আমি বিশ গজ দূরে থেকে বোমা নিক্ষেপ করে একজন ইংরেজ কাপ্তানের দুটো পা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলাম। তার কী বীভৎস চিৎকার। মাথাটা পিছনের দিকে শুইয়ে দিয়ে মুখটা হাঁ করে বাহুর উপর ভর দিয়ে সে সীল মাছের মতন পড়েছিলো। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়।

আর এখন আমি আমার মায়ের সামনে বসে আছি। আমি কেমন করে এমন রুচি বিগর্হিত ভাষা উচ্চারণ করতে পারি, তাই ভেবে মায়ের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

বদলে গেছি। আমি তিক্ত মনে ভাবি। হ্যাঁ, আমি বদলে গেছি। মা, এখন তুমি আমার সম্বন্ধে কি জান? আমার সম্বন্ধে তুমি একটি স্মৃতি মাত্র বহন করছ। আমার অতীত শান্ত জীবনের স্মৃতি। গেলো কয় বছরে কি যে ঘটে গেছে তা তুমি জানতে পারবে না। তুমি জানতে পারবে এই কয় বছরে কি কি হয়ে গেছে? তা তুমি জানতে চেয়ো না। কখনো জানতে পারবে না। তুমি ভাবতেও পারবে না গত কয়টি বছর কেমন গেলো আর আমিই বা কি হয়ে গেছি। এর শতাংশের একাংশ জানতে পারলে দুঃখ-কষ্টে তোমার বুক ভেঙ্গে যাবে। তুমি আমার মুখের একটি কথার ধাক্কায় কাঁপছ—একটা কথায় আমার সম্বন্ধে তোমার মনের ছবিটা

ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। "সব ঠিক হয়ে যাবে মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।" অসহায়ের মতন কথাগুলো বলে আমি নিজকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি।

তিনি আমার পাশে বসে আদর করে আমার হাতে মৃদু আঘাত করেন। আমি আমার হাত দুটো সরিয়ে নেই। তিনি আহত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে বলেন "সময় সময় তোমাকে আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়। তখন তোমাকে দেখে আমি যেন চিনতেই পারি না।"

"মা, প্রথমত আমাকে এই জীবনে অভ্যস্ত হতে দাও। এখনো আমার মনে হয় আমি যেন এখানে বেড়াতে এসেছি।" আমি মাকে বলি।

ঘরে প্রদোষের অন্ধকার নামে। আমার কুকুরটা বাইরে থেকে এসে আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে। আমার দিকে চেয়ে তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। সে এখনো চঞ্চল; এখন পর্যন্ত এখানে নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না।

মা তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বলে "আর্নস্ট, তুমি যে আবার ফিরে এসেছ, তাতেই---------"

"হ্যাঁ, ওটাই আসল কথা মা।" দাঁড়িয়ে আমি কথাটা বলি।

তিনি প্রদোষের অন্ধকারে তার ছোট্ট দেহটা নিয়ে বসে থাকেন। অসীম মমতা নিয়ে আমি তার পানে চেয়ে ভাবি, সহসা এই রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে আমাদের ভূমিকা কেমন বদলে গেছে। এবার মা শিশু হয়ে গেছে।

আমি মাকে ভালোবাসি; আগের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। যদিও মাকে আমি হয়ত জীবনে কোন দিন সব কথা মন খুলে বলে মনের শান্তি ফিরে পাব না।

মা চোখ বুঁজে আছেন। "কাপড়-চোপড় পরে বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসি" আমি অনুচ্চ কণ্ঠে বলি, যাতে তার মনে ব্যাঘাত না ঘটে। তিনি মাথা হেলিয়ে বলেন, "আচ্ছা বাছা," তারপর মোলায়েম কণ্ঠে বলেন, "সোনা যাদু আমার।"

এই কথায় আমার বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমি দরজা খুলে নীরবে বেরিয়ে পড়ি।

সিক্ত তৃণভূমি। পায়ে চলার পথ বেয়ে জলধারা কলকলিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। আমার গ্রেট কোটের পকেটে একটা বৈয়ম। আমি ঝর্ণার পাশের পপলার গাছের তল দিয়ে হেঁটে চলছি। ছোট বেলায় এখানে মাছ আর ফড়িং ধরতাম। গাছের তলায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতাম।

বসন্তকালে এই জায়গা জলীয় আগাছা আর ব্যাঙের ডিমে ভরে উঠতো। জলীয় আগাছার উজ্জ্বল সবুজ পাতা বাতাসে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়ের উপর দোল খেতো, স্কেট খেলোয়াড়েরা হোগলা ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে এঁকে বেঁকে ছুটোছুটি করতো। মাছের ঝাঁক রোদে সোনালী বালু স্তরের উপর ছায়া ফেলতো।

কিন্তু এখন এই জায়গাটা ঠাণ্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে। ঝর্ণার ধারে দীর্ঘ সারিবদ্ধ পপলার গাছ। শাখাগুলো রিক্তপত্র। তবে তাতে কচি কিশলয় উঁকি দিচ্ছে। আবার গাছগুলো একদিন সবুজ হয়ে উঠবে, গাছের পাতাগুলো মর্মর ধ্বনি করবে; আমার শৈশবে স্মৃতি জড়িত এই জায়গা আবার সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হবে। সে দিন যুদ্ধের স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে যাবে। আবার সবকিছু আগের মতন হয়ে যাবে।

ঝর্ণার ঢালু কিনারে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে দুটো মাছ লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়। মাছগুলো দেখে আমি নিজকে সংযত করতে পারি না। আমি ঝর্ণার সঙ্কীর্ণ জায়গাটায় দুটো পা ফাঁক করে মাছ দুটোর জন্য প্রতীক্ষা করি। তারপর চট করে মাছ দুটো ধরে কাঁচের বৈয়মে রেখে দেই।

মাছ দুটো বৈয়মের ভিতর নাচতে থাকে। চমৎকার লাগে দেখতে। স্ফটিকস্বচ্ছ জল আর কাচের উপর জলের প্রতিবিম্বের সৌন্দর্যে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে সহসা যেন আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়।

সাবধানে বৈয়মটা সামনে ধরে রেখে আমি ভাবতে থাকি। আমার মনে হয়, আমি যেন আমার শৈশবকে এই বৈয়মে বদ্ধ করে ফেলেছি। এটাকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব। আমি এবার ঝর্ণার কিনারে বসে পড়ি। জলীয় ঘাস বাতাসে দুলছে। বিস্ময়ে একটা ব্যাঙ আমার পানে চেয়ে থাকে। আমি সব দেখি। চোখে দেখা যায় না এমন জিনিসের গোপন অস্তিত্বও সেখানে রয়েছে—আমার শৈশব স্মৃতি আমার বিগত জীবনের আশা আনন্দ।

আমি সযত্নে বৈয়মটা নিয়ে চলতে থাকি। বাতাস বইতে থাকে; দূরে আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। আচমকা এক বিপদ

সংকেতে আমি আমার দেহ পেশীতে প্রচণ্ড শিহরণ অনুভব করি।—শুয়ে পড়! শুয়ে পড়! আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাকে যে ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমি বাহু দুটো ছড়িয়ে শুয়ে পড়ি। যাতে এক লাফে গাছের আড়ালে আশ্রয় নিতে পারি। আমার দেহ কাঁপতে থাকে; আমি হাঁপাতে থাকি। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। আক্রমণের পালা শেষ হয়ে গেছে। বোকার মতন চারদিক তাকাই। বৈয়মটা আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিলো। সব পানি পড়ে গেছে। তবে মাছ দুটো এখনো বৈয়মের ভিতর লাফাচ্ছে। বৈয়মটি উঠিয়ে ঝর্ণার পানি দিয়ে তা ভরে নেই।

আমি এবার ভাবতে ভাবতে এগোতে থাকি। একটা কাঠ বিড়ালী চুপে চুপে পথটা পার হয়ে যায়। রেলের বাঁধটা এখানে এসে মাঠের সাথে মিলছে। বাঁধের উপর কংক্রিটের ছাদটা একটা মজবুত আশ্রয় স্থল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বাঁ দিকে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে সেখানে কয়েকটা মেশিন গান রাখতে পারলে সমস্ত অঞ্চলটা নিরাপদ থাকতো; তবে পপলার গাছগুলো কেটে ফেলতে হতো যাতে শত্রু পক্ষ কোন নিশানা না পায়। পিছনের পাহাড়ের দুটো ট্রেঞ্চে মর্টার স্থাপন করতে পারলেই হতো; তখন আসুক দুশমন।

একটা ট্রেনের বাঁশির আওয়াজে আমি ফিরে তাকাই। আমার ভাবনা-জাল ছিন্ন হয়ে যায়। আচ্ছা, আমি ভাবছি কি? শৈশবের দৃশ্য আবিষ্কার করতে এসে এখানে আমি ট্রেঞ্চ খোঁড়াখুঁড়ি করছি। মনে ভাবি, এটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এখন আমাদের চোখে সমতল ভূমি পড়ে না। সব আমাদের কাছে আক্রমণ আর আত্মরক্ষার এলাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় ঐ কারখানাটা আমাদের চোখে আর কারখানা নয় বরং আক্রমণের মজবুত লক্ষ্যস্থল। অরণ্যভূমি আর অরণ্য ভূমি নয়, আত্মরক্ষার উপযুক্ত স্থান।

আমি এসব ভাবনা মন থেকে দূর করে দিয়ে আমার বিগত দিন-গুলো স্মরণ করতে চেষ্টা করি। তাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় না। মনে আর আগের মতন আনন্দ জাগে না। আর দূরে যেতে ইচ্ছে হয় না; তাই বাড়িমুখো রওয়ানা হই।

দূরে একজন লোক এ দিকে আসছে। জর্জ রাহে। "তুমি এখানে কি করছ?" বিস্মিত রাহে প্রশ্ন করে:

"তুমিই বা এখানে কি করছ?"

"কিছু না," রাহে জওয়াব দেয়।

"আমার বেলায়ও একই কথা।"

"এই কাচের বৈয়ম?" প্রশ্ন করে সে বিদ্রূপাত্মক চোখে তাকায়। লজ্জায় আমি লাল হয়ে যাই।

"লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই," সে বলে, "আবার মাছ ধরতে চেষ্টা করছিলে নাকি?"

আমি মাথা নাড়ি। "কি হলো?" সে আবার প্রশ্ন করে।

আমি জওয়াব দেই না। সে ভেবে বলে, "উর্দির সঙ্গে এ কাজটা মানায় না।"

আমরা একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে ধূমপান করি। রাহে মাথা থেকে টুপিটা খুলে বলে, "মনে পড়ে আমরা এখানে কেমন করে ডাক টিকেট বিনিময় করতাম?"

"হাঁ মনে পড়ে।" আমার সব মনে পড়ে। সূর্যের উত্তাপে কাঠ-গোলা থেকে রঞ্জন আর আলকাতরার গন্ধ আসতো, পপলার গাছগুলো চিকচিক করতো, ঝর্ণার জল থেকে মৃদু স্নিগ্ধ বাতাস বইতো, আমরা সবুজ ব্যাঙের খোঁজে ঘুরতাম। এখানে বসে আমরা বই পড়তাম। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা আলোচনা করতাম; সুনীল দিকচক্রবালে প্রতীক্ষমাণ রঙিন ভবিষ্যৎ আমাদের হাতছানি দিতো।

"সব তছনছ হয়ে গেলো—সব বদলে গেলো, তাই না আর্নস্ট?" বলে রাহে হাসে। এই তিক্ত বিষণ্ন হাসি আজ আমাদের সবার মুখে। "সীমান্তে আমরা মাছও ধরতাম। তবে অন্য পন্থায়। পানিতে একটা বোমা নিক্ষেপ করলে মাছগুলো উপরে ভেসে উঠতো। সেই পন্থাটা যে বেশি কার্যকর ছিলো তা অনস্বীকার্য।"

"জর্জ, তুমি কি অবস্থাটা ভেবে দেখছ যে আমরা এমনি করে বসে বসে দিন কাটাচ্ছি। এটা কেমন কথা?" আমি তাকে প্রশ্ন করি। "তুমি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছ যে আমরা কি যেন হারিয়েছি, আর্নস্ট।"

আমি মাথা নেড়ে তার কথা সমর্থন করি। সে বুকে হাত বুলিয়ে বলে, "আমার মনে হয়, আমি তোমাকে বলতে পারব—আমি নিজেও এ সম্বন্ধে ভাবছি।" সে সামনের তৃণভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে,

"আমাদের হারানো ধন ঐখানে আছে। ওটাই ছিলো আমাদের জীবন। এখানে ফুলের কলি হয়েছে। সে কলি বড় হয়েছে। আমরাও এর সাথে সাথে বেড়ে উঠেছি আর আমাদের পিছনে----" সেই পিছনে দূরের পানে মাথা দুলিয়ে বলে, "আমাদের মৃত্যু হয়েছে। সেইটাই আমাদের হত্যা করেছে, বিনাশ করেছে ; অন্য সবকিছুর সঙ্গে আমাদের ধ্বংস করেছে।" সে আবার হেসে বলে, "আমাদের সামান্য মেরামতের প্রয়োজন।"

"হয়ত গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে অবস্থার উন্নতি হবে," আমি মন্তব্য করি। "তখন জীবন সহজ হয়ে যায়।"

"না, অসুবিধেটা সেখানে নয়।" সে সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলি দিতে দিতে বলে, "আমার মনে হয়, ব্যাপারটা অন্য রকম।"

"তা হলে, অসুবিধাটা কোথায় ?" আমি প্রশ্ন করি।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে সে দাঁড়িয়ে বলে "চল এবার বাড়ি যাই, আর্নস্ট। আমি কি সিদ্ধান্ত করেছি তা তুমি জানতে চাও ? আমি ভাবছি, আমি আবার সেনাবাহিনীতে চলে যাব।"

"পাগল হয়েছ নাকি, জর্জ ?" বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে বলি। "মোটেই নয়।" সে জওয়াব দেয়। "আমার সিদ্ধান্তটাই বরং যুক্তিসংগত।"

আমি দাঁড়িয়ে পড়ি, "এ কি বলছ জর্জ ?-------"

সে চলতে থাকে, "তোমার চেয়ে আমি এখানে দু-হপ্তা বেশি আছি." বলে সে অন্য কথা বলতে শুরু করে।

প্রথম বাড়িটা চোখে পড়তেই আমি বৈয়মটার পানি ঝর্ণাতে ঢেলে দেই। সঙ্গে সঙ্গে মাছ দুটো লেজ মেরে পালিয়ে যায়। হ্যাঁ, জর্জের সিদ্ধান্তটাই অধিকতর বাস্তব, তা অস্বীকার করা যায় না। বৈয়মটা ঝর্ণার কিনারে ছেড়ে আসি।

আমি জর্জের কাছে বিদায় নেই। সে ধীর পদক্ষেপে চলে যায়। আমি আমাদের বাড়ির সামনে পৌঁছে তার পানে ফিরে তাকাই। তার কথাগুলো আমাকে পীড়া দিচ্ছিলো। কি একটা অদ্ভুত সংকট যেন আমাকে পেয়ে বসে। আমি ওটাকে জাপটে ধরতে গেলে ওটা পালিয়ে যায়। আমি এগিয়ে গেলে ওটা পিছনে সরে যায়। আমি সামনে চললে ওটা আমাকে লক্ষ্য করে অনুসরণ করে।

আকাশটা অরণ্য ভূমির উপর ভেসে থাকে। বৃক্ষরাজি রিক্তপত্র। একটা নড়বড়ে খিড়কি বাতাসে আছাড় খাচ্ছে। অবিন্যস্ত বাগানের উপর নভেম্বরের সিক্ত নিরাপদ প্রদোষ চেপে বসে আছে।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বাগানটার পানে তাকাই। মনে হয়, জীবনে এই বুঝি প্রথম বারের মতন বাগানটা দেখলাম। এমনি অপরিচিত যে চিনতেই যেন পারছি না। এই নোংরা স্যাঁতস্যাঁতে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিটাই কি সত্যি আমার শৈশবের ক্রীড়াভূমি ছিলো? এটাই আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অদূরে অবস্থিত কারখানাসহ এই জায়গাটাকেই কি আমরা স্বদেশ মনে করতাম? এটাকেই কি আমরা জীবনের ধ্বংসলীলা থেকে এক মাত্র আত্মরক্ষার আশ্রয় বলে মনে করতাম? এই ধূলো-ধূসর পথ-প্রান্তর আর লোকালয় এবং সুদূরের কোন সুন্দর মনোরম দৃশ্য কি মৃত্যু লীলার ফাঁকে ফাঁকে শেল বিধ্বস্ত সীমান্তে আমাদের স্বপ্ন-কল্পনায় ভেসে উঠতো না? আমার স্মৃতিতে এই স্থানটা কি আরও উজ্জ্বল আরও মনোরম আরও প্রসারিত হয়ে দেখা দিতো না? তা হলে, আমার স্মৃতির জগৎ কি মিথ্যে হয়ে গেছে। আমার রক্ত কি মিথ্যে কথা বলছে? আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে?

আমার দেহে কম্পন জাগে। এই স্থানটার কোন পরিবর্তন হয়নি, তবু স্থানটা অন্য রকম হয়ে গেছে। নিওবয়ার কারখানার ঘড়িটা এখনো আগের মতন চলছে। তেমনি ঘন্টা বাজছে, ছোট বেলায় ঘড়িটার কাঁটা ঘোরা দেখার সময় যেমন বাজতো। রাহে যে দোকান থেকে আমাদের জন্য প্রথম সিগারেট কিনে এনেছিলো, সেই দোকানের কালো ছেলেটা তেমনি দোকানে বসে আছে। সামনে মুদির দোকানে সাবানের বিজ্ঞাপনের ছবিটা তেমনি রয়েছে। অটো ভগট আর আমি একবার রোদের সময় আতশী কাঁচের প্রতিফলনের সাহায্যে এই ছবিটার চোখ দুটো পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। সে দাগ এখনও আছে। কিন্তু সেই অতীত আর আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ব্যবধান বিরাজ করছে। অটো ভগট অনেক দিন আগে যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

সেনা নিবাসে আর যুদ্ধ সীমান্তে বসে এই স্থানটা সম্বন্ধে আমার মনে যে অনুভূতি জাগতো, আজ এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কেন আমার মনে সেই অনুভূতি জাগে না তা আমি বুঝতে পারি না। এই স্থানটার ঐশ্বর্য, জাঁকজমক, উজ্জ্বল মনোহারিত্ব আর অবর্ণনীয় বৈশিষ্ট্য কোথায় গেলো?

এ স্থান সম্বন্ধে আমার কল্পনা কি অতিরঞ্জিত? অথবা স্থানটা কি তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে এখন আমার যা মনে হচ্ছে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে? যেখানে উল্লাসে আনন্দে পতাকা পতপত করে উড়তো সেখানে আজ পতাকা-ধারী খুঁটিগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এই স্থান থেকে সব দীপ্তি আর সমারোহ বিচ্ছিন্ন হয়ে কি তা উপেক্ষিত মেঘরূপে শূন্যে ঠাঁই নিয়েছে? আমাদের সীমান্তের অবস্থান কাল কি অতীতের সাথে আমাদের সেতু বন্ধন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে?

জিজ্ঞাসা আর জিজ্ঞাসা-----এই জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নেই।

(৪)

যুদ্ধফেরত সৈন্যদের অধ্যয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্বলিত নির্দেশনামা এসেছে। আমাদের দাবি আদায়ে আমাদের প্রতিনিধিরা সফলকাম হয়েছে। আমাদের দাবি ছিলো সংক্ষিপ্ত পৃথক পাঠ্যসূচী। পরীক্ষার ব্যাপারে সহজ নীতি নির্দেশ আমরা চেয়েছিলাম।

বিপ্লবের মাধ্যমেও এ কাজ সমাধা করা সহজ নয়। এ ধরনের আন্দোলন ত বাহ্যিক ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র, অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ নয়। অর্ধ ডজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বদল করে কি লাভ হয়। যে কোন সৈনিক জানে যে একজন কোম্পানী কমাণ্ডারের সদিচ্ছা থাকতে পারে, কিন্তু তার অধীন সৈনিকরা যদি তার বিরুদ্ধে থাকে, তবে সেই কোম্পানী কমাণ্ডার অসহায়। এমনি করে মহা প্রগতিশীল মন্ত্রী অকৃতকার্য হতে বাধ্য যদি জনকয়েক প্রতিক্রিয়াশীল আমলা তার সঙ্গে সহযোগিতা না করে। আর এখন জার্মানীতে এমন আমলার অভাব নেই। এ সব কলম-পেশা নেপোলিয়ানরা দুর্জয়।

আমাদের পড়ার প্রথম ঘন্টা পড়েছে। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ডেস্কে বসেছি। প্রায় সবাই সামরিক উর্দি পরা। তিন জন শ্মশ্রুমণ্ডিত আর একজন বিবাহিত।

আমি আবিষ্কার করি যে আমার ডেস্কে আমার নাম পরিষ্কার করে খোদাই করা আর খোদাই অক্ষরে কালি লাগানো রয়েছে। মনে পড়ে এক দিন ইতিহাসের ক্লাসে বসে আমি এই কাজটা করেছিলাম। মনে হয় এটা এক শতাব্দী আগের কথা। আজ আবার এমনি করে এখানে

বসে থাকাটা কেমন অদ্ভুত মনে হয়। এখানে এমনি করে বসে থাকাটা যুদ্ধটাকে অতীতের গহ্বরে ঠেলে দেয়। কালের চক্র পুরোপুরি ঘুরে গেছে, কিন্তু আমরাই চক্রের বাইরে পড়ে আছি।

আমাদের সাহিত্যের শিক্ষক হোলারম্যান এসে তার প্রথম কর্তব্য পালনে মনোযোগী হন। যুদ্ধের আগে থেকে আমাদের যেসব জিনিসপত্র স্কুলে গচ্ছিত আছে তিনি সেগুলো আমাদের ফিরিয়ে দেবেন। জিনিসগুলো তার মাথার বোঝা হয়ে আছে। ক্লাসের আলমারীটা খুলে তিনি একে একে জিনিসগুলো বের করেন—আমাদের খাতা, ছবি আঁকার সরঞ্জাম। সবচেয়ে জরুরী আমাদের নীল মলাটের খাতাগুলো, আমাদের রচনা, শ্রুতলিপি আর শ্রেণীকক্ষের অনুশীলনী কাজ। তাঁর বাঁ দিকে খাতাগুলো স্তূপাকার ধারণ করে। তিনি একে একে আমাদের নাম ডাকেন। আমরা উঠে গিয়ে প্রত্যেকে নিজেদের জিনিসগুলো নিয়ে আসি। উইলি তার জিনিসগুলো শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। ব্লটিং পেপারটা উড়ে যায়।

"ব্রেযার- - - -" "এই যে- - - - - - -"

"বুয়েকার- - - - - -" "এই যে- - - - - -"

ডেটলেফস- - - - - - - -

সাড়া নেই। "মরে গেছে" উইলি চেঁচিয়ে বলে।

ডেটলেফস- - -ছোটখাট ফর্সা বাঁকা পাওয়ালা ছেলেটা একবাব পরীক্ষায় ফেল করে পিছিয়ে পড়েছিলো। ল্যান্স কর্পোবেল; ১৯১৭ সালে মাউন্ট কেসেলে নিহত হয়। তার খাতাটা মাস্টার তার ডেস্কের ডান দিকে রেখে দেয়।

"ডার্কাব- - - - - -" "এই যে- - - -"

"ডায়ার্কসম্যান- - - - -" "মৃত"।

ডায়ার্কসম্যান একজন কিষাণের ছেলে; একজন ভালো খেলোয়াড় কিন্তু রদ্দি গায়ক। ইয়েপরেকে নিহত হয়। তার খাতাটা ডান দিকে রাখা হয়।

"এগার্স"- - - - - -"

"এখনো ফিরেনি" উইলি জওয়াব দেয়। লুদভিগ সংযোজন করে "ফুসফুসের জখম, ডর্টমুণ্ডে রিজার্ভ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে ; সেখান থেকে তিন মাসের জন্য লিপসপ্রিঙ্গ সেনিটোরিয়ামে যাবে।"

"ফ্রেডারিক-------" "এই যে-------"

"গিয়েসেকে------" "নিখোঁজ-------"

"না, নিখোঁজ নয়।" ওয়েস্টার হোলট ঘোষণা করে।

"তাকে যে নিখোঁজ বলে রিপোর্ট করা হয়েছিলো," রেইনার্সম্যান বলে। "আমি জানি", ওয়েস্টার হোলট বলে, "তিন সপ্তাহ থেকে সে এখানকার পাগলা গারদে আছে। আমি নিজে তাকে দেখেছি।"

গেহরিং (১)—"মৃত।"

গেহরিং (১)—ক্লাসের সেরা ছাত্র। কবিতা লিখতো, পড়াতো, নিজের উপার্জিত পয়সার বই কিনতো। তার ভাইয়ের সঙ্গে সয়সনসে নিহত হয়।

"গেহরিং (২)" শিক্ষক আপন মনে বিড়বিড় করে তার জিনিসগুলো ডান পাশে রেখে দেয়। গেরিং (১) এর খাতাব পাতাগুলো আবার উল্টোতে উল্টোতে আপন মনে বলে, "সত্যি চমৎকার প্রবন্ধ লিখতো।"

আরও অনেকগুলো খাতা ডান পাশে জমা হয়। সবার নাম ডাকা হয়ে গেলে আরও অনেকগুলো বেওয়াবিশ খাতা স্তূপে জমা হয়। এই খাতাগুলো সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় প্রফেসর হোলম্যান চিন্তা করেন। অবশেষে তিনি এ সমস্যার একটা সমাধান বের করেন। এই বেওয়ারিশ খাতাগুলো মৃত ছাত্রদের মা-বাপের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হোক।

কিন্তু উইলি তাতে সম্মত নয়। "আপনি কি মনে করছেন, এই ভুলে ভরা খাতাগুলো দেখে তাদের মা-বাপ খুশী হবেন? আর যখন তারা তাতে 'অসন্তোষজ-ক' 'অযোগ্য', 'কাঁচা'—আপনাব এসব মন্তব্য দেখবেন? এগুলো বরং এখানেই পড়ে থাকুক।"

হোলারম্যান উইলির পানে চোখ গোল করে চায়। "তা সত্যি, কিন্তু এগুলো দিয়ে আমি কি করব?"

"এগুলো যেখানে আছে সেখানেই থাক," আলবার্ট বলে।

হোলারম্যান মর্মাহত হয়, "তা ত হয় না, ট্রসকি। এই খাতাগুলো ত স্কুলের সম্পত্তি নয়। তাই এগুলো এভাবে রাখা যায় না।"

"হায় প্রভু। এ নিয়ে আপনি কি তামাশাই করছেন।" উইলি তার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে রীতিমতন গর্জন করে ওঠে। "এগুলো বরং আমার হাতে দিয়ে দিন। আমি একটি বিহিতব্যবস্থা করব।" হোলারম্যান অনিচ্ছা সত্ত্বে খাতাগুলো তার হাতে দিয়ে দেয়। "কিন্তু" তিনি কি যেন বলতে চান, কারণ জিনিসগুলো অন্যের।

"হঁ্যা, সব ঠিক আছে—সব ঠিক আছে", বলে উইলি আমাদের দিকে চেয়ে চোখ টিপে।

ক্লাসের পড়া শেষ হলে আমরা আমাদের খাতাগুলোর পাতা উল্টিয়ে দেখি। আমরা যে বিষয়বস্তুর উপর সর্বশেষ রচনা লিখেছিলাম তা ছিলো: জার্মানী নিশ্চয়ই যুদ্ধে জিতবে কেন?

"যুদ্ধে জিতবে কেন?" তা ১৯১৬ সালের প্রথম দিকের ব্যাপার। রচনায় একটা ভূমিকা থাকতে হবে। ছয়টা যুক্তি থাকতে হবে আর উপসংহার থাকতে হবে। চতুর্থ যুক্তি ধর্মীয় কারণ। 'এই যুক্তির বিশ্লেষণে আমি খুব কৃতকার্য হইনি।'

মার্জিনে লাল কালিতে মন্তব্য "এলোমেলো আর অযৌক্তিক।" আমার সাত পৃষ্ঠাব্যাপী প্রচেষ্টার পুরস্কার—২। বর্তমানের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবেচনায় বেশ ভালো ফল বলতে হবে।

উইলি জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তার রচনা চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে চারদিকে তাকিয়ে হেসে বলে, "আমার মনে হয় উপস্থিত সুধীমণ্ডলী আমার সংগে একমত যে, এই নগণ্য বিষয়ের গুরুত্ব এখন বাতিল হয়ে গেছে। তাই না?"

"এক মত।" ওয়েস্টারহোলট বলে ওঠে।

হঁ্যা, সত্যি তা বাতিল হয়ে গেছে। আমরা এ সব ভুলে গেছি। সুতরাং এই বিষয়বস্তু বাতিল। বেথকি আর কসোল আমাদের যা শিখিয়েছে শুধু তাই আমরা ভুলি না।

বিকেল বেলায় আলবার্ট আর লুদভিগ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমাদের পুরানো সহপাঠী গিয়েস্কের দিনকাল কেমন কাটছে তা আমরা দেখতে যাই। পথে রাহের সাথে দেখা। সেও আমাদের সঙ্গ নেয়। কারণ, সেও গিয়েস্কের বন্ধু।

দিনটা নির্মেঘ নির্মল। পাহাড় চূড়া থেকে মাঠের এক প্রান্তে পাগলা গারদে ওয়ার্ডারদের তত্ত্বাবধানে নীল সাদা ডোরাকাটা পোশাকে পাগলদের কর্মরত দেখা যায়। ডান পাশের দালান থেকে গান শোনা যাচ্ছে। কোন পাগলা গান গাইছে। কেমন অদ্ভূত শোনায়।

জনকয়েক পাগলের সাথে একটা প্রকাণ্ড কক্ষে গিয়েস্কেকে রাখা হয়েছে। আমাদের দেখেই এক পাগল চেঁচিয়ে ওঠে। "আশ্রয় নাও। আশ্রয় নাও।" সঙ্গে সঙ্গে সে হামাগুড়ি দিয়ে একটা টেবিলের তলে আশ্রয় নেয়। অন্যরা তার দিকে লক্ষ্য করে না। গিয়েস্কে তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে আসে। তার মুখাবয়ব কুচকে পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তার সূচালো থুতনি আর বড় কান দেখে তাকে আগের চেয়ে অনেক অল্প বয়স্ক মনে হয়। তার চোখ দুটোই শুধু আগের মতন চঞ্চল।

তাকে শুভেচ্ছা জানাবার আগেই অন্য একজন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। "কোন নতুন খবর আছে?"

"নতুন খবর? না, নতুন কোন খবর নেই।" আমি জওয়াব দিই।

"সীমান্তের খবর কি? আমরা ভার্দুন দখল করেছি?" আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করি। "কিন্তু অনেক দিন আগেই ত সন্ধি হয়ে গেছে।" আলবার্ট জওয়াব দেয়।

লোকটা হাসে। অপ্রীতিকর, অর্থহীন অট্টহাসি।

"ছেলে মানুষী করো না। শত্রুপক্ষ তোমাদের বোকা বানাতে চাইছে। তারা ওত পেতে বসে আছে। বেরিয়ে পড়লেই তোমাদের সাবাড় করে ফেলবে। তোমরা নাস্তানাবুদ হবে। তারা আর আমাকে ধরতে ছুঁতে পারবে না।" সে চতুরের মতন সংযোজন করে।

গিয়েস্কে এগিয়ে এসে আমাদের সাথে করমর্দন করে। আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। আমরা ভাবছিলাম সে হয়ত আমাদের সামনে বাঁদরের মতন নাচানাচি শুরু করবে। তার বদলে সে একবার মাত্র ম্লান হাসি হেসে বলে, "এমনটি হবে সে আশা আমি করিনি।"

আমি তার এখানে অবস্থান সম্বন্ধে বলি, "তোমাকে ত সম্পূর্ণ সুস্থ দেখাচ্ছে। তোমার কি হয়েছে যে তুমি এখানে?"

চোখের ভুরু উপর হাত রেখে সে বলে, "মাথা ব্যথা। মাথার পিছনটায় যেন লোহার বেড়ি বাঁধা রয়েছে। আচ্ছা ফুরির খবর——"

ফুরির যুদ্ধে সে অন্য একজনের সংগে কয়েক ঘন্টা চাপা পড়েছিলো। তার মুখটা অন্য লোকটার কাঁধের সাথে আঁটকে ছিলো। অন্য লোকটার মুখটা মুক্ত ছিলো। কিন্তু পেট ফেটে ফাঁক হয়ে গেছলো। সেই লোকটার পাকস্থলীর নীচে গিয়েস্কের মুখটা পড়েছিলো। লোকটা চিৎকার করছিলো আর প্রতি চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ধারায় গিয়েস্কের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিলো, আর বার বার সে পাকস্থলীটা সরিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছিলো।

গিয়েস্কে এই কথাগুলো ধীরে সুস্থে পরিষ্কারভাবে আমাদের বলে।

"আর এখন প্রতি রাতে আমার এই অবস্থা হয়। আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। সারা ঘরে লিকলিকে সাদা সাপ কিলবিল করে আর রক্তে ভরে যায়।"

"তুমি যখন জান যে ব্যাপারটা অলীক কল্পনা মাত্র, তুমি এর প্রতিকার করতে পার না? এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পার না?" আলবার্ট তাকে শুধায়।

গিয়েস্কে নেতিবাচক মাথা নাড়ে। "তাতে কোন ফল হয় না, আমি জেগে থাকলেও না। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো এসে হাজির হয়।" সে শিউরে ওঠে। "তোমরা এসব দেখতে পাও না, কিন্তু আমি পাই। একবার ভয়ে আমি জানালা দিয়ে পালাতে গিয়ে পা ভেঙে ফেলি। তাই আমাকে এখানে আনা হয়েছে।"

"তোমরা কেমন আছ? তোমরা এখন কি করছ?" গিয়েস্কে জিজ্ঞেস করে। "তোমাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে?"

"শীগগিরই হবে" লুদভিগ জওয়াব দেয়।

"সেই পাট আমার চুকে গেছে।" গিয়েস্কে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, "আমার মত লোককে তারা ছেলেপিলেদের মাঝখানে ছেড়ে দিবে না।"

ভিতরে প্রবেশ করার সময় যে লোকটা 'আশ্রয় নাও' বলে চেঁচিয়ে ছিলো সেই লোকটা চুপে চুপে আলবার্টের পিছনে এসে গ্রীবার পিছনে খোঁচা মারে। আলবার্ট দাঁড়াতেই লোকটা গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

"তোমরা মেজরকে লিখতে পার না?" গিয়েস্কে প্রশ্ন করে।

"কোন মেজরকে?" আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করি। লুদভিগ আমাকে খোঁচা দেয়। আমি চট করে বলি "তাকে কি লিখব?"

"তাকে লিখে দাও, সে যেন আবার আমাকে ফ্লুরিতে যেতে দেয়।" গিয়েস্কে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, "তাতে আমার উপকার হবে, নিশ্চয়ই হবে। সেখানে যাবার পথে কোন গোলাগুলি হবে না। সেখানে যেতে পারলে শান্তি পেতাম। তোমরাও কি তাই মনে কর না?"

"সব ঠিক হয়ে যাবে।" লুদভিগ গিয়েস্কেকে বাহুতে মৃদু চাপ দিতে দিতে সান্ত্বনা দেয়। "তোমাকে ভালো করে আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে হবে।"

গিয়েস্কে ম্লান চোখে সামনের দিকে চায়। "কিন্তু তোমরা মেজরকে লিখবে ত? আমার নাম জেরার্ড গিয়েস্কে। শুদ্ধ করে নামটা লিখো। আর তোমরা আমার জন্য আপেলের চাটনি আনতে পার না? তা আবার খেতে আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে।"

আমরা তাকে সব আশ্বাস দিই। কিন্তু এ ব্যাপারে তার আর কোন উৎসাহ নেই। সে সহসা সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায়। আমরা বেরিয়ে আসার সময় সে লুদভিগকে সামরিক কায়দায় সালাম করে। তারপর শূন্য দৃষ্টি মেলে সে আবার টেবিলে বসে পড়ে।

দরজায় দাঁড়িয়ে আমি তার পানে আবার ফিরে তাকাই। সে সহসা সুপ্তোত্থিতের মতন এক লাফে উঠে আমাদের পিছনে ছুটে আসে। সে অদ্ভুত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ঐ ত ওরা আবার আসছে।" সে ভয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরে। তাকে নিয়ে কি করব বুঝতে পারি না। এমন সময় ডাক্তার আসেন। আমাদের দেখে তিনি সাবধানে গিয়েস্কের কাঁধে হাত রাখেন। তিনি বলেন, "এসো, এখন বাগানে বেড়াতে যাই।" গিয়েস্কে বিনা দ্বিধায় ডাক্তারের সংগে যায়।

বাইরে মাঠের বুকে বিকেল বেলার সোনালী রোদ। গরাদ দেয়া জানালা থেকে গানের সুর ভেসে আসছে।

আমরা নীরবে পাশাপাশি চলি। চষা মাঠের বুকে ঐশ্বর্যের সমারোহ। গাছের ডালের ফাঁকে ক্ষীণ পাণ্ডুর চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।

"আমার বিশ্বাস এর ছোঁয়া আমাদের সবারই লেগেছে।" একটু পরে লুদভিগ বলে।

আমি তার পানে তাকাই। তার মুখটা অস্তায়মান সূর্যের সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত। সে করুণ গম্ভীর। আমি জওয়াব দিতে যাচ্ছি। সহসা আমার দেহ শিউরে ওঠে। জানি না কেন।

"এ নিয়ে আর কোন কথা না বলাই ভালো।" আলবার্ট বলে।

আমরা চলতে থাকি। পৃথিবীর বুকে গোধুলি নামে। নতুন চাঁদ উজ্জ্বলতর হয়। প্রান্তর থেকে সান্ধ্য হাওয়া বইতে থাকে। প্রতিটি বাড়ীর জানালায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে ওঠে। আমরা শহরে প্রবেশ করি।

জর্জ রাহে সারা পথ কোন কথা বলেনি। বিদায় গ্রহণ কালে তাব যেন ভাবনার ঘোর কেটে যায়। "সে কি চায় তোমরা বুঝতে পেরেছ? সে চায় ফ্রুরিত্তে ফিরে যেতে।" রাহে বলে।

আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আলবার্টেরও ইচ্ছে নেই। আমরা বাঁধের উপর পায়চারি করি। বাঁধের পাশ দিয়ে ধীর প্রবাহে নদী বইছে। কারখানার সামনে এসে আমরা সেতুর রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াই।

"একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে আমরা একাকীত্ব সহ্য করতে পারি না, আর্নস্ট।" আলবার্ট বলে।

"হ্যাঁ, তাই। এখানে কোথায় কার স্থান। কার কি ভবিষ্যৎ সে সম্বন্ধে কারো কোন ধারণা নেই।" আমি জওযাব দেই।

সে মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়, "হ্যাঁ, সত্যি তাই। কিন্তু এমন অনিশ্চয়তাও ভালো নয়।"

"আমার মনে হয়, কোন কাজ থাকলে—" আমি ভয়ে ভয়ে মন্তব্য করি।

কিন্তু সে আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে এক মত নয়। "তাতেও এমন কোন মঙ্গল হতো না। আমাদের এখন প্রয়োজন কোন জীবের সাহচর্য, একজন মানুষ—একজন মানুষ"। আমি প্রতিবাদের স্বরে বলি। "এ সংসারে মানুষই একমাত্র ভরসার অযোগ্য জীব। আমরা অনেক দেখেছি, কত সহজে মানুষ সব ভরসা নস্যাৎ করে দিতে পারে। দশ বারোজনের মধ্যে একজনও ভরসার যোগ্য পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।"

আলবার্ট গীর্জার ছায়া পরিলেখটা মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে।

"আমি সেভাবে কথাটা বলতে চাই না। আমি এমন একজন মানুষের কথা বলতে চাই যে সত্যিকারভাবে আমাকে আপন করে নিতে পারে। সময় সময় আমি মনে করি, ধর স্ত্রী— হায় প্রভু।" আমি সবিস্ময়ে বলে উঠি;—বেথকির কথা চিন্তা না করে পারি না।———

"সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করো না।" আলবার্ট সহসা রেগে যায়। "মানুষের এমন একটা কিছু অবলম্বন থাকা চাই যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ না? আমি এমন একজন মানুষ চাই, যে আমাকে ভালোবাসবে। সে আমাকে পরিপূর্ণ-ভাবে পাবে, আমিও তাকে পরিপূর্ণভাবে পাব। তা না হলে, মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে মরুক গে।"

"কিন্তু আলবার্ট, তুমি ত আমাদের পেয়েছ, তাই না?" আমি মোলায়েম কণ্ঠে বলি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ তবে এটা আলাদা ব্যাপার—" অল্পক্ষণ পরে সে যেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলে,, "সন্তান সন্ততি মানুষের প্রয়োজন, মানুষের কাম্য——"

তার কথার অর্থ ঠিক বুঝি না। তবে আর কোন প্রশ্নও তাকে করতে পারি না।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবন সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলাম। ভেবেছিলাম সর্বসম্মতিক্রমে আমরা নতুন করে সুখ-শান্তিপূর্ণ আনন্দময় জীবন আরম্ভ করব; আবার নতুন করে জীবনানন্দ ফিরে পাব। দিনের পর সপ্তাহ বিফলে কেটে যায়, বাজে কাজে সময় নষ্ট হয়। পিছন পানে ফিরে দেখি কিছুই করা হয়নি। আমরা দ্রুত চিন্তা আর কর্ম সাধনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এক মিনিট দেরী হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে, এই ছিলো যুদ্ধ সীমান্তে আমাদের মানসিকতা। এখানে আমাদের জীবন অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলছে। আমরা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি। জীবনকে ঝাঁকুনি দেই। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়ার আগেই দেখি সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। বহু দিন আমরা মৃত্যুর সঙ্গে সাহচর্য করেছি। মৃত্যু চটপটে খেলোয়াড়; তার সাথে খেলতে গেলে প্রতি মুহূর্তে অসীম বিপদ। আমরা তাই চঞ্চলচিত্ত অসহিষ্ণু হয়ে গেছি। তাই আমরা বর্তমান সম্বন্ধে সচেতন। বর্তমানকে আমরা তৎক্ষণাৎ আকড়ে ধরতে চাই। আমাদের এই মানসিকতায় বর্তমান জীবন শূন্য বলে মনে হয়; এখানে এই মানসিকতা অচল। এই শূন্যতা আমাদের অস্থির চঞ্চল করে তোলে। আমরা অনুভব করি যে অন্যরা আমাদের বুঝতে পারে না। শুধু ভালোবাসায় আমাদের চলে না, কারণ সৈনিক আর অসৈনিকদের মধ্যে একটা সেতুহীন দূরত্ব রয়েছে। তাই এবার আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের এই অস্থির চঞ্চল জীবনে কি একটা অদ্ভুত উৎপাত জোটে—একটা অদ্ভুত গর্জন, অস্পষ্ট কোলাহল, দূর থেকে ভেসে আসা কামান বন্দুকের অস্পষ্ট আওয়াজ, আর দূর দিগ্বলয় থেকে সাবধানী সংকেতের মতন একটা কিছু। এর অর্থ আমরা বুঝতে পারি না। এই ধ্বনি কোলাহল আমরা শুনতে চাই না। তাই আমরা কানে আঙুল দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরাই। আমাদের ভয় হয়, এইসব শুনতে গেলে হয়ত আমরা অন্য কিছু থেকে বঞ্চিত হব; অন্য কিছু মূল্যবান সম্পদ আমাদের

ফাঁকি দেবে। জীবনে বহু মূল্যবান সম্পদ থেকে আমরা ইতিমধ্যেই বঞ্চিত হয়েছি।

কার্ল ব্রোগারের ঘরখানা অগোছালো বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে আছে। বাইরের আলমারীটা শূন্য। টেবিল আর মেঝেতে বইগুলো স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

যুদ্ধের আগে কার্ল ছিলো বই পাগল। আমরা যেমন প্রজাপতি আর ডাকটিকেট সংগ্রহ করতাম কার্ল তেমনি বই সংগ্রহ করতো। এটা ছিলো তার বাতিক। আইখেনডরফের প্রতি ছিলো তার বিশেষ দুর্বলতা। তাঁর রচনাবলীর তিনটি পৃথক সংস্করণ তার কাছে ছিলো এবং অধিকাংশ কবিতা তার মুখস্থ ছিলো। তার ইচ্ছে লাইব্রেরীটা বিক্রি করে দিয়ে এই টাকা মদের ব্যবসায় খাটাবে; বিনিয়োগ করবে। তার ধারণা, এই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ। এত দিন সে লেদেরহোসের এজেণ্ট ছিলো, এখন সে নিজেই এই ব্যবসায় নামতে চায়।

আইখেনডরফের রচনাবলীর একটা খণ্ডের পাতা আমি উল্টোই। বইখানা নীল রঙের; কোমল চমৎকার চামড়ায় বাঁধানো। উইলির হাতে দ্বিতীয় খণ্ড। সে প্রশংসার চোখে বইটার দিকে চেয়ে বলে, "বইগুলো তুমি মুচিকে দিয়ে যাও।"

"কেন?" লুদভিগ স্মিত মুখে প্রশ্ন করে।

"চামড়ার জন্য," উইলি জওয়াব দেয়। "আজকাল মুচিরা এক ইঞ্চি সরেস চামড়া পাচ্ছে না। এখানে"—সে এবার গ্যাটের রচনাবলী তুলে নেয়— "বিশ খণ্ড। এতে অন্তত ছয় জোড়া উত্তম জুতো হবে। পুস্তক বিক্রেতার চেয়ে মুচির কাছে তুমি বেশী দাম পাবে। আমাকে বিশ্বাস কর, মুচিরা আসল চামড়ার জন্য একেবারে পাগল।"

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিতে চাও নিয়ে যাও। সস্তায় দেব।" কার্ল বলে। কিন্তু তারা কেউ বই চায় না।

"কার্ল, এ সম্বন্ধে আরো ভেবে দেখ, একবার বিক্রি করে দিলে আবার কেনা সহজ হবে না।" লুদভিগ দরদের সুরে বলে।

"তাতে হবেটা কি?" কার্ল হাসে। "প্রথম ত বেঁচে থাকা। পড়ার চেয়ে তা অনেক জরুরী। আর পরীক্ষা পাশ? চুলোয় যাক। সব

বাজে। আগামী কাল মদের নমুনা দিয়েই ব্যবসা শুরু করব। চোরা চালানের মদ বিক্রিতেও কোন দোষ নেই। বুঝলে? টাকা চাই। টাকা। টাকা হলে সব পাবে।"

বইগুলো সে রশি দিয়ে বড় বড় বাণ্ডিল আকারে বাঁধে। আমার মনে পড়ে, এমন দিন ছিলো যখন সে উপোস করতে হলেও এই বই বিক্রি করতো না। "এখন মুখ বান্নাচ্ছ কেন?" কার্ল তাচ্ছিলের সুরে বলে। "বাস্তববাদী হতে হবে; পুরানো সব চিন্তাধারা ত্যাগ করে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ কর।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, টাকা পেলে আমিও আমার বই বিক্রি করে দিতাম। অবশ্য বই থাকলে।" উইলি তাকে সমর্থন দেয়।

কার্ল তার কাঁধ চাপড়ে ধলে, "উইলি, পয়সা না থাকলে সংস্কৃতি ধুয়ে খাবে? সংস্কৃতির চেয়ে পয়সার মূল্য অনেক বেশী। যুদ্ধ সীমান্তে নোংরা পরিবেশে অনেক সময় নষ্ট করেছি। এখন জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই।"

"ও খাঁটি কথাই বলেছে, তা তোমরা জান।" আমিও এবার তাকে সমর্থন করি। "আমরা এখন কি করব বলত? স্কুলে সামান্য লেখাপড়া করে কি হবে? জাহান্নামে যাক——"

"তোমরাও বেরিয়ে আস। কলম খুঁচিয়ে কি পেতে চাও।" কার্ল উপদেশ দেয়।

"প্রভু জানেন। সব জগাখিচুড়ি।" উইলি জওয়াব দেয়। "তবে আমরা এখনো সবাই একত্র আছি, এই যা। কিন্তু আর মাত্র দু মাস ত পরীক্ষার বাকী। এই দু মাসের জন্য স্কুল ছেড়ে দিলে দুঃখ লাগবে। দু মাস পর ঘুরেফিরে দেখা যাবে।"

কার্ল একটা তাড়া থেকে কাগজ ছিঁড়ে নেয়। তারপর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, "তোমরা সরে পড়। সারা জীবনই তোমাদের জীবনে হয়ত দু মাস পড়ে থাকবে। যার জন্য পরে পস্তাবে। অবশেষে যখন তোমাদের ঘুম ভাঙবে, তখন দেখবে যে বুড়িয়ে গেছ——"

উইলি দাঁত কেলিয়ে হাসে। "হ্যাঁ, এক পেয়ালা চা খাবে হোমেয়ার?" লুদভিগ উঠে দাঁড়ায়।

"এ সম্বন্ধে তোমার বাবার মত কি?"

কার্ল হাসে। "এ সব ভীত বুড়োরা আর কি বলবে? তাদের কথার গুরুত্ব দেয়া যায় না। মা-বাবারা বুঝতে চায় না যে আমরা যুদ্ধ-ফেরত সৈনিক।"

"যুদ্ধে না গেলে তুমি কি হতে?" আমি প্রশ্ন করি। "সম্ভবত পুস্তক বিক্রেতা, বোকা বেচারা।" কার্ল জওয়াব দেয়।

কার্লের সিদ্ধান্ত উইলির মনে গভীর রেখাপাত করেছে। সে চায় যে আমরা লেখাপড়ার কাজ ছেড়ে দিয়ে আনন্দ খুঁজে বেড়াব।

মানুষের সহজতম লভ্য আনন্দ হলো খাওয়ার আনন্দ। তাই আমরা আহার্য সামগ্রী আহরণ অভিযানে বেরোব বলে স্থির করি। রেশন কার্ডে যা পাওয়া যায় তা প্রচুর নয়। রেশন কার্ডে মাথাপিছু হপ্তায় আধ পাউণ্ড গোশ্ত, পৌনে এক আউন্স খাঁটি মাখন, দেড় আউন্স কৃত্রিম মাখন, তিন আউন্স বার্লি এবং কিছু রুটি। তাতে কারোই পেট ভরে খাওয়া হয় না।

খাদ্য সংগ্রহকারীর দল সন্ধ্যায় আর রাতের বেলায় স্টেশনে এসে সমবেত হয়, যাতে সকালের গাড়ীতে গ্রামে সবার আগে গিয়ে পৌঁছতে পারে। তাই অন্যেরা যাতে আমাদের আগে গিয়ে পৌঁছতে না পারে সে জন্য আমাদেরও সকালের গাড়ী ধরতে হবে।

ধূলি-ধূসর দুঃখ-দারিদ্র্য জর্জরিত বদমেজাজী যাত্রীদের নিয়ে গাড়ী রওয়ানা হয়। আমরা গাড়ী থেকে নেমে এক দূর পাড়াগাঁয়ের দিকে চলে যাই। দুজন করে একদলে খাদ্য সংগ্রহে ঘুরে বেড়াব। টহল দেয়ার বিদ্যাটা আমাদের ভালো জানা আছে।

আলবার্ট আর আমি এক দলে। আমরা প্রকাণ্ড একটা খামার বাড়ীতে প্রবেশ করি। আঙ্গিনায় একটা ধূমায়িত গোবরের স্তূপ। চালার নীচে গরু বাছুরের দীর্ঘ সারি। গরু আর দুধের মিশ্রিত তীব্র গন্ধ নাকে লাগে। মোরগ-মুরগীর দল চিঁচিঁ করছে। দেখে লোভ হয়, কিন্তু আমরা সংযত থাকি, কারণ চারদিকে লোকজন রয়েছে। আমরা অভিবাদন জানাই। কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দেয় না। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। অবশেষে একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে আমাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে, "উঠান থেকে বেরিয়ে যাও, বলছি, নচ্ছার হতচ্ছাড়ার দল।"

আর এক জায়গায় যাই। খামারের মালিক নিজেই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে একটা লম্বা সামরিক গ্রেট কোট; হাতের চাবুকটা আস্তে নাড়ছে। "জানতে চাও ইতিমধ্যে কতজন এসেছে? এক ডজন।" লোকটা বলে। তার কথা শুনে আমরা হতবাক। আমরাই ত প্রথম গাড়িতে এসেছি। তারা হয়ত কাল সন্ধ্যায় এসে রাতটা কোন গোলাবাড়ী বা খোলা মাঠে কাটিয়েছে। "কোন কোন দিন একশো লোকও আসে। এই অবস্থায় আমরা কি করতে পারি, তোমরাই বল।" লোকটা শুধায়।

তার কথার যুক্তিটা আমরা মানি। সহসা তার চোখ আলবার্টের উর্দির উপর পড়ে। "ফ্ল্যানডার্স?" সে জিজ্ঞেস করে। "ফ্যাণ্ডার্স।" আলবার্ট প্রত্যুত্তরে বলে। ."আমিও" বলে সে ভিতরে যায়। সে আমাদের প্রত্যেকের জন্য দুটো ডিম নিয়ে আসে। আমবা আনাদেব পকেট বই হাতড়াতে থাকি। "ওটা রেখে দাও, দাম দিতে হবে না। তাই না।" লোকটা বলে।

"ধন্যবা" দিতে হবে না----, তবে এই কথাটা রটিয়ে দিয়োনা। শুনলে, কাল অর্ধেক জার্মানী এখানে এসে হাজিব হবে।"

আমরা পরবর্তী বাড়ীতে যাই। বেড়াব গায়ে গোবর দিয়ে লেখা বিজ্ঞাপনে রয়েছে— "খাদ্য সংগ্রাহকাবীদের প্রবেশ নিষেধ। কুকুব সম্বন্ধে সাধধান।"

বাস্তব সমাধান বটে।

আমরা 'এগোতে থাকি। এক বিস্তীর্ণ মাঠে একটা মস্ত গোলাবাড়ী। আমরা রান্নঘরে ঢুকে পড়ি। মাঝখানে একটা অত্যাধুনিক উনুন। তাতে একটা হোটেলের রান্না অতি সহজে হতে পারে। ডান দিকে একটা পিয়ানো আর বাঁ দিকে আর একটা। একটা বইয়ের আলমারীতে সোনালী বাঁধাই বই। সামনে একটা পুরানো টেবিল আর একটা তেপায়া বসার টুল। ব্যাপারটা হাস্যোদ্দীপক। বিশেষ করে পিয়ানো দুটো।

মালিকের স্ত্রী এসে হাজির হয়। "তোমাদের কাছে সুতো আছে? আসল সুতো চাই কিন্তু।"

আমরা পরস্পরের পানে তাকাই। "সুতো? না।"

"তা হলে রেশম? রেশমের মোজা?"

আমি স্ত্রীলোকটার মাংসবহুল গায়ের পানে তাকাই। ধীরে ধীরে পা দুটো আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। সে কিছু বিক্রি করতে চায় না। বিনিময় করতে চায়।

"না, আমাদের কাছে রেশম নেই, তবে আমরা যে-কোন জিনিস দাম দিয়ে কিনে নেব।" আমি তাকে বলি।

আমাদের প্রস্তাবটা সে উড়িয়ে দেয়। "টাকা পয়সা। ফুঃ! টাকা-পয়সা আজকাল মেঝে মোছার কাজেও ব্যবহৃত হয় না। এর দাম দিন দিন কমছে।" সে চলে যায়। তার লাল রেশমী ব্লাউজের পিছনের দুটো বোতাম নেই।

"এক গ্লাস পানি পেতে পারি কি?" আলবার্ট পিছন থেকে ডেকে বলে। সে অশিষ্টের মতন ফিরে এসে এক গ্লাস পানি ঢেলে দেয়।

"এবার বেরিয়ে যাও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নষ্ট করার মতন সময় আমার নেই। অন্যের সময় এমনিভাবে নষ্ট না করে খেটে খেতে পার না?"

আলবার্ট তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে চুরমার করে দেয়। ক্রোধে নির্বাক। আমিই তখন তার হয়ে কথা বলি। "তোর ক্যান্সার হোক বুড়ী মাগী।" এবার স্ত্রীলোকটা আমাদের প্রতি হাতুড়ি সাঁড়াশী ইত্যাদি ছুঁড়তে থাকে। আমরা ছুটে পালাই। কোন শক্তিশালী পুরুষও এই আক্রমণের মুখে টিকতে পারে না।

আমরা চলতে থাকি। পথ চলতে দলে দলে খাদ্য সংগ্রাহকদের সাথে আমাদের দেখা হয়। ক্ষুধার্ত বোল্‌তার ঝাঁক যেমন করে চাটনির উপর পড়ে তেমনি করে খাদ্য সংগ্রাহকেরা গোলাবাড়ী ঘিরে রাখে। আমরা বুঝি, কেন কিষাণেরা খাদ্য সংগ্রাহকদের দেখলে পাগলের মতন গালাগালি করে। তবু আমরা আমাদের কাজে লেগে থাকি। কোথাও গালাগালি আর তাড়া খাই আর কোথাও বা কিছু পেয়ে যাই। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী খাদ্য সংগ্রাহকরা আমাদের গালাগালি করে আর আমরাও তাদের ছেড়ে দেই না।

বিকেল বেলায় আমরা সরাইখানায় সমবেত হই। আমাদের সংগ্রহ পরিমাণে খুব বেশী নয়। কয় পাউণ্ড গোল আলু, কিছু খাবার। কয়েকটা ডিম, আপেল, দুটো বাঁধা কপি আর সামান্য গোশত। উইলির দেহ বেয়ে

ঘাম ঝরছে। সে শূয়রের অর্ধেকটা মাথা বগলদাবা করে সকলের শেষে এসে উপস্থিত হয়েছে। পোটলা পুটলিতে তার পকেট ফেঁপে আছে। এ সবের বদলে দেখছি, তার গায়ের গ্রেট কোটটা নেই। ওটার বিনিময়ে এ সব পণ্যদ্রব্য এনেছে। তার অবশ্য আর একটা গ্রেট কোট আছে—কার্লের দেয়া কোটটা। সে আশাবাদী যে সুদিন আসবেই।

গাড়ী ছাড়ার আরো দু ঘন্টা বাকী। তাতে আমার কপাল খুলে যায়। পানশালার ভিতরে একটা পিয়ানো পড়ে আছে। আমি তাতে একটা গান বাজাই। পানশালাব মালিকের স্ত্রী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে; তারপর আমাকে হাতছানি দিয়ে বাইরে ডাকে। আমি বারান্দায় গেলে সে জানায় সে সঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগিণী। তার দুঃখ যে সঙ্গীতজ্ঞ কেউ তার ওখানে আসে না। সে জিজ্ঞেস করে আমি আর একদিন তার ওখানে যাব কিনা। এই বলে সে চুপে চুপে আমার হাতে আধ পাউণ্ড মাখন গুঁজে দেয়। সে লোভানী দেয় যে আরো মাখন আছে। আর একদিন ওখানে গেলে সে আমাকে আরো মাখন দেবে। আমি তার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে পিয়ানো বাজাতে থাকি।

আমরা এবার স্টেশন অভিমুখে রওয়ানা হই। পথে বহু খাদ্য সংগ্রাহকের সঙ্গে দেখা হয়। সবাই এই গাড়ীতে করে ঘরে ফিরে, কিন্তু পুলিশের ভয়ে সবাই ভীত। তারা সবাই স্টেশনের অদূরে একটা নির্জন কোণে আত্মগোপন করে, যাতে গাড়ী ছাড়ার আগে পুলিশের নজরে না পড়ে। একবার গাড়ীতে চড়ে বসতে পারলে ধরা পড়ার ভয় কম।

"দাঁড়াও। যে-যেখানে আছ দাঁড়াও।"

প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সবাই হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

কিন্তু কপাল আমাদের মন্দ দুইজন সাইকেল আরোহী পুলিশ আমাদের সামনে এসে হাজির। তারা চুপে চুপে সাইকেলে আমাদের অনুসরণ করেছে।

"থাম। যে-যেখানে আছ থাম।"

প্রবল-চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সবাই হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, "আমাদের ছেড়ে দাও। আমাদের এ গাড়ী ধরতে হবে।" "গাড়ী এসে পেঁছতে এখনো পনর মিনিট বাকী," মোটা পুলিশটা গম্ভীর কণ্ঠে বলে। "সবাই ওদিকে যাও।" সে একটা আলোর দিকে ইঙ্গিত করে,

যাতে আমাদের স্পষ্ট দেখতে পায়। তাদের একজন আমাদের পাহারা দেয়, যাতে কেউ পালাতে না পারে, আর একজন জিনিস পত্র তল্লাশী করে। প্রায় সবাই স্ত্রীলোক, ছেলেপেলে আর বুড়ো, গেঁয়ো লোক। সবাই আত্মসমর্পণ করে। এই পরিস্থিতে তারা সবাই অভ্যস্ত। তারা আশা করতে পারে না যে আধ পাউণ্ড মাখনের একটা টুকরো নিয়েও ঘরে ফিরতে পারবে।

পুলিশ দুটোর দিকে আমি একবার ভালো করে তাকাই। হ্যাঁ, সেই একই জীব। সবুজ উর্দি, লাল মুখ, তলোয়ার আর রিভলভার পরে নিজদের অন্যের চেয়ে বড় মনে করে। সীমান্তের পুলিশের মতন দৈহিক বল। মনে মনে বলি দৈহিক বলই আসল। নির্মম।

একজন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে কয়েকটা ডিম কেড়ে নেয়া হয়েছে। সে সবে চলে যেতে উদ্যত হয়েছে, এমনি সময় মোটা পুলিশটা তাকে ডাকে। "এই যে, তোমার ওখানে কি আছে?" সে তার স্কার্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। "বের কর দেখি।" স্ত্রীলোকটা কিছুতেই তার কথা শুনবে না। সে মাটিতে বসে পড়ে। "শীগগির বের কর বলছি।" পুলিশটা গর্জন করে। মেয়েটা স্কার্টের ভিতর থেকে এক টুকরো গোশত বের করে দেয়। পুলিশটা টুকরোটা অন্যান্য কেড়ে নেয়া মালের সঙ্গে রেখে দেয়। "ভাবছিলে এ নিয়ে পালাবে। তাই না?" পুলিশটা বিদ্রূপ করে। কি যে হয়ে গেলো স্ত্রীলোকটা তা বিশ্বাস করতে পারে না। সে গোশতটুকু ফিরে পাবার জন্য হাত বাড়ায়। "আমি যে পয়সা দিয়ে এটা কিনেছি, আমার সব পয়সা খরচ করে কিনেছি।"

পুলিশটা তার হাত দুটো ঠেলে দিয়ে অন্য একজন স্ত্রীলোকের ব্লাউজের ভিতর থেকে জোর করে এক টুকরো কাবাব বের করে।—"এমনিভাবে খাদ্য সংগ্রহ যে বে-আ'নী তা জান না?"

প্রথম স্ত্রীলোকটা ডিমের দাবি ছেড়ে দিতে রাজী। কিন্তু গোশতের টুকরোটার জন্য কাকুতি মিনতি করে। "অন্তত গোশতটুকু আমাকে ফিরিয়ে দাও, বাবা। বাড়ী গিয়ে আমি কি বলব? এ যে আমার বাচ্চা কাচ্চার জন্য।" সে কাদায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

"খাদ্য দফতরে গিয়ে অতিরিক্ত রেশন কার্ডের চেষ্টা কর।" পুলিশটা চেঁচায়। স্ত্রীলোকটা টলতে টলতে দূরে সরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বসি

করে আর চীৎকার করে বলে, "এরই জন্য কি আমার স্বামী যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে? আমার বাচ্চাকাচ্চা না খেয়ে মরবে বলে?"

এবার এক তরুণীর পালা। সে দাঁত মুখ খিঁচে পেটুকের মতন তার সংগৃহীত মাখনের টুকরোটা গিলে খেলে চোখ মুখ তার তেলতেলে হয়ে যায়। তার ইচ্ছে পুলিশে কেড়ে নেয়ার আগে সে যতটুকু পারে মাখন গিলে ফেলবে। কিন্তু তাতে আরাম নেই। তার অসুখ করবে, হয়ত উদরাময় হবে।

"তারপর?" কেউ এগোয় না। পুলিশটা আবার হাঁকে "পরবর্তী জন এগিয়ে এসো।" সে ক্রোধে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই উইলির চোখে চোখ পড়ে। দৃশ্যত শান্তভাবেই উইলির উদ্দেশে বলে "এ বার কি তোমার পালা?"

"আমি এমন কি অন্যায় করেছি?" উইলি রুক্ষ কণ্ঠে বলে।

"ঐ পুলিন্দায় কি আছে?"

"শূয়রের অর্ধেকটা মাথা।" উইলি স্পষ্ট জওয়াব দেয়।

"বেশ, ওটা দিয়ে দাও।"

উইলি অনড় দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিশটা দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে তার সহকর্মীর পানে তাকায়। সহকর্মী কাল বিলম্ব না করে তার পাশে অবস্থান গ্রহণ করে। এটা তাদের একটা সর্বনাশা ভুল পদক্ষেপ। তাদের দু জনের এ সব ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয় না। প্রতিশোধের মোকাবেলা করতেও তারা অনভিজ্ঞ। দ্বিতীয় পুলিশটার লক্ষ্য করা উচিত ছিলো যে আমরা পরস্পরের মধ্যে কথা বলাবলি না করে তাকালেও আমরা একই দলভুক্ত। তার উচিত ছিলো দূরে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে আমাদের উপর নজর রাখা, তাতেও অবশ্য আমাদের খুব একটা দুর্ভাবনা থাকতো না। আসলে একটা রিভলভার কি? তা না করে সে কিনা উইলির সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে তার একজন সহকর্মীর পাশে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

অবিলম্বে এর পরিণামটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভীরু ভেড়ার মত উইলি শূয়রের মাথাটা এগিয়ে দেয়। হতবাক পুলিশটা তা দু হাতে তুলে নিতে গিয়ে প্রায় নিরস্ত্র হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে উইলি ধীরে সুস্থে তার মুখে একটা ঘুষি মারতেই সে পপাত ধরণী তলে। দ্বিতীয় পুলিশটা

মনস্থির করার আগেই কস্তোল তার থুৎনির তলায় মাথা দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো আর ভ্যালোন্টিন সঙ্গে সঙ্গে তার টুটি এমনি সজোরে চেপে ধরে যে তার মুখ হাঁ হয়ে যায়। কস্তোল সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গহ্বরে খবরের কাগজ ঠেসে দেয়। দুজন পুলিশই এবার কাবু। আমরা তাদের নিজেদের ক্রসবেল্ট দিয়ে তাদের পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলি। তারা এবার পড়ে থেকে গোঁ গোঁ গর গর করে। কিন্তু কোন ফল হয় না। কাজটা বেশ চটপট হয়ে যায়। এবার সমস্যা, কোথায় এদের রাখা যায়।

আলবার্টের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে। সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে নির্জনে একটা ছোট ঘর তার চোখে পড়ে। স্টেশনের পায়খানা। আমরা দুজনকে উঠিয়ে সেই ঘরের ভিতর রেখে বাইরে থেকে খিল লাগিয়ে দেই। সেখান থেকে মুক্ত হতে তাদের অন্তত এক ঘন্টা লাগবে। কস্তোলের বুদ্ধি বিবেচনা আছে বলতে হবে। সে তাদের সাইকেল দুটো দুয়ারের সামনে একটার উপর আর একটা ঠেস দিয়ে রেখে আসে।

অন্যান্য খাদ্যসংগ্রহকারীরা ভয়ে ভয়ে আমাদের কাণ্ড কারখানা দেখেছে। “এবার তোমরা তোমাদের জিনিসগুলো নিয়ে নাও”—ফার্ডিন্যাণ্ড দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে। দূরে গাড়ীর বাঁশী বাজে। তাবা শঙ্কিত চোখে আমাদের পানে তাকায়। তবে দ্বিতীয় বার তাদের কিছু বলতে হয় না। এক বুড়িত রীতিমতন ঘাবড়ে গেছে।

সে বিলাপের সুরে বলে, “হায় প্রভু। তোমবা পুলিশকে মেরেছ। কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড...... কি ভয়ঙ্কর।”.

স্পষ্টতঃই তার ধারণা, এই অপরাধেব শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অন্যারাও এ নিয়ে উদ্বিগ্ন। উর্দি আর পুলিশের ভয় তাদের মজ্জাগত।

উইলি উচ্চ স্বরে বলে, “না, এ নিয়ে আর ভেবো না, গোটা সরকার এখানে উপস্থিত হলেও আমরা আমাদের কোন জিনিস নিতে দিতাম না। পুরানো সৈনিক আর তার সহকর্মীরা তাদের খাবার অন্যের হাতে তুলে দেবে? কি চমৎকার কথা।”

ভাগ্য ভালো যে, লোকালয় থেকে গ্রামের রেল স্টেশন সাধারণত বেশ দূরে থাকে। আমাদের কীর্তিকলাপ এখন পর্যন্ত বাইরের কেউ দেখতে পায়নি। স্টেশন মাস্টার হাই তুলে মাথা চুলকাতে চুলকাতে অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা এগিয়ে যাই; শূয়রের অর্ধেক মাথাটা

উইলির বগলদাবা। "আমি তোমাকে ছেড়ে দেব?" মাথাটাকে সাদরে করাঘাত করতে করতে উইলি বলে।

গাড়ী ছেড়ে দেয়। আমরা জানালা থেকে হাত নাড়ি। বিস্মিত স্টেশন মাস্টার ভাবে যে আমরা তাকেই বিদায় জানাচ্ছি। সেও হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানায়। কিন্তু আমাদের হাত নাড়া পায়খানাকে লক্ষ্য করে। উইলি অনেকক্ষণ স্টেশন মাস্টারের লাল টুপিটার দিকে চেয়ে থাকে।

সে তার অফিসে ঢুকে পড়েছে। উইলি বিজয় গর্বে বলে ওঠে, "পুলিশ বেটাদের আরো অনেকক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে।"

খাদ্য সংগ্রাহকদের চোখে মুখের উত্তেজনা হ্রাস পায়। তারা আবার সাহস করে কথা বলছে। সেই গোশতের টুকরোওয়ালী স্ত্রীলোকটা অশ্রু সজল চোখে হাসছে। কৃতজ্ঞতার অশ্রু। কেবল যে স্ত্রীলোকটা মাখন গিলে ফেলেছিলো সেই এখনো কাঁদছে। সান্ত্বনা শুনছে না। সে বড্ড তাড়াতাড়ি এ কাজটা করে ফেলেছিলো। এখন অস্বস্তি বোধ করছে। কসোল যে কি ধাতুর তৈরী, তাই সে এবার দেখায়। সে তার সংগৃহীত কাবাবের অর্ধেকটা স্ত্রীলোকটাকে দিয়ে দেয়। স্ত্রীলোকটা তা তার মোজায় জড়িয়ে নেয়।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমরা শহরের বাইরে অবস্থিত একটা স্টেশনে নেমে মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকি। আমাদের ইচ্ছে ছিলো সারাটা পথই হেঁটে যাব। পথে একটা মোটর লরী মিলে গেলো। লরীর ড্রাইভারের গায়ে সামরিক পোশাক। সে তার লরীতে চড়িয়ে আমাদের নিয়ে আসে। আমরা অন্ধকার পথ পেরিয়ে আসি। আকাশে তারা জ্বলছে, লরীতে আমরা পাশাপাশি বসে থাকি। আর আমাদের পুটলি থেকে ফুর ফুর করে গোশতের সুগন্ধ বেরিয়ে আসছে।

(২)

হাই স্ট্রীট সন্ধ্যার রূপালী কুয়াশায় আচ্ছন্ন; রাস্তার বাতিগুলোর পাণ্ডুর আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পথচারীরা সূতী পোশাক পরে পথ

চলছে। পথের দুপাশের দোকানের জানালাগুলো আলোকে আলোকিত। আমরা উল্‌ফ কুয়াশায় সাঁতার কেটে কেটে চলছে। পথ প্রান্তের সিক্ত বৃক্ষরাজি ম্লান আলোতে চিকমিক করছে।

আমার সংগে ভ্যালেন্টিন লাহের। তার অবশ্য বিশেষ কোন অভিযোগ নেই, তবে সার্কাসের খেলা দেখিয়ে সে যে এক কালে প্যাবিস আর বুদাপেস্টে চাঞ্চল্য জাগিয়েছিলো, তা সে ভুলতে পারছে না। "সব গেছে আর্নস্ট সব গেছে; এখন আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলো কড়া মাড় দেয়া শার্টের মতন. কড় কড় শব্দ করে; বাতেও ধরেছে। মহড়া দিয়ে দেখেছি। মনে হয় না, আর চেষ্টা করেও কোন লাভ হবে।"

"এবার তা হলে কি করবে ভ্যালেন্টিন?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করি। "অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর মতন সরকারের এখন তোমাকে পেনশন দেয়া উচিত।"

"ছেড়ে দাও সরকারের কথা।" সে তাচ্ছিল্যভরে জওযাব দেয়। "যে গলাবাজি করতে পারে সরকার শুধু তাদেরই কিছু দেয। বর্তমানে একজনকে নাচ শিখাই; সাধারণের চোখে এই কাজটা মন্দ নয। তবে রুচিবান একজন শিল্পীর পক্ষে এর চেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপাব আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু মানুষ করবে কি? খেয়ে বাঁচতে হবে ত।"

ভ্যালেনটিন মহড়া দিতে যাচ্ছে। আমিও তার সঙ্গে যাব ভাবছি। হ্যামকেন স্ট্রীটের কোণে টুপি মাথায় একজন লোক আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। হাতে তার বর্ষাতি আর ফলিয়ো ব্যাগ। "আর্থার।" আমি নাম ধরে ডাকি।

লেদারহোস থমকে দাঁড়ায়। "বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছ দেখছি।" ভ্যালেন্টিন সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলে। সে তার টাইটা সমঝদাবের মতন আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে। কৃত্রিম রেশমের মোলায়েম ফুল আঁকা টাই।

"দিন ভালোই কাটছে······মন্দ নয়।" আর্থার আনন্দে উপচে পড়ে। ভ্যালেন্টিন তার মাথার মোলায়েম পশমী টুপীটাও হাতড়ে দেখে।

আর্থারের খুব তাড়াহুড়ো। ফলিয়োটা দেখিয়ে বলে, "ব্যবসায় নেমেছি, ব্যবসায়।"

"এখনও কি সিগারেটের দোকানটা আছে?" আমি প্রশ্ন করি।

"নিশ্চয়ই তবে ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। আচ্ছা, ভাড়া নেবার মতন কোন অফিসঘর কি তোমাদের জানা আছে? যা ভাড়া চায় আমি দিতে প্রস্তুত।"

অফিস ঘর আপাততঃ আমাদের অবশ্য জানা নেই। "আচ্ছা, এখন তোমার বৌয়ের সঙ্গে ভাব কেমন?"

"কথাটার অর্থ বুঝতে পারছি না।"

"সীমান্তে বসে তুমি না বলতে যে তোমার বউ বড্ড রোগা অস্থিসারশূন্য। একটু মোটাসোটা না হলে তোমার নাকি চলছে না।"

"এমন কথা বলেছিলেম বলে ত আমার মনে পড়ছে না।" এই বলে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ভ্যালেন্টিন হাসে। "দেখছ আর্নস্ট, এরা কেমন বদলে যায়? সীমান্তে, সে ছিলো অকর্মণ্য গোবেচারা। আর এখন ভুড়িওয়ালা ব্যবসায়ী হয়ে গেছে। পুরানো কথা শুনতে তার আর ভালো লাগছে না। কবে হয়ত দেখবে কোন লীগ বা সুনীতি সঙ্ঘের সভাপতি হয়ে বসেছে।"

"দিনকাল তার খুবই ভালো যাচ্ছে বলে মনে হয়" আমি গম্ভীর কণ্ঠে বলি।

আমরা ধীর পদক্ষেপে চলতে থাকি। কুয়াশার মেঘ এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায়। আর উলফ তার মাঝখানে খেলা করে। কত মানুষ আসে আর যায়। হঠাৎ স্পষ্ট আলোতে আমার চোখে পড়ে চক চকে প্যাটেন্ট চামড়ার হ্যাটের তলে একখানা নমনীয় মুখ; কুয়াশার আর্দ্রতায় চোখ দুটো তার চক চক করে।

আমি ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ি। আমার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে। এই ত এডেলি; আমার পুরানো দিনের বান্ধবী। সঙ্গে সঙ্গে পুরানো দিনের স্মৃতি মনের মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়। তখন আমাদের প্রথম যৌবন। ষোল বছর বয়েস। আমরা সাদা সোয়েটার পরিহিতা তরুণীদের প্রতীক্ষায় জিমনে-সিয়ামের বাইরে লুকিয়ে থাকতাম। তাদের অনুসরণ করতাম আর তাদের নাগাল পেলে মৌন কণ্ঠে তাদের পানে চেয়ে থাকতাম। আমাদের বুক দুরু দুরু কাঁপতো। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়তো। তারা চলে গেলে আবার তাদের পিছু নিতাম। সায়াহ্নে তাদের কারো সাথে দেখা হলে ভীরু পদক্ষেপে তাদের অনুসরণ করতাম। লজ্জায় তাদের সাথে কথা বলতে

পারতাম না। নিজের বাড়ীতে ঢোকার মুখে সাহস সঞ্চয় করে পিছন থেকে "আবার দেখা হবে"—বলে পালিয়ে আসতাম।

আমি ভ্যালেন্টিনকে বললাম। "একজনের সঙ্গে দুটো কথা বলে এখুনি আসছি।" এই বলে আমি সেই লাল হ্যাট, কুয়াশাচ্ছন্ন বঙ্কিম ঔজ্জ্বল্য আর আমার সামরিক জীবনের পূর্বের উজ্জ্বল দিনগুলোর পিছনে ছুটে যাই।

"এডিলি—"

সে ফিরে তাকায়। "আর্নস্ট, তুমি ফিরে এসেছ?"

আমরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকি। আমাদের দুজনের মাঝখানে কুয়াশার আবরণ। উলফ লাফায় আর চেচায়; ট্রামের ঘন্টা বাজে; পৃথিবীর বুকে স্নিগ্ধ উষ্ণতা বিরাজমান। অতীত দিনের অনুভূতি ফিরে আসে। কালের দূরত্ব মুছে যায়। এই কুয়াশার উপর দিয়ে একটা রঙধনুর উজ্জ্বল সেতু অতীতের সাথে বর্তমানের সংযোগ স্থাপন করে।

আবোল তাবোল কি যে আমরা দুজন বলছি তা নিজেরাই জানি না। কি আসে যায় তাতে? অর্থহীন প্রলাপ কূজন। আমরা দুজন পাশাপাশি চলছি, তাই সত্যি। তাই মধুময়। অতীত দিনের অশ্রুত মধুর সঙ্গীত গীত হচ্ছে, দূরে অতীত স্বপ্ন আর কামনার নির্ঝরিণী বইছে। আরো সবুজ প্রান্তরের শ্যামলিমা ঝিকমিক করছে। দূরে আরো দূরে মৃদু হাওয়ায় ঝাউ গাছের পাতায় শন শন সুর বাজছে এবং উপর অরুণোদয়ের মতন যৌবনের দিক চক্রবাল রেখা দেখা যাচ্ছে।

আমরা কি অনেক দূর চলে এলাম? জানিনা। আমি একাকী ছুটে ফিরে আসি। এডেলি বিদায় নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু এখনো আমার মণিকোঠায় নানা রঙের রঙিন নিশানের আশা আনন্দ আর পরিতৃপ্তি উড়ছে। আমার জন্য নির্ধারিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, সে দিনের বসন্ত ঋতুর সমারোহ, সবুজ গৃহচুড়া আর মুক্ত বিশাল পৃথিবীর ছবি আমার মনে আসন পেতে আছে।

ছুটতে ছুটতে এসে উইলির গায়ে ধাক্কা খাই। আমরা দুজন এবার ভ্যালেন্টিনের সন্ধানে যাই। আমরা তার নাগাল পাই। মহানন্দে ছুটে গিয়ে সে কেন কার পিঠে সশব্দে চাটি মারে। "হ্যালো, কুখক কোথেকে উদয় হলে বেটা?" সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে যায়, "কি ভাগ্য। তাই না? তোমার সাথে এমনি করে দেখা হয়ে গেলো।"

অন্য লোকটা তার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকে। এই অন্তরঙ্গতা তার ভালো লাগে না।

"আঃ। আমার মনে হয় তুমি লাহের, তাই না?"

"নিশ্চয়ই। আমরা ত সোমে একসঙ্গে ছিলাম। তোমার মনে নেই? একবার, মনে নেই, যুদ্ধের গোলাগুলির মাঝখানে লিলি আমার জন্য খাবার পাঠিয়েছিলো আর আমরা সবাই তা সাবাড় করেছিলাম? জর্জ তা নিয়ে এসেছিলো। কাজটা ছিলো ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল, তাই না?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই মনে পড়ছে।" অন্য লোকটা বলে।

এই স্মৃতি মনে পড়তেই ভ্যালেনটিন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। "অবশ্য পরে সে আহত হয়, তখন তুমি চলে গিয়েছিলে। সে তার ডান হাতটা হারায়। তার মত গাড়ী চালকের পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যজনক; এখন হয়ত সে অন্য কিছু করছে। এত দিন কোথায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলে বলত?"

অন্য লোকটা জওয়াবটা এড়িয়ে গিয়ে মুরব্বীয়ানার স্বরে বলে, "তোমার সঙ্গে দেখা হলো ভালো কথা। এখন কি করে তোমার চলছে হে।" তার কথায় তাচ্ছিল্যের ভাব।

"কি বললে?"

"কেমন চলছে? আজ কাল কি করছ?"

ভ্যালেনটিন বিস্ময়মুক্ত হতে পারে না। তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব? কতক্ষণ সে লোকটার দামী পোশাক পরিচ্ছদের পানে চেয়ে থেকে নিজের ছেঁড়া নোংরা পোশাকের পানে চায়। তারপর ক্রোধদীপ্ত কণ্ঠে বলে, "ছোট লোক।"

ভ্যালেনটিনের জন্য আমার করুণা হয়। জীবনে এই প্রথম তার মনে ভেদাভেদ জ্ঞানের উদয় হলো। এতদিন তার মনে বিশ্বাস ছিলো যে, আমরা সৈনিকেরা সবাই সমান, সবাই এক; আমাদের ছোট বড় নেই। একটি মাত্র কথায় এই দাম্ভিক লোকটা তার বিশ্বাস নষ্ট করে দিলো।

"এ নিয়ে দুঃখ করো না ভ্যালেনটিন।" আমি তাকে সান্ত্বনা দেই। "এই সমস্ত সঙ্কীর্ণচেতারা বাপের টাকায় দেমাক দেখায়। তাদের মনোবৃত্তিই এই।"

উইলিও কতকগুলো জোরালো যুক্তি দিয়ে এই কথার সমর্থন করে। "যাক, অদ্ভুত বন্ধুত্ব বটে।" ভ্যালেনটিন বিরক্তির স্বরে বলে। কিন্তু লোকটার কথা তাকে পীড়া দেয়; তার বুকে খোঁচা দেয়।

ভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে জাদেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তার পরনে ঘরমোছা ন্যাকড়ার মতন পোশাক, ছেড়া ময়লা। উইলি বলে, "আচ্ছা, যুদ্ধ ত শেষ হয়ে গেলো। এখনো কি মাঝে মধ্যে এক-আধবার কাপড়-চোপড় ধুয়ে কেচে পরিষ্কার করতে পার না?"

"এখন নয়। আগামী শনিবারের মধ্যে হবে। সে দিন গোসল করব। উকুন ছাড়াব। আর কি চাও?" সে গম্ভীর কণ্ঠে বলে।

আমরা বিস্ময়ে আঁৎকে উঠি। জাদেন গোসল করবে। লোকটার হলো কি? উইলির ত একেবারে আক্কেল গুড়ুম। সে কানে আঙুল দিয়ে প্রশ্ন করে "কি বললে বুঝতে পারলাম না। শনিবার কি করবে?"

"গোসল করব।" গর্বে বুক ফুলিয়ে জাদেন বলে। "শনিবার রাতে আমার বাগদান।"

"এবার উইলি কয়েক মুহূর্ত জাদেনের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। জাদেন যেন একজন অচেনা লোক। তারপর উইলি তার প্রকাণ্ড থাবাটা জাদেনের কাঁধে স্থাপন করে পিতৃসুলভ কণ্ঠে বলে, "সত্যি করে বলত জাদেন, তুমি কি কখনো সখনো মাথার পিছনের দিকটায় ছোরাব ঘায়ের তীব্র যন্ত্রণা অনুভব কর? কানে একটা অদ্ভুত বোঁ বাঁ শব্দ শুনতে পাও?

হাঁা, যখন অনশনে অর্ধাশনে থাকি, তখন পেটে যেন বোমা পড়ে। সে এক বীভৎস অনুভূতি। এবার আমার বাগদত্তার কথায় আসি। সে সুন্দরী নয়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে আর তার চোখ ট্যারা। তবে এইসব খুঁত সে তার হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে পূরণ করে দেবে। আর তা ছাড়া তার বাপ একজন কসাই।"

একজন কসাই। এবার রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হতে শুরু করে। জাদেন আরো তথ্য সরবরাহ করে। "তোমরা বিস্মিত হবে যে, আমার বাগদত্তা আমার জন্য রীতিমত পাগল। এটা একটা ভালো দাঁও। দিনকাল বড্ড খারাপ, তাই একটু আধটু স্বার্থ বলি দিতেই হবে। কোন কসাই কোন দিন অনাহারে মরবে না। যাক বাগদান আর বিয়ে এক কথা নয়। দুয়ের মাঝে থাকে বিরাট ব্যবধান।"

উইলি খুব উৎসাহভরে কথাগুলো শুনে বলে। "জাদেন. তুমি ত জান, আমরা তোমার অকৃত্রিম বন্ধু………"

"তা'তো নিশ্চয়ই উইলি।" জাদেন উইলির কথার মাঝখানেই বলে, "আমার তরফ থেকে আমি তোমাদের সামান্য কিছু কাবাব আর তার সংগে খাবার জন্য চপ দেব। আগামী সোমবার একবার এসো। সে দিন আমরা একটা সাদা ঘোড়া জবাই করব।"

আমরা যাব বলে কথা দিয়ে তাকে বিদায় দেই।

ভ্যালেনটিন আলসটাডটার হফ রেস্তোঁরায় প্রবেশ করে। এটা সার্কাস শিল্পীদের আড্ডা। একদল খর্বকায় লোক আহারে বসেছে। টেবিলের উপর শালগমের স্যুপ আর প্রত্যেকের সামনে এক টুকরো রুটি। "রেশন কার্ডে প্রাপ্ত খাদ্য দ্রব্য তারা হয়ত পেট ভরে খেতে পারে। আশা করি।" উইলি উচ্চ স্বরে মন্তব্য করে। "তাদের পেট যা ছোট, তাই নয় কি?"

ঘরের দেয়ালে অনুষ্ঠানের ইশতাহার আর গুটিকয় আলোক চিত্র সাঁটা রয়েছে। কয়েকটা আধছেঁড়া আর সবগুলোই পুরানো রঙচটা। ভারোত্তলক, ব্যায়াম কুশলী, ঘোড়সওয়ার, ভাঁড় আর একজন সিংহ পোষিকার আলোক চিত্র।

ভ্যালেনটিন একটা আলোকচিত্র দেখিয়ে বলে, "এটাই এক দিন আমি ছিলাম।" আলোক চিত্রে একটা লোক বুক ফুলিয়ে হরাইজেন্টাল বার থেকে সার্কাসের তাবুর চূড়া পর্যন্ত ডিগবাজী খাচ্ছে। কিন্তু আজ শত ইচ্ছে করও কেউ এই লোকটাকে ভ্যালেনটিন বলে চিনতে পারবে না।

যার সাথে ভ্যালেনটিনের নাচার কথা সে তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। রেস্তোঁরার পিছনে ছোট হল কামরাটায় আমরা প্রবেশ করি। কামরাটার এক কোণে গোটা কয়েক মঞ্চের দৃশ্যপট হেলান দেয়া রয়েছে।

ভ্যালেনটিন একটা চেয়ারের উপর একটা গ্রামোফোন রেখে রেকর্ড বেছে নেয়। একটা কর্কশ সুর গ্রামোফোনের চোঙ দিয়ে বেরিয়ে আসে। বাজিয়ে বাজিয়ে রেকর্ডটার দফা রফা হয়ে গেছে। তবু এই সুরে উচ্ছৃঙ্খলতার অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। গত যৌবনা সুন্দরী রমণীর কর্কশ কণ্ঠস্বরের মতন। "ট্যাংগো নাচের বাজনা।" সুদক্ষ স্বরবিশারদের মতন সে অনুচ্চ কণ্ঠে আমাকে বলে। তার কথায় মনে হয় না যে সে এই মাত্র রেকর্ডের পিঠের লেখাটা পড়েছে।

ভ্যালেনটিনের পরিধানে নীল রঙের প্যান্ট আর শার্ট আর মেয়েটার আটসাঁট পোশাক। তারা একটা এপেক নৃত্যের মহড়া দেয়, যাতে মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তার পা দুটো ভ্যালেনটিনের গ্রীবাদেশে জড়িয়ে দোলে আর ভ্যালেনটিন দ্রুত চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

তারা দুজন নীরব গাম্ভীর্যে মহড়া দেয়; কেবল মাঝে মাঝে দু একটা কথার টুকরো ভেসে আসে। প্রদীপের ম্লান শিখা কাঁপে। গ্যাসের মৃদু শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যায়। নর্তক-নর্তকীর ছায়া দেয়ালের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর উইলি ছুটোছুটি করে গ্রামোফোনে চাবি দেয়।

নাচ শেষ হয়ে যায়। উইলি প্রশংসায় হাততালি দেয়। ভ্যালেনটিন তার নাচে খুব তৃপ্ত নয়। তাই সে ইঙ্গিতে উইলিকে নিরুৎসাহীত করে। মেয়েটা আমাদের দিকে না তাকিয়েই নিজের পোশাক বদলায়। সে সজ্ঞানে গ্যাস বাতির নিচে নাচের জুতোর ফিতে খোলে। ম্লান আলোর তলে নমনীয়ভাবে তার পৃষ্ঠদেশ ধনুকের মতন বেঁকে যায়। সে সোজা দাঁড়িয়ে বাহু উঠিয়ে পোশাকটা টেনে দেয়। তার স্কন্ধ দেশে আলো ছায়া খেলা করে। তার পা দুটো দীর্ঘ সুন্দর।

উইলি সারা জায়গাটায় উঁকিঝুঁকি মারে। ইতিমধ্যে সে পোশাক পরে প্রস্তুত হয়েছে। ঢিলা পোশাক আর মাথায় হ্যাট পরে তাকে অন্য রকম দেখায়। চেনাই যায় না। আগে তাকে কেমন কমনীয় মনে হতো। কিন্তু এখন তাকে অন্যদের মতন দেখায়। পোশাকের অদল বদলে মানুষের রূপ যে এত বদলে যায়, তা বিশ্বাস করা যায় না। কি আশ্চর্য যে পোশাক পরিচ্ছদ মানুষকে এত বদলে দেয়, আর উর্দি মানুষকে বদলে দেয় আরো বেশী।

(৩)

উইলি প্রতি সন্ধ্যায় ওয়াওম্যানে যায়। স্থানটা শহর থেকে খুব দূরে নয়। যেখানে রোজ সায়াহ্নে ও অপরাহ্নে নৃত্যানুষ্ঠান চলে। আমিও আজ সেখানে যাচ্ছি। কার্ল জানিয়েছে যে এডেলিও সেখানে মাঝে মাঝে যায়। আবার তাকে দেখতে আমার ইচ্ছা হয়।

ওয়াওম্যানের নাচঘরের সব জানালায় আলো জ্বলছে। পর্দার উপর নর্তক-নর্তকীর ছায়া পড়ছে। ঘরে ঢুকে উইলির খোঁজ করি। সব

টেবিলে লোকের ভিড়; একটা চেয়ারও খালি নেই। যুদ্ধের পর এই কয় মাস সবাই আমোদ-আহ্লাদ করার জন্য একেবারে পাগল।

সহসা লম্বা ঝুলওয়ালা কোট আর ঝকঝকে সাদা পোশাক পরা একজন লোকের উপর দৃষ্টি পড়ে আমার চোখ ঝলসে যায়। উইলি তার নতুন পোশাকটা পরেছে। আমি সেখানে দাড়িয়ে মিটমিট করি। কোটটা কালো, ওয়েস্ট কোটটা সাদা আর মাথার চুল লাল—একটা প্রাণবন্ত পতাকা খুঁটি।

উইলি আমার বিস্ময়াবেশকে অমায়িকতা সহকারে প্রশংসা হিসেবে গ্রহণ করে। "ভালো করে দেখে নিতে পার। এটা হলো আমার কায়সার উইলিয়াম স্মৃতিধারক ধরনের কোট।" সে ময়ূরের মত ঘুরে ঘুরে বলে "তোমার কেমন পছন্দ হচ্ছে? তুমি ত কোন দিন ভাবতেই পারনি যে একটা সামরিক গ্রেট কোট দিয়ে এমনটি হতে পারে। ভাবতে পেরেছিলে?"

সে আমার কাঁধ চাপড়ায়। "তুমি এসে খুব ভালো করেছ। আজ নৃত্য প্রতিযোগিতা হবে। তাই আমরা সবাই এসেছি। পুরস্কার বিতরণ হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিযোগিতা শুরু হবে।"

প্রতিযোগিতা প্রারম্ভের পূর্ব পর্যন্ত সবাই পায়তারা করে নিতে পারে। উইলির নৃত্যসাথী একজন মুষ্টিযোদ্ধার মতন বিশাল দেহী মেয়ে মানুষ—ঘোটকীর মতন শক্তিশালিনী। এ মুহূর্তে সে মেয়েমানুষটাকে নিয়ে একপদী নৃত্যের মহড়া দিচ্ছে। দ্রুততাই এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য। অন্য দিকে কার্ল খাদ্য দফতরের একটি মেয়ের সাথে নাচছে। এ করে সে নিজের স্বার্থোদ্ধার আর আনন্দোপভোগ একই সঙ্গে চমৎকার বাগিয়ে নিয়েছে। আলবার্ট আমাদের টেবিলে নেই। এক কোণ থেকে সে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছে। সেখানে সে এক স্বকেশিনী তরুণীর সঙ্গে বসে আছে।

"এই শেষ বারের মতন আমরা তাকে দেখলাম।" উইলি ভবিষ্যদ্বাণী করে।

আমি একজন ভালো নৃত্য সঙ্গিনী জুটিয়ে নেবার আশায় পায়চারী করি। কাজটা খুব সহজ নয়। অনেক মেয়ে আছে টেবিলে যাদের হরিণীর মতন দ্রুতগতি মনে হয়, কিন্তু নাচের আসরে তারা গর্ভবতী হস্তিনীর মত মন্থর। সবাই অবশ্য দক্ষ নর্তক নর্তকীর সংগ কামনা করে।

যাহোক শেষ পর্যন্ত আমি একজনকে বায়না দিলাম, তার পেশা পোশাক তৈরি করা।

অর্কেস্টা বেজে ওঠে। বোতামে চন্দ্র মল্লিকা ফুল গুঁজে একটা লোক সামনে এগিয়ে এসে বুঝিয়ে দেয় যে, এবার এক জোড়া নর্তক নর্তকী বার্লিনের অত্যাধুনিক নৃত্য ফক্স ট্রট প্রদর্শন করবে। এখানে এই নাচ আজ পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়নি ; আমরা এর নাম শুনেছি মাত্র।

আমরা আগ্রহে প্রতীক্ষা করি। অর্কেস্ট্রা বাজতে থাকে। নাচ শুরু হয়। নর্তক নর্তকী একে অন্যের চারদিকে ঘোরে, কখনো এগিয়ে আর কখনো পিছিয়ে যায়। তারপর পরস্পরের হাত ধরাধরি করে ঘূর্ণির মত ঘুরতে থাকে। উইলি গ্রীবা উঁচিয়ে দেখে। আনন্দে উল্লাসে তার চক্ষু ছানাবড়া। তার মনের মতন নাচ বটে।

পুরস্কারে সাজানো টেবিলটা ভিতরে আনা হয়। ওয়ান স্টেপ বস্টন আর ফক্স ট্রট, প্রত্যেকটার জন্য তিনটে পুরস্কার। ফক্স ট্রট থেকে আমরা বাদ পড়ে যাই। আমরা এই নাচ পারব না। তবে বাকী দুটোতে আমরা জিততে চাই।

প্রত্যেক নাচের প্রথম পুরস্কার হয় দশটা গাঙ চিলের ডিম, নয়ত এক বোতল মদ। উইলি সন্দিগ্ধ মনে জানতে চায়। এই ডিম ভক্ষণযোগ্য কি-না। এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়ে সে ফিরে আসে। দ্বিতীয় পুরস্কার হয় ছয়টা ডিম, নয়ত একটা ব্যালাক্লোভা টুপি। আর তৃতীয় পুরস্কার চারটে ডিম। নয়ত দুই প্যাকেট সাধারণ সিগারেট। "আমরা এই সিগারেট নিচ্ছি না" কার্ল বলে। এই সিগারেট সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে।

প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বোস্টন নাচে কার্ল আর আলবার্ট এবং ওয়ান স্টেপে উইলি আর আমি নাম দিয়েছি। উইলি সম্বন্ধে আমাদের আশা অত্যন্ত ক্ষীণ, তবে বিচারকদের কৌতুক রসবোধ থাকলে সে জয়ী হতে পারে।

বোস্টনে কার্ল আর আলবার্ট আরো তিনটি জুটির সাথে ফাইনালে পৌঁছে। কার্ল-জুটির সাজ-পোশাক তাদের জয়ের অনুকূল। নাচের স্বকীয় রীতি আর ভাব-ভঙ্গিতে কার্ল অনুপম। কিন্তু তাল এবং ছন্দে আলবার্টও অন্তত: একই স্তরের। বিচারকবৃন্দ গম্ভীর মুখে সব টুকছে, যেন ওয়াল্ডম্যানে শেষ বিচারের অনুষ্ঠান চলছে। কার্ল জয়ী ঘোষিত হয়ে দশটা ডিম গ্রহণ করে। মদের গুণাগুণ তার খুব ভালো জানা আছে। সে মদের বোতল

নেয় না। সে নিজেই এই মদ এখানে বিক্রি করেছে। সে উদার চিত্তে ডিমগুলো আমাদের উপহার দেয়। তার বাড়ীতে এর চেয়ে ভালো ডিম রয়েছে। আলবার্ট দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। আমাদের পানে একটা বিব্রত দৃষ্টিতে চেয়ে সে তার সুকেশিনী সঙ্গিনীর কাছে ডিমগুলো নিয়ে যায়। উইলি শিস দেয়।

আমার সঙ্গিনীকে নিয়ে ওয়ানস্টেপ প্রতিযোগিতায় আমি ফাইনেলে পোঁছি। আমি বিস্মিত যে উইলি নিজের জায়গায় অনড় বসে আছে। সে চেষ্টাও করবে না। আমার সঙ্গিনীও আমার সঙ্গে চমৎকার নৃত্য প্রদর্শন করে। আমরা দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে তা আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেই।

ন্যাশন্যাল ইউনিয়ান ফর ডানসিং এর রূপোর পদক বুকে ঝুলিয়ে আমি মহাগর্বে নিজের টেবিলে ফিরে যাই।

"উইলি, গাধা কোথাকার। তুমি প্রতিযোগিতায় নামলে না কেন? ব্রোঞ্জ পদকটা ত পেতে পারতে।" আমি উইলিকে ভৎর্সনা করি।

কার্ল আমাকে সমর্থন করে বলে, "খাঁটি কথা। কেন নামলে না?"

উইলি সোজা দাঁড়িয়ে তার ঝুলওয়ালা কোটটা ঠিক করে নেয়। তারপর আমাদের পানে একবার গর্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটি কথায় জওয়াব দেয়, "কারণ।"

বুকে চন্দ্রমল্লিকা ফুল আঁটা লোকটা ফক্সট্রট নাচের প্রতিযোগীদের আহ্বান করে। মাত্র সামান্য কয়টি জুটি এ নাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। উইলি এগিয়ে না গিয়ে মেঝেতে পায়চারি করতে থাকে।

"এই নাচ সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই।" কার্ল বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলে। সে কি করবে, তাই দেখার জন্য আমরা কৌতূহলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকি। যে মেয়েটা সিংহ পোষ মানায়, সেই মেয়েটা তার দিকে এগিয়ে এলে সে সবেগে হাত বাড়িয়ে দেয়। অর্কেস্টা বাজতে শুরু করে।

মুহূর্তে উইলির রূপান্তর ঘটে যায়। নৃত্যের উন্মাদনায় সে মেতে ওঠে, সে লাফায় ঝাপায় তার সঙ্গিনীকে নিয়ে ঘূর্ণীর মতন ঘোরে, সঙ্গিনীকে একবার উপরে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নেয়। উইলি যে অতি উঁচু স্তরের

ফক্সট্রট নৃত্য প্রদর্শন করছে, তাতে কোন দর্শকের মনে সন্দেহ নেই। উইলি প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। তার বিজয় এমনি সুনিশ্চিত যে নৃত্যশেষে কতক্ষণ স্তব্ধতা বিরাজ করে। সে বিজয়ানন্দে মদের বোতলটা আমাদের সামনে তুলে ধরে। তার সারা দেহ থেকে ঘাম ঝরে। তার পোশাক ভিজে গেছে।

প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে, তবে নৃত্যানুষ্ঠান অব্যাহত রয়েছে। আমরা টেবিলে বসে উইলির বিজয় উপহারের মদ্য উপভোগ করছি।

কেবল আলবার্টই অনুপস্থিত। বুনো ঘোড়াও তাকে তার সুকেশিনী সঙ্গিনীর সাহচর্য থেকে টেনে আনতে পারবে না।

উইলি আমাকে গুঁতো দিয়ে বলে, "ঐ যে এডেলি।"

"কোথায়?" আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করি।

সে নৃত্য মঞ্চের ভিড়ের পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তাইত। ঐ ত সে একজন দীর্ঘদেহী কৃষ্ণকায় লোকের সঙ্গে ওয়ালজ নাচ নাচছে।

"ওকি অনেকক্ষণ এসেছে? আমি জানতে চাই সে কি আমাদের বিজয় প্রত্যক্ষ করেছে। তাই আমি চাই।"

"প্রায় পাঁচ মিনিট আগে এসেছে," উইলি বলে।

"ঐ সারসের মতন লম্বা লোকটার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, সারসটার' সঙ্গে।"

নাচের সময় এডেলি তার মাথাটা পিছনের দিকে সামান্য বাঁকিয়ে রাখে। তার একটা হাত কালো লোকটার কাঁধের উপর ন্যস্ত। পাশ থেকে তার মুখের উপর একবার নজর পড়তেই আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। নৃত্য প্রকোষ্ঠের ম্লান আলোর নীচে তার মুখখানা যুদ্ধের আগের সন্ধ্যাগুলোর স্মৃতি আমার মনে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু সীমান্ত থেকে ফিরে এসে দেখছি তার মুখখানা আরো ভরাট হয়ে গেছে। আর তার হাসিটা এখন কেমন অচেনা মনে হয়।

উইলির মদের বোতল থেকে একটা দীর্ঘ চুমুক দেই। আমার নৃত্য সঙ্গিনী পাশেই আর এক জনের সঙ্গে নাচছে। সে এডেলির চেয়ে ছিমছাম আর পরিচ্ছন্ন। সে দিন কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে আমি তা লক্ষ্য করিনি। সে এখন পরিপূর্ণ নারীতে পরিণত হয়েছে, এখন তার বক্ষদেশ পরিপুস্ট,

পদযুগল সুডৌল বলিষ্ঠ। সে আগে এমন ছিলো কিনা তা আমার মনে পড়ছে না। হয়ত আগে এ দিকটা আমি লক্ষ্য করিনি।

"বেশ ডবকা ছুঁড়ীটি হয়ে গেছে।" উইলি যেন আমার চিন্তাধারা বুঝতে পেরেছে।

"চুপ কর।" আমি তাকে ধমক দেই।

ওয়ালজ নাচ শেষ হয়েছে। এডেল দুয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার কাছে যাই। সে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে তার নৃত্য সঙ্গীর সাথে হেসে হেসে কথা বলতে থাকে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে তার পানে চেয়ে থাকি। আমার বুকের স্পন্দন দ্রুত চলছে, যেন কি একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি।

"আমার পানে এমন করে চেয়ে আছ কেন?" সে জিজ্ঞেস করে।

"এমন কিছু নয়।"—আমি বলি, "এবার নাচলে কেমন হয়?"

"এবার নয়, পরবর্তী নাচ।" বলে সে তার সঙ্গীর সঙ্গে নৃত্য মঞ্চে চলে যায়।

আমি তার জন্য প্রতীক্ষা করি। তারপর আমরা দুজনে বোস্টন নাচ নাচি। আমি ভালো নাচতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। সে আমার নাচ পছন্দ করে।

"নিশ্চয়ই সীমান্তে তুমি নাচ শিখেছ।"

"ঠিক সেখানে শিখিনি, তবে এইমাত্র একটা পুরস্কার পেয়েছি," আমি জওয়াব দেই।

সে আমার পানে মুখ তুলে তাকায়। "আহ্, কি দুঃখের কথা? সেই নাচটা আমরা দুজনে নাচতে পারতাম। কি পুরস্কার ছিলো?"

"ছয়টা ডিম আর একটা পদক।" আমি জওয়াব দেই। আমি লজ্জা বোধ করি। বেহালায় এমন করুণ সুর বাজছে যে পায়ের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে।

"যাক, এখন ত আমরা দুজনে নাচছি।" আমি বলি, "আচ্ছা, তোমার কি অতীতের সে সব সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে যখন আমরা জিম ক্লাব থেকে একে অপরের পিছনে ছুটোছুটি করতাম?"

সে ইতিবাচক মাথা নাড়ে। "হ্যাঁ, তখন আমরা ছেলে মানুষ ছিলাম। ঐ দিকে তাকাও। লাল পোশাক পরা মেয়েটার ঐ ঢিলা ব্লাউজই অত্যাধুনিক ফ্যাশন। ছেলেমানুষি! নয় কি?"

বেহালায় এবার করুণ সুর কেঁপে কেঁপে বাজে; ঠিক চাপা কান্নার মতন।

"প্রথম যে দিন তোমার সাথে আমি কথা বলি, সে দিন আমরা দুজনই পালিয়েছিলাম।" আমি বলি। "সেটা ছিলো জুন মাস—শহরের পুরান পাঁচিলের কাছে। সেটা যেন মাত্র গতকালের ঘটনা - - - -"

এডেল অন্য একজন লোকের প্রতি হাত নাড়ে। আবার সে আমার পানে ফিরে দাঁড়ায়।

"হ্যাঁ, সেটা কি আমাদের বোকামি ছিলো না? আচ্ছা, তুমি কি ট্যাঙ্গো নাচ নাচতে পার? ঐ যে কালো ছেলেটা দেখছ, সে চমৎকার ট্যাঙ্গো নাচ নাচে।"

আমি নিরুত্তর। বাজনা থেমে গেছে। "তুমি অল্পক্ষণেব জন্য আমাদের টেবিলে আসবে?" আমি প্রশ্ন করি।

সে টেবিলের পানে তাকায়। "পেটেণ্ট চামড়ার জুতো পরা ঐ ছিপছিপে ছেলেটা কে?"

"তার নাম কার্ল ব্রোগার" আমি জওয়াব দেই। এডেল এসে আমাদের সঙ্গে বসে। উইলি তাকে এক গ্লাস মদ ঢেলে দিয়ে দু একটা রসিকতা করে। এডেল হাসে আর কার্লের পানে চায়। সে কার্লের নৃত্য সঙ্গিনী আধুনিকতম ব্লাউজ পরা মেয়েটার পানে ফিরে ফিবে তাকায়। আমি বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে এডেলকে পর্যবেক্ষণ করি। সে এত বদলে গেছে। স্মৃতি শক্তি কি এখানেও আমাকে ফাঁকি দিলো? স্মৃতি কি পুরাতন হয়ে সত্যকে চাপা দিয়ে দিয়েছে? আমাদের পার্শ্বে উপবিষ্ট এই বাক্যবাগীশ মেয়েটা এত বেশী কথা বলছে যেন সে আমার পবিচিত নয়। তার বাহ্যিক আভরণের অন্তরালে এমন একজন কি থাকতে পারে না যে আমার পরিচিত? বয়েস বাড়লে কি মানুষের বিকৃতি ঘটে? হয়ত কালের ব্যবধানই এর কারণ; আমি মনে মনে ভাবি। তিন বছরের বেশী হয়ে গেছে। তার বয়স তখন ষোল—ছেলে মানুষ, এখন তার বয়েস উনিশ—বয়ঃপ্রাপ্তা তরুণী। সহসা কালের অজানা বিষণ্ণতা সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়ে পড়ি। কাল প্রবাহ অব্যাহত গতিতে চলছে আর সবকিছু বদলে দিয়ে যাচ্ছে। তাই মানুষ অতীতকে খুঁজতে গিয়ে আর কিছুই ফিরে পায় না। হ্যাঁ, অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কঠিন, কিন্তু আবার অতীতে ফিরে যাওয়া আরো কঠিন।

"এমন করে গোমড়ামুখো হয়ে বসে আছ কেন আর্নস্ট? পেট কামড়াচ্ছে?" উইলি আমাকে জিজ্ঞেস করে।

"ও বড় নীরস। তাই না?" এডেল হেসে বলে, "আর ও সব সময় এই রকম। আর্নস্ট, তুমি কি কিছুটা প্রাণচঞ্চল হতে পার না? জবুথবু হয়ে এমনিভাবে বসে থাক। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা প্রাণ চঞ্চল ছেলেদের বেশী পছন্দ করে।

"তা শেষ হয়ে গেছে"—আমি মনে মনে বলি, "সে যুগ বাসি হয়ে গেছে।" আমি নীরস বলে যে সে আমাকে ভাবে সে জন্য না বা সে যে বদলে গেছে এ জন্যও নয়। আমার মুখ গোমড়া করে বিষণ্ন মনে বসে থাকার কারণ এর কোনটাই নয়। আমার এই মানসিক অবস্থার কারণ, আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমি আমার যৌবনের দুয়ারে দুয়ারে কারাঘাত করে সেখানে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষায় ছুটোছুটি করছি, কিন্তু বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। ভাবছিলাম সেখানে আবার আমি প্রবেশাধিকার পাব, কারণ আমি এখনো তরুণ, কিন্তু আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা আলেয়ার আলোর মতন নিভে গেছে। আমার স্পর্শে সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারিনি। ভাবছিলাম, এখানে হয়ত অতীতের কিছু সম্পদ রয়ে গেছে। তাই বার বার এই সম্পদ ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করে বার বার নিজেকে হাস্যাস্পদ আর নিজকে করুণার পাত্র করেছি মাত্র। কিন্তু এখন আমি জানি আর মর্মে মর্মে অনুভব করি যে যুদ্ধ আমার স্মৃতির রাজত্বও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আমি এখন জানি, ভবিষ্যতের আশাও আমার জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। মহাকাল আমাদের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যাবর্তনের পথ আমার রুদ্ধ। আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, সম্মুখপানে চলতে হবে। যেখানে খুশী যাব। তাতে কিছু আসে যায় না। আমার কোন গন্তব্য নেই, আমার কোন লক্ষ্য নেই।

মদের গ্লাসটা শক্ত করে ধরে চোখ তুলে তাকাই। হ্যাঁ, ঐ ত এডেল এখনো কার্লকে জিজ্ঞেস করছে কোথায় চোরাচালানী সরেস রেশমী মোজা পাওয়া যেতে পারে। অন্য দিকে নাচ আগের মতনই চলছে, অর্কেস্ট্রা বাজছে। আর আমিও একই চেয়ারে আগের মতন বসে আছি, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি এবং এখনো আমার দেহে প্রাণ আছে। তখন কি একটা বিদ্যুৎ ঝলক আমাকে জোর করে নিয়ে যায় নি? তখন কি একটা দেশ সবাইকে ধ্বংস করে কেবল আমাকে একলা জীবিত রেখে হঠাৎ ধ্বসে তলিয়ে যায় নি?

এডেল দাঁড়িয়ে কার্লের কাছে বিদায় নেয় "তা হলে, মেয়ার এণ্ড নিকেশের দোকানে?" সে খোশ মেজাজে কার্লকে বলে। "তুমি ঠিক জান নিশ্চিত তারা গোপনে এ সব জিনিসের ব্যবস্থা করে? কাল সকালে প্রথমে আমি সেখানে উপস্থিত হব। আর্নস্ট, তা হলে এবার আসি।"

"আমি তোমার সঙ্গে কিছু দূর পর্যন্ত যাব।" আমি জওয়াব দেই।

বাইরে এসে সে করমর্দন করে, "তুমি আর এসো না। আমার জন্য একজন অপেক্ষা করছে।"

আমি জানি, এটা আমার নির্বুদ্ধিতা আর ভাবপ্রবণতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু আমি অসহায়। আমি টুপিটা খুলে আনত হয়ে বিদায় নেই, যেন দীর্ঘ দিনের জন্য এই বিদায় গ্রহণ। তবে এই বিদায় গ্রহণ তার কাছ থেকে নয়, আমার অতীতের সব কিছু থেকে। সে সন্ধানী দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত আমার পানে তাকিয়ে বলে "মাঝে মাঝে তোমাকে বেশ অদ্ভুত মনে হয়।" কথাটা বলেই সে গুণগুণিয়ে পথে নামে।

আকাশ নির্মেঘ হয়ে গেছে। সারা শহরে রাত্রি নেমেছে। অনেকক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখি। তারপর ঘরে ফিরে যাই।

(৪)

যুদ্ধ ফ্রন্ট থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই প্রথম আমাদের রেজিমেন্টের পুনর্মিলনী উৎসব কনার্সম্যানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে যুদ্ধপ্রত্যাগত সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছে। এই উৎসব ঘটা করে হবে আশা করি।

কার্ল, আলবার্ট, জাপ আর আমি নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা আগেই উপস্থিত হই। পুরানো বন্ধুদের আবার দেখার জন্য আমরা অস্থির।

আমরা বড় হলের বাইরে একটা বসার ঘরে বসে উইলি ও অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের মধ্যে কে এক চক্কর জিন খাওয়াবে তা ঠিক করার জন্য মুদ্রা নিক্ষেপ করছি এমন সময় দরজা খুলে যায় আর ফার্ডিন্যাণ্ড কসোল ভিতরে প্রবেশ করে। তার চেহারা দেখে আমরা এতই বিস্মিত হয়ে যাই যে মুদ্রাটা আমাদের হাত থেকে পড়ে যায়। কসোল বেসামরিক পোশাক পরেছে।

আমাদের সকলের মত সেও এত দিন পুরানো উর্দি পরতো, কিন্তু আজ এই উৎসব উপলক্ষে বেসামরিক পোশাক পরে এসেছে। সে

নীল রঙের ওভারকোট, মখমলের কলার, মাথায় সবুজ টুপি আর প্রজাপতি রঙের টাই পরেছে। এই পোশাকে তাকে একজন অন্য লোক মনে হয়।

আমরা সবে বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছি। ঠিক এমন সময় জাদেন এসে হাজির। সেও এই প্রথম বেসামরিক পোশাক পরিহিত। ডোরাওয়ালা ওয়েস্ট-কোট, হলদে চকচকে জুতো এবং মাথায় রূপা মোড়ানো ছড়ি। সে থুৎনি উচিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। কসোলেব মুখোমুখি হতেই সে এক পা পিছিয়ে যায়। কসোলও তাই করে। সামরিক পোশাক ছাড়া অন্য পোশাকে তারা পরস্পরকে কোন দিন আগে দেখেনি। এক সেকেণ্ড তারা একে অন্যকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে। এই বেসামরিক পোশাকে একে অন্যেকে হাস্যকর মনে করে।

"কি হে ফার্ডিন্যাণ্ড, আমি ত সব সময় তোমাকে একজন সুবেশধারী ভদ্রলোক মনে করতাম।" জাদেন দাঁত কেলিয়ে হাসে।

কসোল হাসি বন্ধ করে বলে "তুমি কি বলতে চাও?"

"কেন? এই যে", বলে জাদেন কসোলের ওভারকোটটা দেখিয়ে বলে, "আমার মনে হচ্ছে, এটা তুমি কোন বিক্রীওয়ালার দোকান থেকে কিনেছ।"

"তুমি একটা উল্লুক।" কসোল গর্জে উঠে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ক্রোধে তার মুখ রক্তাভ। আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। সে সত্যি বিচলিত হয়ে গেছে। সবার অলক্ষ্যে সে তার হাস্যকর ওভারকোটটা দেখে নেয়। উর্দিপরা অবস্থায় কোন দিন তার এমন ধারণা হতো না। এবার সে তার পরিষ্কার আস্তিন দিয়ে ওভারকোটের দাগগুলো সত্যি সত্যি মুছতে থাকে। তারপর সে অনেকক্ষণ নতুন স্যুট-পরা কাল ব্রোগারের পানে তাকায়। আমি যে তাকে লক্ষ্য করছি সে তা জানেনা। একটু পরে সে আমাকে প্রশ্ন করে "তুমি জান, কার্লের বাবা কি কাজ করেন?"

"তাই—জেলা জর্জ—তাই ত।" সে গভীর হয়ে বলে, "আর লুদভিগের বাবা?"

"আয়কর বিভাগের ইনস্পেকটার।"

অল্পক্ষণ নীরব থেকে সে বলে, "আমার মনে হয় শীগগিরই হয়তো আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে------"

"তুমি একটা নিরেট পাগল।" জওয়াবে আমি তাকে বলি। সে সংশয়সূচক কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়। আমি বিস্ময়মুক্ত হতে পারিনা। এই বেসামরিক পোশাকেই যে তাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে তাই নয়, সে সত্যিই অন্য রকম হয়ে গেছে। আগে এ ব্যাপারে কোন দিন সে মাথা ঘামাতো না। কিন্তু এখন তার এমনি মানসিক অবস্থা যে সে তার ওভাবকোটটা খুলে ঘরের এক অন্ধকার কোণে ঝুলিয়ে রেখে দেয়।

আমি তাকে লক্ষ্য করছি টের পেয়ে সে কৈফিয়তের সুরে বলে "এখানে বড্ড গরম।" আমি মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দেই।

"আর তোমার বাবা কি করেন?" একটু পরে বিষণ্ন কণ্ঠে সে আমাকে জিজ্ঞেস করে।

"দফতরি।" আমি জওয়াব দেই।

"সত্যি?" সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। "আর আলবার্টের বাবা?"

"মারা গেছে। কর্মকার ছিলেন।"

"কর্মকার।" সে আনন্দে কথাটা পুনরাবৃত্তি করে। কর্মকার যেন স্বয়ং পোপের মতন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। "কর্মকার, তাই না? মহান কাজ। আমি নিজে একজন ফিটার মিস্ত্রি। আমরা তা হলে প্রায় সহকর্মী হতে পারতাম। তাই নয় কি?" "তাই", আমি সায় দেই।

বেসামরিক কসোলের দেহের ধমনীতে সামরিক কসোলেব রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করছে। তার মুখের রঙ বদলে যায়। তার দেহে শক্তি সঞ্চারিত হয়।

"তা না হলে দুঃখের ব্যাপার হতো।" এই বলে সে আমাকে নিশ্চয়তা দেয়। ঠিক এই মুহূর্তে সে আবার একটা মুখ ভেঙচি দিবার জন্য পাশ দিয়ে যাবার সময় কোন কথা না বলে স্বস্থানে বসেই ঠিক লক্ষ্য ভেদ করে জাদেনকে একটা লাথি মারে। সেই পুরানো কসোল।

এবার বড় হলের দরজার দুম দড়াম শুরু হয়েছে। নিমন্ত্রিতদের প্রথম দল আসছে। আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। ঘরটা এখনো শূন্য। ফুলের মালা আর টেবিল চেয়ার এখনো সাজানো হয়নি। সবকিছু এলোমেলো। কয়েকটি দল এখনো ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে। রঙচটা উর্দি পরা জুলিয়াস ওয়েডেক্যাম্পকে আবিষ্কার করে তাড়াতাড়ি কয়েকটা চেয়াব সরিয়ে আমি তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে যাই।

"কেমন আছ জুলিয়াস?" আমি তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করি। "তুমি যে আমার কাছে একটা মেহগিনি কাঠের ক্রশ ধার সে কথাটা তুমি ভুলে যাও নি? তোমার কি মনে আছে যে তুমি পিয়ানোর ঢাকনা দিয়ে আমার জন্য একটা ক্রুশ বানিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছিলে? মনে রেখো কিন্তু------"

"আর্নস্ট,' এটা আমার কাজেও লাগতে পারতো।" সে বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে বলে, "আমার স্ত্রী মারা গেছে জান?"

"তাই নাকি জুলিয়াস? শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। কিসে মারা গেল?" আমি জিজ্ঞেস করি।

সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে যায় "সারা শীত কালটা দোকানে ক্রেতা দলের সারিতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে এক দিন পড়ে গিয়ে আহত হয়। তারপব একটা সন্তান প্রসব করে; তাতেই শেষ হয়ে যায়।"

"আর সন্তানটা?"

"সেটাও মারা গেছে।" তার আনত কাঁধটা কুঁজো হয়ে যায়, যেন শীতে সে কুঁকড়ে যাচ্ছে। "হ্যাঁ, আব সেফলারও মারা গেছে আর্নস্ট। তা হয়ত তুমি জান।"

আমি নেতিসূচক মাথা নাড়ি। "তা কেমন করে হলো?"

ওয়েডেক্যাম্প পাইপ ধরিয়ে বলে, "তুমি জান, সে মাথায় আঘাত পেয়েছিলো। ১৯১৭ সালে; তাই না? যাক, তখনকার মতন ঘা'টা শুকিয়ে যায়। তারপর প্রায় ছয় হপ্তা আগে সে মাথায় এমনি তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে যে, সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে। আমরা চারজনে মিলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সক্ষম হই। স্ফীতি না কি একটা যেন হয়েছিলো। সে পর দিনই মারা যায়।" এই বলে সে আবার পাইপটা ধরাবার জন্য দেয়াশলাই বের করে। "হ্যাঁ, এখন তার স্ত্রীকে সরকার পেনশন দিতে রাজী নয়।"

"জারহার্ড পহলের খবর কি?" আমি জানতে চাই।

"এখানে আসার মতন সম্বল তার নেই। ফাসবেণ্ডার এবং ফ্রিখেরও একই অবস্থা। সব বেকার; খাবার পয়সা পর্যন্ত জুটাতে পারে না। তাদেরও আসার ইচ্ছে ছিলো। বেচারা প্রাক্তন সৈনিক।"

ইতিমধ্যেই হল ঘরটা প্রায় অর্ধেক ভরে গেছে। পুরানো সাথীদের আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপাব, পুরানো মানসিকতা

আর নেই। শুধু এই পুনর্মিলনীর জন্যই সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রতীক্ষা করে আছি এই আশা নিয়ে যে এখানে আমাদের সব দুর্ভাবনা, অনিশ্চয়তা আর ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। এর কারণ হয়তো এই যে, সামরিক উর্দি আর বেসামরিক পোশাক ঘরময় ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে অথবা এমনও হতে পারে যে বৃত্তি, পারিবারিক আভিজাত্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার বাধা আমাদের মধ্যে দূরত্বের স্বষ্টি করেছে। এটা নিশ্চিত যে আমাদের মধ্যে সাথীত্বের পুরানো অনুভূতি অবশিষ্ট নেই।

সব উলটপালট হয়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বসের কথাই বলা যাক। সে ছিলো সারা কোম্পানীর ঠাট্টা তামাশার স্থায়ী পাত্র। সে ছিল এমনি নিরেট বোকা যে সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতো। সেও তা হাসি মুখে মেনে নিতো। সীমান্তে সে এমনি নোংরা ময়লা থাকতো যে অনেকবার আমরা তাকে জোর করে কল তলায় বসিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি। সেই বসই কিনা আজকাল দামী চকচকে স্যুট পরে মুক্তোর টাইপিন লাগিয়ে বিরাট বিত্তশালীর মতন বড় বড় বুলি আউড়াচ্ছে। আর তার পাশে বেতকি। সীমান্তে যে বেতকির অবস্থান তার চেয়ে এত উঁচুতে ছিলো যে বেতকি তার সঙ্গে কথা বললে সে বর্তে যেতো, এখন সেই বেতকি সামান্য জমির মালিক একজন গেঁয়ো মুচি মাত্র। আর লুদভিগ ব্রেয়ার, লেফটান্যান্টের পোশাকের বদলে তার গায়ে এখন একটা স্কুলের আঁটসাঁট স্যুট। তার সৈনিক জীবনের পুরানো আর্দালী আজ বড় ব্যবসায়ী আর বহু বাড়ীর মালিক বনে তার পিট চাপড়াচ্ছে। ঐ ত ভ্যালেনটিন। তার ছেঁড়া কোটের নিচে নীল সাদা সুয়েটার। তাকে দেখে একটা ভবঘুরে ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না। কিন্তু আসলে সে কত বড় একজন সাহসী যোদ্ধা! আর তার পাশে লেদারহোজ উপবিষ্ট। এই নোংরা কুত্তাটা অপূর্ব পোশাক পরে বিলেতী সিগারেট ফুঁকছে। পায়ের তলায় যারা ছিলো তারা সব মাথায় চড়ে গেছে।

তাও চলতে পারে। কিন্তু তাদের কথাবার্তারও ঢং বদলে গেছে। আর ঢং বদলির উৎস তাদের পোশাক পরিচ্ছদের জাঁক জমক। যে বেচারা আগে একটা হাঁসকে হিস করতো না সে এখন মুরব্বীয়ানা করছে। দামী পোশাক পরার দল এখন পৃষ্ঠপোষকতার সুরে কথা বলছে আর জীর্ণ পোশাকধারীরা নীরব। একজন স্কুল শিক্ষক—সেনাবাহিনী

কর্পোরেল ছিলো, তাও নিষ্কর্মা কর্পোরেল—সে অনুকম্পার সুরে কার্ল আর লুদভিগকে তাদের পরীক্ষা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আমি লুদভিগ হলে তার মাথায় বিয়ারের গ্লাসটা ঢেলে দিতাম। প্রভুকে ধন্যবাদ। কার্ল পরীক্ষা আর শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটা বিরূপ মন্তব্য করে পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রশংসা করে।

এখানকার আলাপ-আলোচনায় আমি পীড়া অনুভব করি। আমার মনে হয়, এখানে আমাদের একত্র সমবেত না হলেই ভালো হতো। তা হলে আমরা অতীতের মধুর স্মৃতি আঁকড়ে থাকতে পারতাম। আমি এই সব লোকদের নোংরা উর্দিপরা সৈনিক আর এই রেস্তোরাটাকে সীমান্তের বিশ্রাম অঞ্চলে একটা ক্যান্টিনরূপে কল্পনা করার ব্যর্থ চেষ্টা করি। কিন্তু তা হয় না। এখানকার পরিবেশ প্রবলতর ; যে পরিবেশ আমাদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে তা অত্যন্ত শক্তিশালী। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমষ্টির স্বার্থ চিন্তা এখন আর চূড়ান্ত নয়। সমষ্টির স্বার্থ এখন ভিন্ন হয়ে ব্যক্তি স্বার্থের স্থান গ্রহণ করেছে। আমরা যখন একই পোশাক পরতাম সেই অতীতের গহ্বর থেকে মাঝে মধ্যে হয়ত সোনালী আভা বেরিয়ে আসবে, তবে সে আভা ম্লান হয়ে গেছে। অন্যরা এখনো আমাদের সাথী বটে, কিন্তু আমাদের সাথীদের বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। তারা সাথী হয়েও আর আমাদের সাথী নয়। এটাই বিষাদময় ব্যাপার। সবাই যুদ্ধে গিয়েছিলো। আমরা আমাদের সাথীত্বে বিশ্বাসী ছিলাম কিন্তু এখন উপলব্ধি করছি যে, মৃত্যু যা করতে পারেনি, জীবন তা সমাধা করছে—আমাদের পৃথক করে দিচ্ছে।

কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করতে রাজী নই। আমরা এক সংগে এক টেবিলে বসি। লুদভিগ, আলবার্ট, কার্ল, এডলফ, উইলি, ভ্যালেনটিন—আমাদের মনে একটা বিষণ্ণতার অনুভূতি।

আলবার্ট বড় ঘরটার দিকে তাকিয়ে বলে, "যা হবার হোক, আমরা একত্র থাকব।" এ ব্যাপারে সম্মত হয়ে আমরা পরস্পরের করমর্দন করি। আর অদূরে ভালো পোশাকধারীরা তাদের চেয়ার কাছাকাছি টেনে নিচ্ছে। এই নতুন শ্রেণী বিভাগে থাকার ইচ্ছে আমাদের নেই। তারা যা ত্যাগ করছে তা আমরা গ্রহণ করব।

আমরা এক সঙ্গে আরো কতক্ষণ বসে থাকি। কিন্তু এডলফ বেতকি অবিলম্বে বিদায় নিয়ে চলে যায়। তাকে কেমন যেন বিমর্ষ দেখায়।

একজন পরিচারক এসে জাদেনের কানে কানে কি যেন বলে। সে পরি-চারককে বিদায় করে দেয়। "এখানে মেয়েদের কোন কাজ নেই।" আমরা বিস্ময়ে পরস্পরের পানে তাকাই। জাদেন তৃপ্তিতে হাসে। পরিচারক ফিরে আসে। তার পিছনে পিছনে একজন স্ত্রীলোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে এসে উপস্থিত হয়। জাদেন বিব্রত বোধ করে। তার অবস্থা দেখে আমরা হাসি। কিন্তু সে জানে কেমন করে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। সে একটা চমৎকার ভঙ্গি করে বলে—"ইনিই আমার বান্ধবী।"

জাদেনের কাজ এখানেই শেষ। এবার উইলি পরিচয় প্রদানের কাজটা হাতে নেয়। সে লুদভিগকে দিয়ে শুরু করে এবং নিজকে দিয়ে শেষ করে। সে জাদেনের বাগদত্তাকে আসন গ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। মেয়েটা আসন গ্রহণ করে। উইলি তার পাশে বসে তার চেয়ারের পিছনে হাত রাখে। "তোমার বাবা ত নিউয়েন গ্রেবেনের সেই বিখ্যাত কসাই?" "আলাপচারীতার ভূমিকা হিসেবে উইলি তাকে প্রশ্ন করে।

মেয়েটা মাথা নাড়ে। উইলি আরো কাছে ঘেঁষে বসে। জাদেন তাতে আদৌ মাথা ঘামায় না। সে মনের আনন্দে বিয়ার গিলছে। কিন্তু উইলির অনর্গল খোশমেজাজী আলাপে মেয়েটা গলে যায়।

"অনেক দিন থেকে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করে আসছি। জাদেন আপনাদের সম্বন্ধে আমাকে কত গল্প শুনিয়েছে, কিন্তু আপনাদের নিয়ে আসার কথা বললে উনি কিছুতেই তা শুনবেন না।"

"কি?" রোষ কষায়িত চোখে জাদেনের পানে তাকিয়ে উইলি বলে "আমাদের নিয়ে গেলে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে যেতাম। এই বদমায়েশটা কোন দিন এ কথা আমাদের বলেনি।"

জাদেন এবার অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। কসোল সামনে ঝুঁকে বলে, "তা হলে আপনার প্রিয়জন আমাদের কথা আপনাকে বলেছে? সে আমাদের সম্বন্ধে কি বলেছে?"

"এবার আমাদের যেতে হয় মেরিখেন।" জাদেন উঠে পড়তে উদ্যত হয়, কিন্তু কসোল জোর করে ঠেলে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। "এবার বলুন ত মহোদয়া ও আমাদের সম্বন্ধে সত্যি সত্যি কি বলেছে?"

এদের প্রতি মেরিখেনের মনে খুব আস্থা জেগেছে। সে লাজুক চোখে উইলির পানে তাকিয়ে বলে, "আপনিই কি হের হোমেয়ার?" উইলি

মাথা নত করে। "তা হলে আপনাকেই উনি বাঁচিয়েছিলেন।" সে বক-বক করতে থাকে আর জাদেন চেয়ারের উপর অস্থির হয়ে ওঠে, যেন পিঁপড়ার ঢিবির উপর বসে আছে। "নিশ্চয়ই আপনি তা ভুলে যাননি।" উইলি নিজের মাথায় হাত দিয়ে বলে, "এই ঘটনার পর আমি একবার চাপা পড়েছিলাম, তাতে আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যায়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আগের অনেক কথাই আমি ভুলে গেছি।"

"বাঁচিয়েছিলো?" কসোল উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে।

"মেরিখেন, আমি যাচ্ছি, তুমি যাবে কি থেকে যাবে?" জাদেন কঠোর কণ্ঠে বলে, কিন্তু কসোল তাকে ধরে রাখে।

"উনি এত লাজুক" বলে মেরিখেন খিলখিল করে হাসে। "প্রথম তিনজন নিগ্রো হের হোমায়েরকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। উনি এই তিনজনকে হত্যা করে তাকে বাঁচিয়েছিলেন। এই তিনজন নিগ্রোকে হত্যা করে উনি আপনাকে রক্ষা করে।"

মেরিখেন উইলির ছয় ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ দেহটার দিকে তাকিয়ে জাদেনের উদ্দেশে বলে, "তুমি যা করেছ তা বলতে দোষ কি প্রিয়তম?"

"না, নিশ্চয়ই কোন দোষ নেই।" কসোল তাকে সমর্থন করে বলে। "এমন কথা বলে দেয়াই উচিত।"

এক মুহূর্ত উইলি মেরিখেনের পানে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, "হ্যাঁ, জাদেন একজন চমৎকার মানুষ"—তারপর সে জাদেনকে ইশারা করে বলে, "এক মুহূর্তের জন্য আমার সঙ্গে বাইরে এসো।"

জাদেন সন্দিগ্ধ মনে ওঠে, তবে উইলির মনে কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই। কয়েক মিনিট পর দুইজন হাত ধরাধরি করে ঘরে ফিরে আসে। উইলি মেরিখেনের সামনে আনত হয়ে বলে, "তা হলে এই ঠিক হলো যে আমি কাল বিকেলে যাব। নিগ্রোদের হাত থেকে জাদেন যে আমাকে বাঁচিয়েছে সে জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। তবে আপনিও জেনে রাখুন যে আমিও আপনার ভাবী স্বামীকে রক্ষা করেছি।"

"না। সত্যি কি তাই?" মেরিখেন বিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

"সে-ই একদিন হয়ত আপনাকে সে কথা বলবে," উইলি হেসে বলে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জাদেন তার বাগদত্তাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

"আগামীকাল ওদের পশু জবাইর দিন।"—উইলি বলে। কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয় না। আমরা অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করেছি। এবার সবাই উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়ি। কসোলের হেসে হেসে পেটে খিল ধরে যায়। অনেকক্ষণ পর উইলি বলতে সক্ষম হয় যে, এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সে জাদেনের সাথে কত বড় একটা সুবিধাজনক চুক্তি সম্পাদন করেছে। চুক্তিটা হলো জাদেন রীতিমতন কাবাব সরবরাহ করবে। "আমি এই বেটাকে এবার হাতের মুঠোয় পেয়েছি।" উইলি দাঁত বের করে হাসে।

(৫)

সারাটা বিকেল বাড়ীতে বসে একটা কিছু করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই হয়ে উঠেনি। প্রায় এক ঘন্টা কাল আমি পথে পথে উদ্দেশ্য-হীন ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার এই ঘোরাফেরার সময় আমার চোখে নতুন রেস্তোরাঁটা পড়েছে—হোলানডিখে ডিয়েলে। গত তিন সপ্তাহে এই তৃতীয় রেস্তোরাঁ গজিয়ে উঠেছে। ব্যাঙের ছাতার মতন এসব রেস্তোরাঁ গজাচ্ছে। এই রেস্তোরাঁটাই সবচেয়ে বড় আর জাঁকালো।

আলো ঝলমল কাঁচের দরজার সামনে একজন বিরাট বপু দারোয়ান সোনালী পাতে মোড়া ব্যাটন হাতে দণ্ডায়মান। তার চোখে আমার চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মর্যাদাবোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে ব্যাটন দিয়ে আমার পেটে গুঁতো মেরে দাঁত কেলিয়ে বলে, "হ্যালো আর্নস্ট। এই কাক-তাড়ানো চেহারা নিয়ে এত দিন কোথায় ছিলে?"

এ যে কর্পোরেল এন্টন ডেমুথ। কিছু কাল আমাদের সার্জেণ্ট কুক বা বাবুর্চিখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলো। আমি তাকে চটপট সালাম দেই। সামরিক জীবনে আমাদের সর্বদা এ কথাই বলা হতো। সালাম উর্দিকে দিতে হবে। যে উর্দি পরে তাকে নয়। কিন্তু এখানে এই উর্দিকে সালাম দেয়ার মধ্যে আমার একটা চালাকি আছে।

"হ্যালো এন্টন।" আমি হেসে বলি। "এবার কাজের কথা হোক। খাবার মতন তোমার কাছে কিছু আছে?"

"আমি বাজি রাখছি", সে ইতিবাচক জওয়াব দেয়। "ফ্রাঞ্জ এলসটারম্যান—সেই যে ফ্রাঞ্জ—তার কথা মনে আছে? সেও এখানে আছে। সে-ই এখানকার বাবুর্চি।"

"আমি তা হলে কখন আসব বলে দাও।" আমি তাকে প্রশ্ন করি। কারণ তার এই কথাটাই একটা সুপারিশ। অথচ এলসটারম্যান আর ডেমুথ ছিলো খাদ্য সংগ্রাহকদের চাঁই।

"আজ রাত একটার পর।" এন্টন চোখ টিপে বলে, "আমরা খাদ্য দফতরের এক ইনস্পেক্টারের এক ডজন হাঁস বাগিয়েছি--চোরাই মাল। এলসটারম্যান আজ কয়েকটা কাটবে। যুদ্ধে এতলোক হতাহত হয় আর কয়েকটা হাঁস হতাহত হতে পারে না?"

"নিশ্চয়ই পারে।" আমি বলি, "আচ্ছা, ব্যবসায় কেমন চলছে?"
"প্রতিরাতে ঘর ভরা খদ্দের আসে। একবার ভেতরে তাকিয়ে দেখনা।"

সে পর্দাটা এক দিকে টেনে দেয়। আমি ফাঁক দিয়ে ভিতরে তাকাই। টেবিলের উপর স্নিগ্ধ আলোর জ্যোস্না ঝরছে। সিগারেটের নীলাভ ধুঁয়া ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝকঝকে কার্পেট পাতা, পরসেলিন আর রূপোর চকচকে বাসন পেয়ালা। মেয়েরা টেবিলে বসে খাচ্ছে। তাদের চার-পাশে পরিচারকেরা ঘুরে ঘুরে খাদ্য-পেয় পরিবেশন করছে। পাশাপাশি পুরুষ বন্ধুরা দিব্য আরামে তাদের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করছে। কি অদ্ভুত আত্ম অধিকারবোধ নিয়ে তারা খাবারের হুকুম দিচ্ছে।

এন্টন আমার পাঁজরে আবার একটা গুঁতো দিয়ে বলে, "কি হে ছোকরা, এদের একজনকে শয্যা সঙ্গিনী পেলে কেমন হয়?"

আমি নিরুত্তর। এই ঐশ্বর্যময় রঙিন জীবনের দৃশ্যে আমার হৃদয় মন অভিভূত। এই পরিবেশ প্রায় অবাস্তব অলৌকিক। আমি যেন স্বপ্ন দেখছি যে অন্ধকারে বরফাবৃত রাজপথে দাঁড়িয়ে পর্দার ফাঁকে এই দৃশ্য আমার চোখে পড়ছে। আমি মোহমুগ্ধ হয়ে যাই। যদিও আমি জানি, জনকয়েক মুনাফাখোর এখানে বসে তাদের ঐশ্বর্য উদগীরণ করেছে আর আমরা সীমান্ত পারের নোংরা কর্দম পরিখায় দিনের পর দিন কাটিয়েছি। কোন দিন আমাদের মনে বিলাস ব্যসনের আকাঙ্ক্ষা জাগার সুযোগ পায়নি। বিলাসিতারও কি আশ্রয়, পৃষ্ঠপোষকতা আর লালনের প্রয়োজন পড়ে না? এ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই ছিলো না।

"কি হে ছোকরা। কি ভাবছ? কোমল তুলতুলে মেয়ে মানুষের শয্যা-সঙ্গ কেমন লাগবে?" এন্টন জিজ্ঞেস করে।

আমি যেন বোকা বনে যাই। তাকে কি জওয়াব দেব তৎক্ষণাৎ ভেবে পাই না। এই ধরনের কথা আমি বহু বছর থেকে বলে আসছি। কিন্তু সহসা আজ যেন এসব কথা মার্জিত ও রুচিবিগর্হিত মনে হয়। ভাগ্য ক্রমে এন্টনকে আবার ধীর স্থির আর মর্যাদাবোধ সম্পন্ন হতে হয়। কারণ সেই ঠিক মুহূর্তে একটা গাড়ী এসে হাজির হয়। একজন তণ্বী তরুণী গাড়ী থেকে নেমে দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। সে সামনে আনত হয়ে এক হাতে তার পশুলোমের পোশাকটা বুকের উপর ধরে চলে। তার মাথার উজ্জ্বল কেশরাশি একটি সোনালী কাঁটায় আবদ্ধ। ছোট্ট পা, ছোট্ট একখানা মুখ। সে লঘুপদে আমার পাশ দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে একটা মৃদু সুবাস ছড়িয়ে চলে যায়। এই মধুময়ী তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার মনে জেগে ওঠে। এই আকাঙ্ক্ষা ঘরের অভ্যন্তরে বিরাজমান সুখৈশ্বর্যময় পরিবেশ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা। সেখানে গিয়ে পরিচারক বেষ্টিত স্বাধীন নির্ভাবনাময় জীবনোপভোগের আকাঙ্ক্ষা। এত বছরের নিত্যনৈমিত্তিক দুঃখ-দারিদ্র্য আর নোংরা জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

আমি হয়ত স্কুলের ছাত্রসুলভ ছেলে মানুষী করছি কারণ সহসা এন্টন তার দাড়ির ফাঁক দিয়ে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে। আমার পানে ধূর্ত চোখে চেয়ে একটা গুঁতো মেরে বলে "এরা রেশম আর সাটিনের পোশাক পরলেও বিছানায় শুইয়ে দিলে সবই এক।"

"স্বাভাবিক", এই কথা বলে আমি তার রসিকতায় যোগ দেই, যাতে সে আমার মানসিক চিন্তাধারা বুঝতে না পারে। "তা হলে রাত একটার পর দেখা হবে এন্টন।"

"কেন হবে না ?" সে গম্ভীর কণ্ঠে সাড়া দেয়।

পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে আমি ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াই। আমার পায়ের তলায় বরফ কচমচ করে ভাঙ্গে। ক্রোধে আমি লাথি মেরে তা সরিয়ে দেই। আচ্ছা ধরে নেয়া যাক, আমি এই রকম একটা মেয়ের সাথে আহারে বসি। তা হলেই বা আমার কি করার ক্ষমতা আছে ? বড় জোর আমি তার পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে পারি মাত্র। ভব্যতা রক্ষা করে খেতেও পারব না। একটা কিছু গোলমাল করে বসব। এমনি একটা জীবের সাথে সময় কাটানোও অত্যন্ত কঠিন। সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। কখন একটা ভুলত্রুটি করে বসব। আর রাতের বেলায় কেমন

করে সূচনা করতে হবে, সে সম্বন্ধে আমার ধারণাটুকু নেই। আমি মেয়ে মানুষ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ নই। জাপ আর ভ্যালেনটিনের কাছ থেকে আমি এই জ্ঞান অর্জন করেছি। তবে এমন মহিলার বেলায় আমার অর্জিত জ্ঞানে চলবে না।"

১৭১৭ সালের জুন মাসে আমি প্রথম নারী সাহচর্যের সুযোগ লাভ করি। আমাদের কোম্পানী তখন ফ্রণ্ট থেকে ফিরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে। দুপুর বেলা। উন্মুক্ত প্রান্তরে আমার দুটো কুকুর নিয়ে খেলা করছিলাম। বড় বড় কানওয়ালা ঘন উজ্জ্বল লোমওয়ালা জন্তু দুটো গ্রীষ্মের দুপুরে ঘাসের উপর ছুটোছুটি লাফালাফি করছিলো। সুনীল নির্মল আকাশ। যুদ্ধ সীমান্ত থেকে এই স্থান বহু দূরে অবস্থিত।

জাপ আর্দালি রুম থেকে ছুটে আসে। কুকুর দুটো তার উপর ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে কুকুর দুটোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চীৎকার করে বলে "এইমাত্র হুকুম এসেছে আজ রাতেই আমাদের এখানকার তল্পীতল্পা গুটিয়ে যুদ্ধ ফ্রণ্টে যেতে হবে।"

এই হুকুমের তাৎপর্য আমাদের জানা। পশ্চিম দিক চক্রবাল থেকে দিনের পর দিন শত্রুর আক্রমণের কামান গর্জনের ধ্বনি আমরা শুনতে পেয়েছি। দিনের পর দিন আমি ক্ষয়িত সৈন্য দলের প্রত্যাবর্তন প্রত্যক্ষ করেছি। সেখানকার হাল অবস্থা সম্বন্ধে তাদের কাউকে প্রশ্ন করলে তারা মুখে কোন জওয়াব না দিয়ে শুধু অঙ্গভঙ্গিতে তা ব্যক্ত করে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে দিনের পর দিন। ট্রাকভর্তি আহত সৈনিকের দল আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেছে আর দিনের পর দিন আমরা অনাগত মৃত দেহের দাফনের জন্য দীর্ঘ গর্ত খুঁড়েছি।

আমরা উঠে পড়ি। বেতকি আর ভেসলিং তাদের পোটলা পুটলি থেকে চিঠি লেখার কাগজ বের করে। উইলি আর জাদেন বাবুর্চিখানায়। জাপ আর ফ্রাঞ্জ ওয়াগনার তাদের সাথে বেশ্যালয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে ফুসলাতে থাকে।

"এ কেমন কথা আর্নস্ট," ওয়াগনার বলে। "যে মেয়ে মানুষ জিনিসটা কি, তা তুমি জানতে চাও না? কে বলতে পারে যে আগামী ভোরের আগেই আমাদের জীবন লীলার অবসান হবে না? আমার ধারণা শত্রু পক্ষ সীমান্তের ওপারে কামান গোলার স্তূপ মওজুদ করেছে। কৌমার্য নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মধ্যে কোন-যুক্তি নেই।"

ফৌজী বেশ্যালয় একটা ছোট্ট শহরে অবস্থিত, আমাদের এখান থেকে এক ঘন্টা হেঁটে সেখানে পৌঁছা যায়। আমরা সেখানে যাওয়ার অনুমতি পত্র পেলাম, অবশ্য সে জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। অন্যান্য রেজিমেন্টও যুদ্ধ ফ্রণ্টে যাওয়ার হুকুম পেয়েছে। তাই সে সব রেজি-মেন্টেরও অনেকে তাড়াহুড়ো করে অনুমতি পত্রের জন্য এসেছে। তারাও মৃত্যুর পূর্বে জীবনের যতটুকু সময় পারে একটু উপভোগ করে নিতে চায়। এক ছোট্ট অফিসে অনুমতি পত্র দেখিয়ে আমাদের উলঙ্গ হতে হয়। একজন আর্মি মেডিকেল কোরের কর্পোরেল আমাদের উলঙ্গ করে আ।াদের যোগ্যতা পরীক্ষা করে আমাদের প্রত্যেককে কয়েক ফোঁটা প্রটারগল ইনজেকসন দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে একজন সার্জেণ্ট মেজর জানিয়ে দেয় যে, শয্যা–সঙ্গের দর্শনী তিন মার্ক এবং কোন অবস্থায়ই কেউ সঙ্গম ক্রিয়ার জন্য দশ মিনিটের অতিরিক্ত সময় পাবে না। আমরা বেশ্যালয়ের সিঁড়িতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই। প্রার্থীর সারি ধীরে ধীরে সামনে এগোতে থাকে। সিঁড়ির মাথাটার দরজাটা দড়াম করে খোলে আর বন্ধ হয়। একজন বেরিয়ে এলেই পরবর্তী জনের ডাক পড়ে।

"ওখানে কয়টা গাভী আছে?" ফ্রাঞ্জ ওয়াগনার একজনকে জিজ্ঞেস করে।

"তিনটে," লোকটা জওয়াব দেয়। "তবে সেখানে বাছাবাছির সুযোগ পাবে না। এটা একটা ভাগ্য পরীক্ষা—ভাগ্য মন্দ হলে একজন দাদীর বয়েসী মেয়ে মানুষও তোমার কপালে জুটতে পারে।"

এই গরম আর ভ্যাপসা নিশ্বাসের গন্ধে আর খাদ্যাভাবে আধমরা সৈন্যদের চাপে সিদ্ধ হয়ে আমি অসুস্থ বোধ করি। এবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই যেন বেঁচে যাই। আমার কৌতূহল মিটে গেছে। কিন্তু এখান থেকে পালিয়ে গেলে অন্যরা আমাকে বিদ্রূপ করবে এই ভয়ে আমি অপেক্ষা করি।

অবশেষে আমার পালা আসে। আমার আগের লোকটা হোঁচট খেয়ে বাইরে আসতেই আমি ঘরে ঢুকে পড়ি। ঘরটা নীচু আর অন্ধকার। ঘরময় কার্বলিক আর ঘামের বোটকা গন্ধ। ঘরের অভ্যন্তরে সব কিছু জীর্ণ পুরান। কিন্তু ঘরের জানালার ঠিক বাইরে একটা গাছের ডালের তাজা সবুজ পাতায় সূর্যালোক আর বাতাসের মাতামাতি দেখে আমার অদ্ভুত লাগে। ঈষৎ লাল পানি ভরা একটা গামলা একটা চেয়ারের উপর রক্ষিত আর ঘরের এক কোণে একটা ক্যাম্প খাটের উপর

ছেঁড়া চাদর পাতা। সেখানে স্বচ্ছ সেমিজ পরা একজন স্থূলকায়া মেয়ে মানুষ। সে আমার পানে ফিরেও তাকায় না। সোজা গিয়ে খাটে শুয়ে পড়ে। কিন্তু আমি তার কাছে যাচ্ছি না দেখে অধৈর্য হয়ে আমার পানে তাকায়। তার ফোলা মুখের অভিব্যক্তিতে বোঝা যায় আমি যে কাঁচা সে তা লক্ষ্য করছে।

আমি কিছুতেই তার সান্নিধ্যে যেতে পারি না। ভীতি আর দমবন্ধ করা বমি বমি ভাব আমাকে পেয়ে বসে। সে আমার দেহে উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কুৎসিত অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে। এমন কি সে লাজুক হাসি হেসে আমাকে তার পাশে টেনে নিতেও চেষ্টা করে, যাতে আমি তার উপর সদয় হই। আসলে সে কি? একটা মাদুর মাত্র। যেখানে প্রতিদিন বিশ কি তার চেয়েও বেশী সংখ্যক সৈন্য শোয়। আমি তার পাশে দর্শনীটা রেখে দিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে নেমে যাই।

জাপ চোখ টিপে প্রশ্ন করে, "কি হে, কেমন হলো?"

"হলো এক রকম।" আমি অভিজ্ঞের মতন জওয়াব দেই। আমরা এবার এ স্থান ত্যাগ করি। কিন্তু না, এবার আমাদের আবার আমি মেডিকেল কোরের সেই কর্পোরেলের সামনে হাজির হতে হবে। তার দৃষ্টির সামনে প্রস্রাব করতে হবে। আমাদের আবার ইনজেকশন দেয়া হবে।

সুতরাং এই হলো প্রেম। আমি মৌন নৈরাশ্যে নিজের জিনিসপত্র গুছোতে গুছোতে আপন মনে ভাবি, এই প্রেমের কাহিনীই বাড়ীতে আমার বই পুস্তকে লেখা আছে। আর এই প্রেমের কল্পনাই আমার যৌবনের অস্পষ্ট স্বপ্নে আমি দেখেছি। আমি আমার গ্রেটকোট ভাঁজ করি; বিছানাপত্র গুটিয়ে নেই; আমার গোলাগুলি সংগ্রহ করি। তারপর সবাই সীমান্তের পথে রওয়ানা হই। বিষাদক্লিষ্ট মনে নীরবে চলতে চলতে আমি ভাবি, জীবনের রঙিন মধুর প্রেমের স্বপ্নগুলো কেমন করে শেষ হয়ে গেলো। আমার জীবনে শুধু রয়ে গেলো একটি রাইফেল, একজন স্থূলাঙ্গিনী বেশ্যার স্মৃতি আর দিক চক্রবাল থেকে আগত কামান গর্জনের একঘেঁয়ে ধ্বনি। আমরা সেই দিক চক্রবালের লক্ষ্যে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছি। তারপর আমাদের জীবনে আসে অন্ধকার আর মৃত্যু। ওয়াগনার সেই রাতেই নিহত হয়। আরো তেইশ জন সৈন্য সে রাতেই আমরা হারাই।

গাছ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা টপ টপ করে পড়ে। আমি আমার কলারটা উলটিয়ে দেই। এখনো আমার মনে স্নেহাদর প্রেমরাঙা আলাপ, উষ্ণ

পরিবেশ আর সহৃদয় ভাবাবেগের আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই কয় বছরের অমার্জিত একঘেয়ে জীবন থেকে আমি মুক্তি চাই। অতীতের মধুর বৈচিত্র্যময় দিনগুলো যদি আবার ফিরে আসে, কেমন হয়? আবার যদি সেই ছিপছিপে সুডোল সুন্দরী তরুণীর মতন কেউ আমাকে সত্যি ভালোবাসে তবে কেমন হবে? এমন কি, যদি কোন নীল রূপসীর রাত্রির মায়াময়তা আমাদের আনন্দে উদ্বেল করে তোলে তখনো কি শেষ পর্যন্ত সেই কুৎসিৎ স্থূলাঙ্গিনী বেশ্যাটার স্মৃতি আমাদের দুজনের আনন্দ উদ্বেলতার মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করবে না? ড্রিল সার্জেণ্টের অশ্রাব্য ভাষা কি সহসা কানে প্রবেশ করবে না? অতীতের অপ্রীতিকর স্মৃতি, টুকরো টুকরো কথা আর সামরিক জীবনের অশ্লীল রসিকতা কি হঠাৎ আমাদের সব নিটোল আনন্দ, সব মার্জিত ভাবাবেগ ধ্বংস করে দেবে না? আমরা এখনো কলুষমুক্ত আছি। কিন্তু আমাদের মনের অগোচরে আমাদের চিন্তাধারা কলুষিত হয়ে গেছে। প্রেম সম্বন্ধে আদৌ কোন অভিজ্ঞতা অর্জনের আগেই আমাদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দেখা হল, আমরা যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছি কিনা। সে পরীক্ষা করা হয়েছে। ষোল বছর বয়েসে কৈশোর-যৌবনের ক্রান্তি লগ্নে গভীর বিস্ময়বোধ, চাঞ্চল্য, আনন্দ, জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল নিয়ে আমরা এডেল আর অন্যান্য মেয়েদের পিছনে ছুটোছুটি করতাম। তা আর আমাদের জীবনে ফিরে এলো না। ফিরে এলো না সেই পুত পবিত্র পরিবেশ। আমি এমনি ভাগ্যহত।

সহসা মনের অজ্ঞাতসারে আমি দ্রুত চলতে থাকি। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস গভীরতর হয়ে ওঠে। আমার অতীতকে আবার ফিরে পেতে হবে। নিশ্চয়ই ফিরে পেতে হবে। আমি অতীতে ফিরে যাব; নইলে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না।

লুদভিগের বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হই। তার ঘরে এখনো একটা বাতি জ্বলছে। তার জানালা লক্ষ্য করে কয়েকটা ঢিল ছুঁড়তেই সে নীচে এসে দরজা খুলে দেয়।

তার ঘরে জর্জ রাহে লুদভিগের ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনের নমুনার বাক্স থেকে এক টুকরো স্ফটিক পাথর নিয়ে স্ফুলিঙ্গ বের করছে।

"তোমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দেখা হয়ে গেলো বলে খুব খুশী হয়েছি, আর্নস্ট।" সে হেসে বলে, "এই মাত্র তোমার বাড়ী থেকে ঘুরে এলাম। আমি কাল চলে যাচ্ছি।"

তার গায়ে উর্দি। আমি দ্বিধাখণ্ডিত কণ্ঠে প্রশ্ন করি। "কিন্তু জর্জ, তুমি কি সত্যি যাচ্ছ-------?"

"হ্যাঁ" সে ইতিবাচক মাথা নাড়ে। "সত্যি যাচ্ছি। আবার সৈনিক হতে চললাম। সব ঠিক ঠাক। কালই যাচ্ছি।"

"এর কাণ্ডকারখানাটা কিছু বুঝলে?" আমি লুদভিগকে প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ"। সে জওয়াব দেয়। "মনে হয় বুঝেছি। কিন্তু সে যা করছে তাতে তার কল্যাণ হবে না।" এবার সে রাহের পানে মুখ ফিরিয়ে বলে, "তোমার মোহমুক্তি ঘটেছে। এই তোমার অসুবিধের কারণ হয়েছে। একবার এক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখ। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাই কি স্বাভাবিক নয়? যুদ্ধ ফ্রন্টে সদা সর্বদা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর চাপ পড়তো। কারণ তখন যে-কোন মুহূর্তে আমাদের সামনে জীবন-মরণ সমস্যা দাঁড়াতো। এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। বাতাস থামার পর পালের যা অবস্থা হয়, তাই আমাদের হয়েছে। আমাদের জীবনের পালটা ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে। আর তা ছাড়া একটা সহজ কারণ হলো এখানে সবকিছু অতি মন্থর ও বেদনাদায়ক গতিতে এগোচ্ছে-----"

"ঠিক কথা," রাহে মেনে নেয়, "এই যে আহার আর বাসস্থান সংস্থানের জন্য অহরহ ঠেলাঠেলি তাতে আমার মনে ঘেন্না ধরে গেছে। তাই আমি এ থেকে মুক্তি চাই।"

"বেশ, এমন কিছু একটা করাই যদি তোমার ইচ্ছে, তবে বিপ্লবে যোগ দাও না কেন? তা হলে, তুমি হয়ত এক দিন সমর মন্ত্রীও হয়ে যেতে পার।" আমি রাহেকে বলি।

"আরে ছোঁ! এই বিপ্লব।" রাহে তাচ্ছিল্যের সুরে জওয়াব দেয়। এই বিপ্লব ত জনকয়েক পার্টি সেক্রেটারীর সৃষ্টি। তারা আরাম আয়েশে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আপন খেয়াল-খুশীতে এই বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। তারা এখন নিজেদের আস্পর্দায় নিজেরাই ভয় পেয়েছে। দেখতে পাচ্ছ না, তারা এবার একে অন্যের গলা কাটার জন্য কেমন লেগেছে! সোশ্যাল ডেমক্রেট, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট, স্পার্টাসিস্ট, কম্যুনিস্টরা ত দল সৃষ্টি করেছে। আর ইতিমধ্যে অন্যরা, তাদের মধ্যে যারা সত্যিকার ধীশক্তিসম্পন্ন আর বুদ্ধিমান, তাদেরকে নীরবে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের কাজে ব্যবহার করছে, অথচ বুদ্ধিমানেরা তা বুঝতে পারছে না।"

"না রাহে, তা নয়।" লুদভিগ বলে। "বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যে পরিমাণ ঘৃণা-বিদ্বেষের প্রয়োজন ঘৃণা-বিদ্বেষের সেই তীব্রতা আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়নি। আমাদের ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিলো নগণ্য। আসল কারণটা তাই। প্রথম থেকেই আমরা চেয়েছিলাম, কারো প্রতি অন্যায় করব না, সবার প্রতি ন্যায়পরায়ণ আচরণ করব। এটাই আমাদের ব্যর্থতার কারণ। সকল বিপ্লবের নীতি হলো, বিপ্লবের আগুনে সব ঝোপ-ঝাড় পুড়ে সাফ হয়ে গেলে অন্যরা এসে সে জায়গায় বীজ বপন করবে। কিন্তু আমরা কোন কিছু ধ্বংস না করে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম। ঘৃণা করার শক্তি আমাদের অবশিষ্ট ছিলো না ; যুদ্ধ আমাদের সব শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। যুদ্ধে আমরা ক্লান্ত আর জ্বলে পুড়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছি। ক্লান্ত দেহে গোলাগুলির মাঝখানেও ঘুমানো যায়, তা তুমিও জান। এখনো সময় আছে। যুদ্ধে যা হারিয়েছি কর্ম-সাধনা দ্বারা তা এখনো উদ্ধার করা যায়।"

"কর্ম-সাধনা।" জর্জ আবার তাচ্ছিল্যভরে বলে ওঠে। "যদি চাও আমরা যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু কাজ করতে পারিনা।" বাতির আলোতে তার হাতের স্ফটিকের টুকরোটা জ্বলজ্বল করতে থাকে।

"তা হলে নতুন করে আমাদের কাজ করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।" লুদভিগ সোফার কোণ থেকে শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দেয়।

"আমাদের মনোবল এতই ভেঙ্গে গেছে যে নতুন করে কাজ করার শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারব না।"

কতক্ষণ দুজনের কেউ কথা বলে না। জানালার বাইরে বাতাস শন শন করে বইছে। রাহে দীর্ঘ পদবিক্ষেপে লুদভিগের কামরায় পায়চারি করছে। মনে হচ্ছে, তার মন বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে যেন খাকি উর্দি পরিহিত সীমান্তের একজন সৈনিক। এবার আলো তার স্কন্ধদেশে পড়ে ; তার পিছনে স্ফটিকের টুকরো চকচক করে।

"আমরা এখানে কি করছি লুদভিগ?" সে ভেবেচিন্তে বলে। "তোমার চারদিকে চেয়ে দেখ। সব কেমন শিথিল ; কেমন নৈরাশ্যময়। আমরা নিজেদের বোঝা হয়েছি ; অন্যেরও বোঝা হয়েছি। আমাদের আদর্শ দেউলিয়া হয়ে গেছে ; আমাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আমরা স্বার্থান্বেষী আর মুনাফাখোরদের মাঝখানে ডন কুইকসটের মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি।"

লুদভিগ তার পানে কতকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, "জর্জ, আমার ধারণা আমরা অসুস্থ। যুদ্ধটা এখনো আমাদের মজ্জাগত হয়ে আছে।"

"হ্যাঁ," রাহে মাথা নাড়ে। "আর আমরা কোন মতেই এ থেকে নিস্তার পাব না।"

"এ বিশ্বাস মনে স্থান দিয়োনা। তা হলে যা করেছি সব মাটি হয়ে যাবে।" প্রত্যুত্তরে লুদভিগ খুব জোর দিয়ে বলে।

রাহে টেবিল চাপড়ে বলে, "লুদভিগ, সব ব্যর্থ হয়েছে, এই সত্যটাই আমাকে পাগল করেছে। ভেবে দেখ, আমরা যখন আমাদের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধে যাই তখন আমরা কি ছিলাম। তখন মনে হয়েছিলো একটা নবযুগের সূচনা হয়েছে; সব বাসি পুরানো, আর দলাদলি আবর্জনার মতন দূর হয়ে গেছে। আমরা তখন তরুণ। এমন তারুণ্য আগে আর কোন দিন জাগেনি।"

লুদভিগের সংগ্রহ থেকে একটা পাথর নিয়ে সে পাথরটা হাত বোমার মত ধরে। তার হাত কাঁপছে। "লুদভিগ, পরিখায় অনেক সময় কাটিয়েছি," রাহে বলে যায়, "আমরা তরুণেরা একটা নিস্প্রভ আলোতে প্রতীক্ষায় সময় কাটিয়েছি। আমাদের উপর দিয়ে ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। আমরা তখন অনভিজ্ঞ রঙরুট মাত্র নই। আমরা জানতাম কার জন্য প্রতীক্ষা করছি; আমরা আমাদের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম। বিপদের ভীষণতা সম্বন্ধেও আমরা অবহিত ছিলাম। কিন্তু সে দিন এই তরুণদের বাহ্যিক স্থৈর্যে রসিকতা আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি ছাড়াও অন্য কিছু ছিলো। তাদের বাহ্যিক আচরণের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রঙিন মধুর স্বপ্ন-সাধ; লড়াইয়ের মুখে মৃত্যু মুহূর্তেও সে ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি। আমরা নিজেদের জন্য কিছু চাইনি, বরং অনেক স্বার্থত্যাগ করেছি, কিন্তু আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমাদের মনে গোপনে অটুট ছিলো। কিন্তু লুদভিগ, এখন কোথায় গেলো আমাদের সেই স্বপ্ন সাধ? দেখতে পাচ্ছ না এখন আদেশ নির্দেশ, কর্তব্য, কর্মসূচী, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদির যাঁতাকলে কেমন করে আমাদের আশার অঙ্কুর শুকিয়ে যাচ্ছে? যাঁতাকলের এই নিষ্পেষণই আমাদের বর্তমান জীবন। না লুদভিগ, তখনই আমরা বেঁচেছিলাম। সে বাঁচায় প্রাণ-প্রাচুর্য ছিলো। তুমি হাজার বার বলতে পার যে তুমি যুদ্ধ ঘৃণা কর। কিন্তু আমি বলব যুদ্ধেই আমরা প্রাণ নিয়ে বেঁচেছিলাম। সে জীবনে প্রাণ ছিলো, কারণ আমরা সেখানে

একসঙ্গে ছিলাম; আমাদের বুকে আশার আগুন জ্বলতো। সে জীবন বর্তমান জীবনের আবর্জনার স্তূপ থেকে অনেক ভালো ছিলো।"

তার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সে বলে যায়, "আমার এই হতাশার কারণ আছে লুদভিগ'। যখন প্রথম শুনলাম যে বিপ্লব শুরু হয়েছে, তখন এক মুহূর্তের জন্য ভাবলাম, এবার অতীতের ব্যর্থ দিনগুলোর পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে, এবার প্লাবনের ধারা পুরানো সবকিছু ভেঙেচুরে নতুন পথ রচনা করে উল্টো দিকে বইবে। প্রভুর দিব্যি, আমি এই বিপ্লবে শরীক হব। কিন্তু বিপ্লবের ধারা হাজার পথে বিভক্ত হয়ে গেলো; বিপ্লব ছোট বড় চাকরির বাড়াবাড়িতে পর্যবসিত হলো। বিপ্লবের ধারা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে এলো। এই ধারা স্তিমিত হয়ে ব্যবসায়িক, পারিবারিক, আর দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের পন্থায় পরিণত হলো।' কিন্তু এই বিপ্লবে আমার পোষাবে না। তাই যেখানে সাথীত্ব পাওয়া যায়, আমি সেখানে যাচ্ছি।"

লুদভিগ উঠে দাঁড়ায়। চোখ তার রক্তবর্ণ। সে রাহের মুখের পানে সোজা তাকিয়ে বলে "কেন তা হলো জর্জ? কেন এমন হলো? তার কারণ, আমরা প্রতারিত হয়েছি। আমি বলছি, আমরা প্রতারিত হয়েছি। কিন্তু এখনো আমরা তা বুঝতে পারছিনা, তার কারণ আমাদের অপব্যবহার করা হয়েছে, জঘন্যভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে। তারা আমাদের মুখে বলেছিলো যে পিতৃভূমির জন্য আমাদের লড়তে হবে। কিন্তু তাদের পরিকল্পনাটি অন্যের শিল্প কারখানা হস্তগত করা। তারা মুখে বলেছিলো যে মর্যাদার জন্য লড়তে হবে, কিন্তু আসলে তারা চেয়েছিলো বিবাদ আর মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাশী কূটনৈতিক আর রাজপুরুষের ক্ষমতা লাভের অধিকার। তারা মুখে বলেছিলো যে জাতির স্বার্থে যুদ্ধ করতে হবে, কিন্তু আসলে তারা চেয়েছিলো জনকয়েক বেকার জেনারেলকে কর্মে নিয়োজিত করতে।" এই বলে সে রাহের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়, "তুমি তা দেখতে পাচ্ছ না? তারা দেশপ্রেম কথাটাকেই বিনিয়ে বিনিয়ে চমৎকার ভাষার রঙে রাঙিয়ে তাতে তাদের গৌরবাকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতার লোভ, কল্পনা বিলাস, নির্বুদ্ধিতা, ব্যবসায়িক স্বার্থ মিশিয়ে আমাদের সামনে একটা মনোহর আদর্শ রূপে তুলে ধরেছিলো। আমরা ভেবেছিলাম, তারা আমাদের এক মহত্তর জীবনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা তাদের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আমাদের প্রতিটি গুলি আমাদের কারো না কারো দেহ বিদ্ধ করেছে। তুমি কি তা দেখতে

পাচ্ছ না? তা হলে আমি তোমার কানে চিৎকার করে বলছি, প্রতিটি দেশের প্রতিটি তরুণ এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো যে তারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। এমনি করে প্রতিটি দেশের তরুণ সমাজ প্রতারিত ও অপব্যবহৃত হয়েছে; প্রতিটি দেশে তারা গুলি খেয়ে মরেছে; একে অন্যকে নির্মূল করেছে। এখন আমাদের জন্য একটি মাত্র যুদ্ধ আছে। মিথ্যা, অর্ধ সত্য, আপোষ এবং পুরানো জীবন ধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আমরা তাদের কথার মনোহারিত্বে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে তাদের অনুকূলে যুদ্ধ করেছি। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় যুদ্ধ করছি, কিন্তু আসলে সে যুদ্ধ ছিলো ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে। এমনি করে আমাদের ভবিষ্যৎ মরে গেছে; যে তরুণ শক্তি সে যুদ্ধে লড়েছিলো সে তরুণ শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমরা যারা বেঁচে আছি তারা সেই তারুণ্যের ভগ্নাবশেষ মাত্র। কিন্তু যারা আমাদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলো—সেই ভুঁড়িওয়ালা প্রাচুর্যের অধিকারী পরিতৃপ্তের দল——তারা আরো ভুঁড়ি বাগিয়ে আরো প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে, আরো পরিতৃপ্তি নিয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু কেমন করে? কারণ অতৃপ্ত একাগ্রচিত্ত ঝটিকা বাহিনী এ জন্য প্রাণাহুতি দিয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখ, একটা বংশানুক্রম ধ্বংস হয়ে গেলো। মোহমুগ্ধ একটা আশাবাদী, আত্ম-প্রত্যয়ী, শক্তিধর ও সুস্থ সমর্থ পুরুষানুক্রম পরস্পরকে গুলি করে হত্যা করেছে, যদিও বিশ্বব্যাপী সমস্ত তরুণ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন।"

তার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যায়। তার চোখে ভাবাবেগ আর অশ্রু দেখা দেয়। আমরা তিনজনই তখন দাঁড়িয়ে আছি। আমি আমার বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলি "লুদভিগ।"

রাহে তার টুপিটা হাতে নিয়ে স্ফটিকের টুকরোটা বাক্সের ভিতর রেখে দিয়ে বলে, "বিদায় লুদভিগ, বিদায় পুরানো বন্ধু আমার।"

লুদভিগ ঠোঁট চেপে তার মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারপর ভাঙ্গা গলায় বলে, "তা হলে তুমি যাচ্ছ রাহে। কিন্তু আমি রয়ে গেলাম; আমি এখনো আশা ত্যাগ করিনি।"

রাহে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে। "কোন আশা নেই।" কথাটা শান্ত কণ্ঠে বলে সে তার কোমর বন্ধের বাকলেসটা ঠিক করে নেয়।

আমি রাহের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই। দরজার ফাঁক দিয়ে উপরে অরুণোদয় উঁকি দিচ্ছে। আমাদের পদক্ষেপে সিঁড়িটা প্রতিধ্বনি

করে। আমরা যেন পরিখা থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়াই। জনহীন ধূসর পথ। পথের রেখা বহুদূর চলে গেছে। রাহে পথের পানে ইশারা করে বলে, "আর্নস্ট, এই দেখ সুদীর্ঘ পরিখা যুদ্ধ। এখনো চলছে—নোংরা বীভৎস যুদ্ধ—আপন জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-----"

আমরা করমর্দন করি। আমি রুদ্ধবাক। রাহে হাসে। "তোমার হলো কি আর্নস্ট? এখনত পূর্ব সীমান্তে আর যুদ্ধ হচ্ছে না, তা তুমি জান। আনন্দ কর। আমাদের সৈনিক জীবনে এই ত আমাদের প্রথম ছাড়াছাড়ি নয়----"

"আমার মনে হয়, জীবনে এই প্রথম আমাদের সত্যিকার ছাড়াছাড়ি হলো।" আমি চট করে জওয়াব দেই।

সে সেখানে আমার মুখোমুখি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পথ ধরে এগিয়ে যায়। একবারও ফিরে তাকায় না। তার বিদায় নেবার পরও কতদূর পর্যন্ত তার পদধ্বনি শুনতে পাই; তারপর সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

উপর থেকে নির্দেশ এসেছে যে যুদ্ধফেরত ছাত্রদের পরীক্ষার বেলায় কড়াকড়ি হবে না। তারা যে বিষয়ে আগ্রহী কেবল সে বিষয়েই পরীক্ষা দিতে পারবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যে বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী সে বিষয়টা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই আমরা আমাদের ইচ্ছামত ব্যাপারটাকে সহজ করে নেই। প্রত্যেকেই প্রতি বিষয়ে দুটো করে প্রশ্ন দাখিল করবে আর সে দুটো প্রশ্নেরই উত্তর দেবে। ওয়েস্টারহোল্ট শিক্ষকের আসনে বসে আছে। তার সামনে ডেস্কের উপর কয়েক পাতা সাদা কাগজে আমাদের নাম লেখা আছে। আমরা প্রত্যেকে তাঁকে দুটো করে প্রশ্ন লিখিয়ে দেই। এই দুটোর উত্তরই আমরা দিতে চাই।

উইলি অসাধারণ খুঁতখুঁতে। সে তার ইতিহাসের বইয়ের পাতা উল্টিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর নিম্নলিখিত দুটো প্রশ্ন ঠিক করে, "জামার যুদ্ধ কখন হয়েছিলো? এবং অটো দি লেজির রাজত্ব কাল কখন?"

ওয়েস্টারহোলট আর আলবার্ট প্রশ্নের তালিকা নিয়ে কয়েকজন শিক্ষকের কাছে যায়। তারপর তারা প্রিন্সিপালের সামনে হাজির হয়। প্রিন্সিপাল তাদের পানে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকান। আমাদের কাছ থেকে ভালো কোন কিছু তিনি আশা করতে পারেন না। প্রশ্নের তালিকাটা পড়ে বিরক্ত হয়ে এক পাশে রেখে দিয়ে তিনি বলেন "কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের ইচ্ছা যে তোমরা এমন বিষয় বেছে নেবে যাতে তোমাদের আগ্রহ আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষ কোন শাখা সম্বন্ধে পরীক্ষা দিতে হবে; কিন্তু তোমরা যে তালিকা দাখিল করছে তা ত অতি সহজ।"

"আমাদের আগ্রহের ক্ষেত্র এর চেয়ে বৃহত্তর নয়।" আলবার্ট জওয়াব দেয়।

প্রিন্সিপাল প্রশ্নের তালিকাটা ফেরত দিয়ে বলেন, "না, আমি এতে রাজী হতে পারিনা। তাতে সমস্ত পরীক্ষাটাই একটা প্রহসন হবে।"

"আসলে তাই নয় কি?" ওয়েস্টারহোলট হেসে জওয়াব দেয়। প্রিন্সিপাল কাঁধ ঝাঁকুনি দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তালিকাটা গ্রহণ করেন।

দুর্ভাগ্যবশত রচনা পরীক্ষার দিন উইলি দু ঘন্টা বিলম্ব করে আসে। আগের রাত সে কার্লের সাথে খুব মদ খেয়েছে। হোলারম্যান এ নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়ে। সে উইলিকে জিজ্ঞেস করে ঠিক সময়ে পরীক্ষার উত্তর লিখে শেষ করতে পারবে কিনা। উইলি আত্মবিশ্বাসী। সে নিজের জায়গায় বসে পকেট থেকে লুদভিগের লিখে দেয়া রচনাটা বের করে সামনে রেখে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়। সে এমনি বেসামাল হয়ে আছে যে ধর্ম বিষয়ে পরীক্ষার বেলায় ভুলে জীবতত্ত্বের জওয়াব দিয়ে দিতে উদ্যত হয়। শেষ পর্যন্ত আলবার্ট তার ভুল সংশোধন করে দেয়।

মৌখিক পরীক্ষার বিরাম কালের ফাঁকটুকু আমরা কাজে লাগাই। আমরা এই সময় স্ক্যাট খেলি। সেনা বাহিনীতে আমরা তাসের এই খেলাটা শিখে সময়ের সদ্ব্যবহার করেছি। মৌখিক পরীক্ষার জন্য যখনই কারো ডাক পড়ে, তখনই সে তার হাতের তাস রেখে দিয়ে পরীক্ষা দিতে যায়। ফিরে এসে আবার খেলায় যোগ দেয় বা বিশ্বস্ত কারো হাতে খেলার দায়িত্ব ন্যস্ত করে পরীক্ষা দিতে যায়।

আমরা অবশ্য সবাই পাশ করি। আমাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় প্রিন্সিপাল সাহস করে আমাদের কয়েকটা মনোরম সদুপদেশ দেয়ার সুযোগ ছাড়তে পারেন না। আমাদের স্কুল ত্যাগের উপলক্ষটাকে তিনি একটা গম্ভীর আনুষ্ঠানিক ব্যাপার করতে চান। তিনি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন যে পরীক্ষায় পাশ করে আমাদের কঠোর শ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা এসব শুভেচ্ছা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। "পরীক্ষায় পাশ করা কথাটা আমাদের বেলায় খুব উপযুক্ত নয়।" উইলি বাধা দিয়ে বলে, "ইতিমধ্যেই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পাশ করে এসেছি।" প্রিন্সিপাল বুঝতে পারেন যে নরম কথায় তুষ্ট হওয়ার পাত্র আমরা নই; আমাদের মতন অকৃতজ্ঞদের সংগে সদ্ভাব স্থাপন সম্ভব নয়।

আমরা স্কুল ছেড়ে নিজের পথ ধরি। আমাদের পরবর্তী দলের পরীক্ষা তিন মাস পরে হবে। লুদভিগকে সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যদিও সে কমসেকম আমাদের তিনজনের প্রশ্নোত্তর লিখে দিয়েছে। কিন্তু সংসারের প্রাথমিক নিয়ম এই—প্রত্যেককেই আপন খাটুনি খাটতে হবে। এ শুধু শক্তি সামর্থ্যের প্রশ্ন নয়।

পরীক্ষার কয়দিন পর শিক্ষানবীশ হিসেবে আমাদের পার্শ্ববর্তী গায়ে শিক্ষকতা করতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এতে আমি খুব খুশী। ভবঘুরে জীবনে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। এতে মনে শুধু নৈরাশ্য আর বিষণ্ণতাই জন্মে। আমি এবার কাজ করব।

আমার জিনিসপত্র ট্রাঙ্কে গুছিয়ে আমি উইলির সঙ্গে যাত্রা করি। ভাগ্যক্রমে পাশাপাশি গাঁয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। দু গাঁয়ের মধ্যে মাত্র ঘন্টা খানেকের দূরত্ব।

একটা পুরান খামার বাড়ীতে আমার বাসস্থান নির্ধারিত হয়েছে। জানালার বাইরে বৃক্ষ রয়েছে। পশুশালা থেকে ভেড়ার ডাক শোনা যায়। খামারওয়ালার স্ত্রী কালবিলম্ব না করে আমাকে একটা আরাম কেদারায় বসিয়ে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দেয়। তার ধারণা, শহরবাসীরা পেট ভরে খেতে পায় না। আর আসলে কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। একটা রুদ্ধ আবেগে আমি ভূঁড়িভোজের উপাদানগুলোর পানে চেয়ে থাকি। এই পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী দিয়ে একটা পুরো কোম্পানীকে খাওয়ানো যায়।

আমি খেতে বসি। বাড়ীর কর্ত্রী কোমরে হাত দিয়ে সানন্দে আমার পানে চেয়ে থাকে। প্রায় এক ঘন্টায় আহার শেষ করে আমি উঠে পড়ি, কিন্তু তবু তিনি আরো খেতে আমাকে পীড়াপীড়ি করেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য উইলি এসে হাজির হয়। আমি গৃহকর্ত্রীকে বলি, "এবার আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হবে। এবার আপনি দেখতে পারেন খাওয়ার ব্যাপারে আমি তার কাছে তুচ্ছ।"

উইলি সৈনিকসুলভ কাজ করে। আনুষ্ঠানিকতায় কালক্ষেপ না করে কাজে লেগে যায়। সে গৃহকর্ত্রীর আমন্ত্রণে গমের কেক দিয়ে শুরু করে। পনির পর্যন্ত এগোলে গৃহকর্ত্রী খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণের আলমারীতে হেলান দিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে উইলির পানে চেয়ে থাকে। উইলি যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। খুব তুষ্ট হয়ে তিনি উইলির জন্য আর একটা বড় বাসন-ভর্তি পুডিং এনে দেন। উইলি তাও খেয়ে শেষ করে। একটু বিশ্রাম নিতে নিতে হাতের চামচ হাতে রেখেই বলে "এবার সত্যিকার ক্ষিদে লাগছে। এবার এক পেট সাধারণ খাওয়া পেলে কেমন হয়?"

এই কথা বলে সে মাদার শমেকারের মন চিরদিনের জন্য জয় করে নেয়।

বিব্রতবোধ আর আত্মপ্রত্যয়হীন মনোভাব নিয়ে আমি শিক্ষকের ডেস্কে যাই। আমার সামনে চল্লিশটি শিশু। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এরাই বয়েসে সব চেয়ে কম। এরা সারিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট। তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত তাদের শ্লেট পেনসিল এখন কলম রাখার বাক্সের উপর, আর খাতা পুস্তক তাদের সামনে রয়েছে। স্কুলে তিনটি মাত্র শ্রেণী। তাই প্রত্যেক শ্রেণীতেই বিভিন্ন বয়েসের ছাত্র-ছাত্রী আছে। সবচেয়ে যে ছোট তার বয়েস সাত আর সব চেয়ে বড় যে তার বয়েস দশ।

মেঝেতে কাঠের জুতো ঘষার খড় খড় শব্দ হচ্ছে। একটা অঙ্গারের উনুন পটপট শব্দ করছে। কোন কোন ছাত্র গলায় পশমী মাফলার জড়িয়ে হাতে চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে দুই ঘন্টার পথ হেঁটে স্কুলে এসেছে। তাদের জিনিসপত্র ভিজে গেছে। সেগুলো এখন ঘরের শুকনো বাতাসে শুকোচ্ছে।

ছোট বাচ্চারা আমার পানে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। দুটো মেয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে খিল খিল করে হাসছে। একটা সুন্দর চুলওয়ালা বাচ্চা নাক চুলকোচ্ছে। আর একটা ছেলে তার সামনে উপবিষ্ট ছেলেটার আড়ালে বসে রুটি মাখন খাচ্ছে; কিন্তু প্রত্যেকেই আমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করছে।

আমি মানসিক অস্বস্তি নিয়ে আমার আসনে বসি। মাত্র কিছু-কাল আগে আমিও এদের মতন ক্লাসে বসে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন কবিদের সম্বন্ধে হোলারম্যানের অলঙ্কারবহুল নীরস বক্তৃতা শোনতাম। এখন আমি স্বয়ং হোলারম্যানের ভূমিকা গ্রহণ করেছি। অন্তত এই বাচ্চাদের কাছেত বটেই।

"শোন বাচ্চারা। আমরা এবার ব্ল্যাকবোর্ডের উপর বর্ণমালা লিখতে শিখব।" বলে আমি ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে বর্ণমালা লিখি।

আমি অক্ষরগুলো বড় বড় করে খড়িমাটি দিয়ে লিখি। আমার পিছনে খনখন শব্দ শুনতে পাই। আমি আশা করছি যে তারা আমাকে লক্ষ্য করে হাসছে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখি যে খাতা খোলা আর যথাস্থানে শ্লেট রাখার প্রস্তুতি চলছে। চল্লিশটা মাথা তাদের ডেস্কের উপর আজ্ঞানুবর্তিতা সহকারে ঝুঁকে আছে। তাদের এই ব্যবহারে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। শ্লেট পেনসিলের কচ কচ আর কলমের খস খস শব্দ হচ্ছে। আমি ক্লাসে ঘুরে ঘুরে দেখি।

ঘরের দেয়ালে একটা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি, একটা পেচকের ছবি আর জার্মানীর একটা মানচিত্র ঝুলছে। জানালার বাইরে মেঘের দল ধীরে ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে।

জার্মানীর মানচিত্রটা বাদামী আর সবুজ রঙে রঙ করা। আমি মানচিত্রটার সামনে দাঁড়াই। সীমান্ত রেখা লাল রঙে দেখানো হয়েছে। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত অদ্ভুত আঁকাবাঁকা। কলোন আচেন-রেল লাইনটা ক্ষীণ কালো রেখায় চিহ্নিত। হার্বেসথল, লিয়েজ, ব্রুসেলস—লিলি—আমি এবার গোড়ালীর উপর দাঁড়াই—এই ত আরাম ওস্টেন্টভ—তা হলে ,মাউন্ট কেমেলটা কোথায়? এটা আদৌ চিহ্নিত হয়নি। কিন্তু ল্যাঙ্গোমার্ক ইপরিস. স্টাডেন রয়েছে—কত ক্ষুদ্র করে চিহ্নিত হয়েছে, অথচ ৩১ জুলাই সেই মহা আক্রমণের দিবসে এই স্থানটা প্রচণ্ড গোলাবারুদের বজ্র নির্ঘোষে প্রকম্পিত হয়েছিলো। সেখানে রাত্রি ভোর হওয়ার আগে আমরা আমাদের প্রত্যেকটি অফিসারকে হারিয়েছিলাম-------

আমি মুখ ফিরিয়ে সুকোমল ছাত্রছাত্রীদের পানে তাকাই। তারা অতি উৎসাহে মাথা নুইয়ে বর্ণমালা লিখে যাচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার। এদের কাছে এই ক্ষুদ্র বিন্দুগুলোর বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। এগুলো কয়েকটা স্থানের নাম মাত্র আর তারিখগুলো অন্যান্য যুদ্ধের তারিখের মতন ইতিহাসের পাতা থেকে তারা লিখে নেবে।

দ্বিতীয় সারির একটা ছেলে হাতের খাতাটা শূন্যে তুলে এক লাফে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে তার লেখা শেষ করেছে। আমি তার কাছে গিয়ে তাকে দেখিয়ে দেই যে তার অক্ষরে একটা টান লম্বা হয়ে গেছে। সে তার নীল তরল চোখ দিয়ে এমনভাবে আমার পানে তাকায় যে আমি চোখ নামিয়ে নেই। আমি তাড়াতাড়ি ব্লাক বোর্ডে দুটো নতুন কথা লিখে দিতে যাই। প্রথম কার্ল লিখে থেমে যাই, কিন্তু আর কোন কথা লিখতে পারি না। কোন এক অদৃশ্য হস্ত যেন খড়িমাটি চালিয়ে লিখে দেয় "মাউন্ট কেমেল।"

"কার্ল কি বলত?" আমি প্রশ্ন করি।

সবাই হাত তোলে। একজন বলে "একটা লোক।"

"মাউন্ট কেমেল?" প্রায় আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করি। সবাই নীরব। অবশেষে একটি মেয়ে হাত তোলে। "এই কথাটা বাইবেলে আছে।" মেয়েটা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে। আমি তার পানে

এক মুহূর্ত চেয়ে বলি, "না, জওয়াবটা ঠিক হলো না; তুমি হয়ত মাউন্ট অব অলিভ বা লেবানন বলতে চাও। তাই না?"

মেয়েটা মনমরা হয়ে মাথা নাড়ে। আমি তার মাথায় হাত বুলোই। তা হলে আমরা এবার এই কথাগুলোই শিখব। "লেবানন কথাটা বড় সুন্দর।"

চিন্তিত মনে আমি আবার ক্লাসে টহল দিতে থাকি। মাঝে মাঝে বাচ্চাদের খাতার দিকে তাকাই। তাদের মুখে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ধরি। অধিকাংশই সরল সাধারণ, কেউ কেউ চতুর এবং অন্যরা সব বোকা। কিন্তু অল্প কয়েকজনের চোখেমুখে দীপ্তির ছটা। এই অল্প কয়জনের ভবিষ্যৎ সুস্পষ্ট নয়। তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সহজ নির্ঝঞ্ঝাট গতিতে চলবে না।

সহসা একটা নৈরাশ্যানুভূতি আমাকে অভিভূত করে ফেলে। আমি মনে মনে ভাবি, শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি হবে। একদিন তাদের শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটবে। তারপর তারা মহাকালের সাঁড়াশি আক্রমণের শিকার হবে। এই আক্রমণ কারো বেলায় হবে নীরব, কারো বেলায় হিংস্র, কারো বেলায় মৃদু আর কেউ হবে এই আক্রমণে ছিন্নভিন্ন। প্রত্যেকের জীবন স্বীয় নিয়তির বিধানে নিয়ন্ত্রিত হবে। আমার শিক্ষকতা তখন তাদের কি সাহায্য করতে পারবে? এই শিক্ষা তাদের কি কাজে লাগবে? জার্মানীর সমস্ত নদ নদীর নাম মুখস্থ করে কি হবে? চল্লিশ জন ছাত্র-ছাত্রীর জীবন আমার সামনে পিছনে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে। আমার ক্ষমতা থাকলে কত আনন্দে আমি তোমাদের জীবন পথে তোমাদের সাহায্য করতাম। কিন্তু পৃথিবীতে কে কাকে সত্যিকার সাহায্য করতে পারে? আমি কি এডলফ বেতকিকে কোন দিন সাহায্য করতে পেরেছি? ঘন্টা বাজে। প্রথম ঘন্টার পড়া শেষ হয়।

পরদিন আমরা আমাদের লম্বা ঝুলওয়ালা সোয়ালো-টেল কোট পরিধান করি। আমার কোটটা কোন মতে ঠিক সময়ে তৈরী হয়েছে। আমরা স্থানীয় পাদরীর সংগে সাক্ষাৎ করতে যাই। এটা একটা ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপার।

আমাদের বেশ সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়; যদিও তাতে কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিলো। কলেজ জীবনে আমাদের অবাধ্যতা আমাদের সুখ্যাতিকে অভিজাত মহলে সন্দেহজনক করে দিয়েছিলো। বিকেল বেলায় মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটা শেষ করতে চাই। এটাও

কর্তব্য পালনের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের সরাইখানায় তার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। এখানে পোস্ট অফিসের কাজকর্মও সম্পাদিত হয়।

তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ খামার মালিক। মুখাবয়বে বলিরেখা দেখেই মনে হয় ধূর্ত স্বভাব। সাক্ষাৎ মাত্র তিনি মদ্যপানের আমন্ত্রণ জানান। তারপর আরো দু তিনজন খামার মালিক আমাদের অভ্যর্থনা জানায়,। এই বোকার দল তাদের হাতের আড়ালে চোখ টিপাটিপি আর মুখভঙ্গি করে। আমরা তৎক্ষণাৎ তাদের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারি----। তারা আমাদের মাতাল করে একটু রসিকতা উপভোগ করতে চায়। মনে হয় তারা আগেও মাঝে মধ্যে এ কাজ করে সফল হয়েছে। তারা বোকার মতন হাসাহাসি করে বলে দেয় যে আগেও কতিপয় তরুণ শিক্ষক এমনিভাবে সরাইখানায় এসেছে। তিনটি কারণে তারা আমাদের উপর টেক্কা মারার আশা করছে। তার কারণগুলো হলো প্রথম তাদের ধারণা শহুরে লোকেরা তাদের মতন অধিক পরিমাণ মদ্য পান করতে পারে না, দ্বিতীয় স্কুল শিক্ষকেরা শিক্ষিত লোক, তাই তাদের দেহ দুর্বল; আর তৃতীয় আমাদের মতন অল্প বয়স্ক ছেলে-ছোকরারা মদ্য পানে খুব অভ্যস্ত নয়। এখানকার প্রাক্তন শিক্ষানবীশ শিক্ষকদের বেলায় তা হতে পারে। কিন্তু আমরা কয়েক বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করে শিখে এসেছি কেমন করে মগ-ভর্তি মদ পান করতে হয়। এই কথাটা তারা হিসেব করে দেখেনি। আমরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান গ্রহণ করি। খামার মালিকেরা আমাদের বোকা বানাতে চায়, কিন্তু আমরা আমাদের সম্মান রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের এই সঙ্কল্প আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করে।

মেয়র, গাঁয়ের কেরানী আর কয়েক জন তাগড়া জোয়ান খামার মালিক আমাদের সামনে বসে। স্পষ্টই মনে হয় এরা সেখানকার সর্বজন স্বীকৃত সেরা মদ্যপ। মৃদু ধূর্ত হাসি হেসে তারা আমাদের গ্লাসের সাথে গ্লাস ঠুকাঠুকি করে। উইলি এমনি ভাব দেখায় যে সে যেন বেশী খুশী। তাদের হাসির মাত্রা বেড়ে যায়।

উইলি আর আমার তরফ থেকে বিয়ার স্যাম্পেনের সংমিশ্রণে এক চক্কর পরিবেশন করা হয়। এবার অন্যরা সাত চক্কর পরিবেশন করে। তারা মনে করে যে তাতেই আমরা কাবু হয়ে যাব। আমরা গ্লাস শূন্য করছি দেখে তারা কিছুটা বিস্মিত হয়, তবে তাদের দৃষ্টিতে অনুমোদনাত্মক হাসিও লক্ষিত হয়। উইলি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে নতুন চক্করের হুকুম দেয়।

সে মদ্য পরিবেশককে ডেকে বলে এবার কিন্তু বিয়ার নয়, বিশুদ্ধ স্যাম্পেন চাই।"

"বিশুদ্ধ স্যাম্পেন?" মেয়র বলে।

"নিশ্চয়ই," উইলি শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দেয়, "নইলে সকাল পর্যন্ত এখানে আমাদের বসে থাকতে হবে। বিয়ার ত মানুষকে অপ্রমত্ত করে দেয় মাত্র।"

মেয়রের চোখের বিস্ময় দৃশ্যতঃ কেটে যায়। একজন মদ্যপ জড়িত কণ্ঠে স্বীকার করে যে আমরা প্রচুর পরিমাণ মদ খেতে পারি। অন্য দুজন নীরবে সরে পড়ে। আমাদের বিরোধী পক্ষের দু একজন ইতিমধ্যেই আমাদের অলক্ষ্যে টেবিলের নীচে গ্লাস শূন্য করার চেষ্টা করছে। কিন্তু উইলি নজর রাখছে যাতে কেউ অপকর্মটা করতে না পারে। সবার হাত টেবিলেব উপর। সে জেদ করে। তারা তাদের গ্লাস ঠোঁটে ধরে। তাদেব মুখের হাসি উবে গেছে। আমরা জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

এক ঘন্টার মধ্যেই তাদের অধিকাংশই মেঝেতে গড়াগড়ি করতে থাকে বা অপমানিত বোধ নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত টেবিলে মেয়র আর গাঁয়ের কেরানী ছাড়া আর কেউ নেই। এবার এই দুজন আর আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে অবশ্য আমাদের দুজনের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, কিন্তু অন্য দুজনের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। আমবা তাতে উৎসাহিত বোধ করি।

আর আধ ঘন্টা পর আমার চোখ মুখ যখন লাল হয়ে উঠেছে তখন উইলি তার শেষ চাল চালে। সে বিয়ারের মগে চার মগ কগনেক মদের হুকুম দেয়। মেয়র তার চেয়ারে বসে পড়ে। হুকুম মত মদ পরিবেশিত হয়। উইলি দুটো মগ তাদের হাতে ঠেলে দেয়।

তারা স্থির দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকিয়ে থাকে। "এক চুমুকে শেষ করতে হবে।" উইলি চেঁচিয়ে বলে। কেরানীটা রণ ভঙ্গ দিতে চায়। কিন্তু উইলি কিছুতেই তাঁকে ছাড়বে না। "আচ্ছা চার চুমুকে।" মেয়র সবিনয়ে ওকালতি করে। উইলি জেদ করে "এক চুমুকে।" সে দাঁড়িয়ে কেরানীর গ্লাসে গ্লাস ঠোকাঠুকি করে। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। "তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।"

এখনই জবাই হতে যাচ্ছে আমাদের এমন দুটো বাছুর ভেবে তারা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক চুমুক দেয়। "না তা হচ্ছে না। এক

চুমুকে শেষ করতে হবে, নইলে পরাজয় মানতে হবে। উইলি আবার চেঁচিয়ে ওঠে। তারা দুজন টলতে টলতে চুমুক দেয়, নানা পন্থায় বিরাম নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা তাদের বিদ্রূপ করি। আমাদের শূন্য গ্লাস তাদের দেখাই। তারা গ্লাসের মদ শেষ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধীরে এবং নিশ্চিতভাবে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। আমাদের জয় হয়েছে। ধীরে সুস্থে পান করলে তারা হয়ত আমাদের পরাজিত করতে পারতো, কারণ তাড়াতাড়ি মদ্য পানে আমাদের প্রশিক্ষণ রয়েছে। আমাদের পদ্ধতিতে তাদের সম্মত করে আমরা বেঁচে গেছি।

টলতে টলতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের চার দিকটা আমরা একবার গর্বভরে দেখে নিই। আমাদের পাশে একজনও দাঁড়িয়ে নেই। ডাক পিয়ন একাধারে মদ্য ব্যবসায়ীও বটে। সে কাউন্টারে মাথা রেখে স্ত্রীর জন্য "মার্থা, মার্থা" বলে বিলাপ করতে থাকে। সেনাবাহিনীতে বিদেশে থাকাকাল তার স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় মারা গেছে। মদ্য পরিবেশিকা আমাদের জানায় যে মাতাল হলে সে সব সময় স্ত্রীর জন্য বিলাপ করে। যাক, এবার ফিরে যাওয়ার পালা।

উইলি মেয়রকে উঠিয়ে নেয়। আমি অধিকতর হালকা ওজনের কেরানীকে তুলে নেই। এমনি করে আমরা দুজনকে কোন রকমে তাদের বাড়ীতে পোঁছিয়ে দেই। এটাই আমাদের বিজয়ের চরম আনন্দ। আমরা কেরানীকে তার বাড়ীর সামনের দরজায় রেখে দরজায় করাঘাত করি। কে যেন একটা প্রদীপ নিয়ে এসে হাজির হয়। আর মেয়রের জন্য কে যেন প্রতীক্ষা করছে। তার স্ত্রীই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

"হায় যীশু!" তার স্ত্রী চেঁচিয়ে বলে। "এরা যে স্কুলের নতুন শিক্ষক। এই অল্প বয়েসে এমন মদখোর। শুরুটা কিন্তু চমৎকার।"

উইলি তাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে যে এই মদ্যপান ছিলো একটা সম্মান রক্ষার ব্যাপার, কিন্তু বলতে গিয়ে সব গোলমাল করে দেয়।

"আমরা তাকে কোথায় রাখব?" আমি মেয়রের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি।

"এই বুড়ো শুয়রটা পড়ে থাকুক।" মেয়রের স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলে। আমরা মেয়রকে উঠিয়ে একটা সোফায় শুইয়ে দিই। তারপর উইলি একটা বাল সুলভ হাসি হেসে জানতে চায় আমরা সামান্য কফি পেতে পারি

কি-না। মেয়রের স্ত্রী আমাদের দিকে এমন ক্রোধদীপ্ত চোখে চায় যে আমরা যেন অসভ্য বর্বর।

"কিন্তু আমরা যে আপনার স্বামীকে আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলাম।" উইলি হেসে হেসে বলে দেয়। এই কড়া মেজাজী বৃদ্ধা মহিলাও তার এই ধৃষ্টতা প্রতিরোধ করতে পারে না। গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে শেষ পর্যন্ত এই মহিলা দু কাপ কফি ঢেলে দিতে দিতে আমাদের বকাবকি করতে থাকে। আমরা তার প্রতিটি কথায় হাঁ-সূচক জওয়াব দিই। এমন পরিস্থিতিতে এই পন্থাই সর্বোত্তম।

সেই দিন থেকে গ্রামে আমাদের সম্ভ্রম বেড়ে যায়; যেখানে যাই সেখানেই সবাই আমাদের সম্ভ্রমে সালাম করে।

(২)

আমার দিনগুলো একঘেঁয়ে বৈচিত্র্যহীনভাবে কাটতে থাকে। পূর্বাহ্নে চার ঘন্টা আর অপরাহ্নে দু ঘন্টা শিক্ষকতা করি। বাকী সময়টা একলা বসে, বেড়িয়ে আর ভাবনা চিন্তায় কাটে।

রোববার সবচেয়ে খারাপ লাগে। সরাইয়ে যেতেও ভালো লাগে না। যখনই সরাইয়ে বসে থাকতে ভালো লাগেনা তখনই জীবনটা অসহনীয় মনে হয়। প্রধান শিক্ষকই স্কুলে একমাত্র পুরুষ শিক্ষক। তিনি ত্রিশ বছর এখানে শিক্ষকতা করে কাটিয়েছেন। শিক্ষকতার ফাঁকে অবসর সময়ে তিনি শূয়র পালনের কাজে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। এই কাজে দক্ষতার জন্য তিনি অনেক পুরস্কারও পেয়েছেন। শূয়র পালনের বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ হয় না। তার সঙ্গে দেখা হলেই আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই। আমার মনে ভয় জাগে যে, একদিন আমিও তার মতন হয়ে যাব। একজন মহিলা শিক্ষিকাও আছেন; মধ্য বয়স্কা ভালো মানুষ, কিন্তু মন্দ ভাষা শুনলে তিনি খেপে যান। তা ছাড়া, তার সাহচর্য মনে কোন প্রেরণার সঞ্চার করে না।

উইলি আমার চেয়ে সুখে সময় কাটাচ্ছে। সে গাঁয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে, নামকরণ অনুষ্ঠানে বা যে কোন অনুষ্ঠানাদিতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে

যোগদান করে। ঘোড়ার রোগ হলে বা গাই বাচ্চা না দিলে সে কৃষকদের উপদেশ দেয়, সাহায্য সহায়তা করে ; সন্ধ্যায় তাদের সাথে সরাইয়ে বসে তাস খেলে।

কিন্তু আজকাল আমার সরাইয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে না। তাই একলাই ঘরে বসে থাকি। কিন্তু দীর্ঘ কাল নিঃসঙ্গ বসে থাকলে অদ্ভুত ভাবনা চিন্তারাশি ঘরের নির্জন কোণ থেকে আমার সামনে আবির্ভূত হয়—পাণ্ডুর মুখ আর ক্ষয়িষ্ণু হাত আমাকে ইশারায় ডাকে ; ভীতি প্রদর্শন করে। অতীতের ভুতুড়ে ছায়ামূর্তিগুলো নতুন রূপ ধরে আসে ; পাণ্ডুর চোখহীন মুখাবয়বগুলোর স্মৃতি আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে আর্তনাদ করে। অভিযোগ জানায়——।

এক রোববারের বিষণ্ণ সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে এডলফের সাথে সাক্ষাৎ করার মানসে স্টেশনে যাই। সদিচ্ছা বটে। একজন প্রিয় বন্ধুর সাহচর্যে নিরানন্দময় রোববারটা কাটিয়ে আসব।

অপরাহ্নে তার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছি। বাড়ীর সদর দরজায় ধাক্কা দিতেই তাব কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে। আমি ফল গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে এগিয়ে যাই। এডলফ বাড়ীতেই আছে; তার স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত। কিন্তু এডলফের সাথে করমর্দন করতেই তার স্ত্রী অন্তর্হিত হয়ে যায়। আমি আসন গ্রহণ কবি। এডলফের সাথে আলাপ করতে থাকি। একটু পরে এডলফ বলে, "আর্নস্ট, আমার মনে হয তোমার আশ্চর্য ঠেকছে। তাই না ?"

"কেন বলত ?"

"আমার স্ত্রীকে এখানে দেখতে পেয়ে।"

"না, আমার মনে হয় এডলফ, এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

সে একটা ফলের বাসন এগিয়ে দিয়ে বলে, "একটা আপেল খাও।" আমি একটা আপেল নিয়ে তাকে একটা সিগারেট দিই। সে সিগাবেটটা মুখে দিয়ে বলতে থাকে, "আর্নস্ট, ব্যাপারটা এমনি করে ঘটে। আমি এমনি করে এখানে বসে বসে কয়দিনেই পাগল হয়ে উঠি। আমার মত এমন নিঃসঙ্গ থাকলে নিজ গৃহ পর্যন্ত বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়ায়। তুমি

ঘরে ঘরে পায়চারি কর। দেখতে পাবে তার একটা ব্লাউজ এখনো ঝুলছে; ওখানে তার সেলাইর সরঞ্জমাদি পড়ে আছে। ঐ চেয়ারটায় বসে সে সেলাই করতো। তারপর রাত্রিতে তার সাদা ধবধবে শয্যাটা তোমার পাশে শূন্য পড়ে আছে। বার বার সে শয্যার পানে তাকিয়ে তুমি নিজের শয্যায় পড়ে গড়াচ্ছ। তোমার চোখে ঘুম নেই। তোমার মাথায় নানা চিন্তা ভাবনা ঘুরছে, আর্নস্ট—"

"আমি তা বিশ্বাস করি, এডলফ—"

"তারপর অবশেষে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, মাতাল হয়ে একটা কিছু কুকাণ্ড করে বস—"

আমি ইতিবাচক মাথা নাড়ি। টিক টিক করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। উনুনটা চট চট শব্দ করছে। তার স্ত্রী নীরবে ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর রুটি মাখন রেখে দিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। বেথকি টেবিলের ঢাকনিতে হাতটা মুছে নেয়।

"হ্যাঁ, আর্নস্ট। এখানে তারও এই অবস্থা। সে এ কয় বছর এমনি করে বসে থাকতো। সে শঙ্কায় অনিশ্চয়তায় এখানে শুয়ে থাকতো, বিষাদক্লিষ্ট মনে সব শুনতো। দেখতো আর তারপর অবশেষে অঘটন ঘটে গেলো। প্রথমে সে যে এটা চায়নি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একবার যখন ব্যাপারটা ঘটে গেলো সে অসহায়ের মতন তা মেনে নিলো। এমনি করে একটা ঘটনার পরম্পরায় অন্য ঘটনা ঘটে গেলো।"

তার স্ত্রী কফি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। তাকে স্বাগতম জানাতে আমার ইচ্ছে হয়, কিন্তু সে আমার দিকে তাকায় না।

"তুমি নিজের জন্য এক পেয়ালা আনলে না?" এডলফ তার স্ত্রীকে শুধায়।

"রান্নাঘরে আমার কাজ বাকী রয়েছে।" তার কণ্ঠস্বর কোমল গম্ভীর।

"আমি এখানে বসে আপন মনে নিজেকে বলতে লাগলাম," এডলফ বলে যায়, "তুমি ত তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ঘর থেকে বের করেছ। তোমার

মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছ। কিন্তু পরক্ষণে ভাবলাম, কিন্তু তোমার মর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠা তোমাকে কি সুখ শান্তি দিয়েছে? তুমি জান, ব্যাপারটা অকিঞ্চিৎকর। তুমি এখন নিঃসঙ্গ, সম্মান বা অসম্মানে তোমার নিঃসঙ্গ জীবনে সুখানন্দ আসবে না। তাই আমি তাকে বললাম যে সে ফিরে আসতে পারে। যা হয়ে গেছে তাতে এমন কি হয়েছে? একজন ক্লান্ত মানুষ আমি; আর কয়টা বছর মাত্র বাঁচব। সেই ব্যাপারটা না জানলে তার জীবন আগের মতনই কেটে যেতো। কেউ তা জানতে পারলে জীবনে কি ঘটতো কে জানে?"

এডলফ তার চেয়ারের হাতায় তার আঙুলগুলো নিয়ে অস্থির চিত্তে খেলা করে। "আর্নস্ট, একটু কফি খাও। মাখন রয়েছে।"

আমি পেয়ালায় কফি ঢালি। দুজনেই কফি খাই।

"আর্নস্ট, তোমার জীবনটা কত সহজ।" এডলফ ধীরে ধীরে বলে, "তোমার বই পুস্তক আছে, তুমি শিক্ষিত, জীবনে যা প্রয়োজন সবই তোমার আছে। কিন্তু আমার?—আমার জীবনে ত স্ত্রী ছাড়া কিছুই নেই——"

তার এই কথায় আমি সাড়া দিই না। আমি তাকে কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারি না। যুদ্ধ ফ্রণ্টে যে এডলফ ছিলো এখন সেই এডলফ নেই; আমিও বদলে গেছি।

"এ সম্বন্ধে তোমার স্ত্রী কি বলেন?" একটু পরে আমি তাকে প্রশ্ন করি।

এডলফ তার হাত দুটো নামিয়ে বলে, "সে কথা বলে কম; তার কাছ থেকে বেশি কথা বের করা যায় না। সে ওখানে বসে থেকে আমার পানে শুধু চেয়ে থাকে। জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করলে সে শুধু কাঁদে, কথা বলে না।"

এডলফ পেয়ালাটা সরিয়ে দিয়ে বলে, "একবার সে বলেছিলো যে জীবনের নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আশায়ই সে একাজ করেছিলো; আবার বলে যে এ কাজের গুরুত্বটা সে বুঝতে পারেনি। সে বুঝতে পারেনি যে এতে আমার প্রতি সে কোন অন্যায় করেছে। সে ভেবেছিলো, আমিই

বুঝি রূপান্তর গ্রহণ করে এসেছি, কিন্তু তার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ ধরনের ব্যাপারে পৃথক উপলব্ধি নিশ্চয়ই সম্ভবপর। অন্যান্য ব্যাপারে সে ঠিক আছে।"

আমি একটুখানি ভাবি। ভেবে বলি, "সে হয়ত বলতে চায় যে, সে কি করছে তা ঠিক বুঝতে পারেনি, যেন সে স্বপ্ন দেখছিলো। এডলফ, মাঝে মাঝে মানুষ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে।"

"হতে পারে, কিন্তু এটা আমার বোধগম্য নয়। ব্যাপারটা অবশ্য দীর্ঘ দিন গড়ায়নি।" সে বলে।

"আর নিশ্চয়ই সে সেই লোকটার সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না?" আমি জানতে চাই।

"সে ত বলে যে সে এই সংসারেরই অঙ্গীভূত।"

আমি কতক্ষণ ভাবি। আর কি কথাই বা জিজ্ঞেস করা যায়? "এডলফ, তোমার দিন কি আগের চেয়ে ভালো কাটছে?" সে আমার পানে তাকায়। "খুব বেশী ভালো নয়; আর্নস্ট, তবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। হয়ত পরে ভালো হবে। হয়ত সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কি তাই মনে কর না?"

তাকে দেখেশুনে মনে হয় না যে সে নিজেও তা বিশ্বাস করে। "নিশ্চয়ই এক দিন সব ঠিক হয়ে যাবে।" বলে আমি টেবিলের উপর কয়েকটা সিগারেট রেখে দিই। আরো কতক্ষণ আলাপ করে আমি বিদায় নিই। "বিদায় ফ্রঁ বেথকি" বলে আমি কর মর্দনের জন্য হাত বাড়াই। "বিদায়" বলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার স্ত্রী মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এডলফ আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত আসে। প্রচণ্ড বাতাস বইছে। পথ চলতে তার পানে আমি আড়চোখে চাই আর ভাবি ট্রেঞ্চে বসে শান্তির কথা বললে সে সোনালী ভবিষ্যতের আশায় কত হাসতো। আর এখন শান্তির ফলশ্রুতি কি দাঁড়িয়েছে?

ট্রেন ছেড়ে দেয়। আমি জানালায় মুখ বের করে তাড়াতাড়ি বলি, "এডলফ, আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি। তুমি জাননা, আমি তোমাকে কত ভালো করে বুঝি।"

সে মাঠের উপর দিয়ে একলা তার ঘরে চলে যায়।

দশটার সময় খেলার ঘন্টা পড়ে। উপরের ক্লাশে আমি এক ঘন্টা পড়িয়ে শেষ করেছি। চোদ্দ বছর বয়েসী ছেলেরা আমাকে ধাক্কিয়ে উন্মুক্ত মাঠে ছুটে বেরিয়ে যায়। কয় মুহূর্তেই তারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমি জানালা দিয়ে তাদের পানে চেয়ে থাকি। তারা স্কুল ঘরের নিয়মানুবর্তিতা এক লহমায় ঝেড়ে ফেলে তারুণ্যের দুর্দমনীয়তায় মেতে উঠেছে।

ক্লাস রুমে আমার সামনে বই খাতা নিয়ে বসে থাকা তাদের আসল রূপ নয়। এটা তাদের কৃত্রিম রূপ। সাত বছরের শিক্ষা তাদের বর্তমান পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে। সরল সংশয়মুক্ত মন নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তর, খেলাধূলা আর তাদের স্বপ্নঘেরা জীবন ছেড়ে কচি শিশুর মতন তারা স্কুলে প্রবেশ করেছিলো। শিক্ষার সংস্পর্শে তাদের মন তখনো কলুষিত হয়নি। সহজ জীবনবিধিই তখন তাদের কাছে একমাত্র সত্য ছিলো। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত আর শক্তিমান সেই ছিলো তাদের নেতা। সবাই তাকে অনুসরণ করতো; সবাই তাকে মান্য করতো। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একটা কৃত্রিম মূল্যবোধ গোপনে তাদের মনে জাগিয়ে দেয়া হলো, যে তার পড়া সবচেয়ে ভালো বলতে পারে, তাকেই সেরা বলে আখ্যায়িত করা হলো, তাকেই সবার উপরে স্থান দেয়া হলো। অন্যান্যকে তার সমকক্ষ হতে হবে। যারা খুব প্রাণবন্ত তারা যে এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করবে তাতে আশ্চর্যের এমন কিছু নেই। কিন্তু তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। সুপণ্ডিতই স্কুলের আদর্শ, প্রাণবন্ত জন নয়। কি মহান আদর্শ! পণ্ডিতজনেরা পৃথিবীর কি কল্যাণ সাধন করেছে? স্কুলের কৃত্রিম উষ্ণীকৃত উদ্যানে পণ্ডিত ব্যক্তি জীবনের বাহ্যিক আনন্দ ক্ষণকালের জন্য উপভোগ করে বটে, কিন্তু পরে যে সে সাধারণ ও অকিঞ্চিৎকর পর্যায়ে নেমে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অপণ্ডিত জনেরাই পৃথিবীর উন্নতি সাধন করেছে।

আমি তাদের খেলা পর্যবেক্ষণ করি। নমনীয় দেহের অধিকারী সতেজ সবল কুঁকড়ো চুলো ডেমহোলট মাঠময় উদ্দীপনায় আক্রমণ ধারা রচনা করছে। তার দেহের পেশী শিরা উপশিরাগুলো শক্ত সটান, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, উৎসাহ-উদ্দীপনা অদম্য। সে সবাইকে শাসন করছে। সবাই তার আদেশ-নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে পালন করছে। কিন্তু এই ডেমহোলটই

দশ মিনিট পর যখন ক্লাশে এসে বসবে তখন হয়ে যাবে একটা দুর্বিনীত নির্বোধ একগুয়ে শয়তান, লেখা-পড়ায় নিরেট গর্দভ; পরবর্তী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে সে এই ক্লাশেই পড়ে থাকবে। আমার চোখের সামনে সে সুশীল, সুবোধ ছেলেটির মত বসে থাকবে; কিন্তু আমি অন্য দিকে চোখ ফেরালেই ভেঙচি কাটবে। বাড়ীর কাজ করেছে কি-না জিজ্ঞেস করলে সে মিথ্যে কথা বলবে। একটু সুযোগ পেলেই সে আমার পোশাকে থুথু দেবে বা আমার চেয়ারে আলপিন পুঁতে রাখবে। কিন্তু ক্লাসে সেরা এক নম্বর ছাত্রটি—খেলাধূলায় একবারে অকর্মনা,—ক্লাসে তার প্রাধান্য প্রদর্শন করবে। জ্ঞান-গরিমায় অহঙ্কারী এই ছেলে প্রতিটি প্রশ্নের জওয়াব দিতে হাত তুলে দাঁড়াবে আর মূর্খ ডেমহোল্ট অসহায় ক্রোধ বুকে চেপে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার প্রতীক্ষায় বসে থাকবে। এক নম্বর ছেলেটা সবজান্তা আর এ সম্বন্ধে সে সচেতন। তবু শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ডেমহোল্ট এই পাণ্ডুর বর্ণ সবাজান্তা আদর্শ ছেলেটির চেয়ে আমার কাছে হাজার গুণ প্রিয়।

আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দেই। আমি কি আগেও এমনটি লক্ষ্য করিনি? কর্নাসম্যানের সেই সামরিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সময়? সেখানে কি লক্ষ্য করিনি যে মানুষের ব্যক্তিগত গুণাবলীর কোন অর্থ নেই। তার পেশা এবং সামাজিক মর্যাদাই আসল মাপকাঠি? অথচ যুদ্ধ সীমান্তে ব্যাপারটা ছিলো এর বিপরীত। আমি মাথা নেড়ে ভাবি, কি জগতেই ফিরে এলাম?

ডেমহোলটের চীৎকার ধ্বনি মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবি, ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করতে পারে কিনা। সম্পর্কের হয়ত কিছুটা উন্নয়ন হতে পারে, কিছুটা অসুবিধেও দূর করতে পারে। কিন্তু মূলতঃ এটা হবে একটা মহা ভুল; একটা মরীচিকা মাত্র। তারুণ্যের দৃষ্টি বড় প্রখর। তারুণ্যকে কলুষিত করা যায় না। তারুণ্য চায় প্রবীণদের বিরুদ্ধে তরুণদের দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ। এটা শুধু ভাবাবেগ নয়। তারুণ্যের নৈকট্য লাভ সম্ভব, কিন্তু তারুণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ সম্ভব নয়। তারুণ্যের নন্দন কানন থেকে একবার বিতাড়িত হলে সেখানে পুনঃ প্রবেশ অসম্ভব। তবে বয়েসের একটা ধর্ম আছে। এই প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন ডেমহোলটই হয়ত একদিন ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে এই সাথীত্বকে স্বীয় সুবিধে অর্জনের কাজে লাগাবে। হয়ত এই সাথীত্বের প্রতি কিছুটা অনুরাগ থাকবে, কিন্তু এই অনুরাগ তাকে তার স্বার্থ সাধনে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। শিক্ষাবিদদের

মধ্যে যারা মনে করেন যে তাঁরা তরুণদের বুঝতে পারেন তাঁরা উৎসাহীর দল। তাদের অন্যরা বুঝুক, তরুণদের তা কাম্য নয়। তাদের সম্বন্ধে কেউ মাথা ঘামাক, তাও তারা চায় না। অন্যরা তাদের বুঝুক, এই সংক্রমণ থেকে তারা মুক্ত থাকতে চায়। যে প্রবীণেরা অযথা তারুণ্যের সাহচর্য চায় তারা ছেলেমানুষের পোশাক পরে নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তোলে। তরুণদের অনুভূতি আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু তরুণেরা আমাদের অনুভূতি বুঝতে পারে না।

আবার ঘন্টা পড়ে। শ্রেণী কক্ষের দরজার সামনে ডেমহোলট অনিচ্ছা-সত্ত্বে সারিতে এসে দাঁড়ায়।

গাঁয়ের পথ দিয়ে আমি অনাবাদী জলাভূমির দিকে যাই। উলফ আমার আগে আগে ছুটছে। সহসা পাশের খামার বাড়ীর প্রাঙ্গন থেকে একটা বুলডগ বেরিয়ে উলফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উলফ আগে তা দেখতে পায়নি। তাই প্রথম আক্রমণে বুলডগটা উলফকে নীচে ফেলে দেয়। পর মুহূর্তে ধূলোরাশির আড়ালে চলে ধ্বস্তাধ্বস্তি, আছাড় পাছার আর ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনি।

কৃষক লাঠি হাতে বস্তী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দূর থেকেই চিৎকার করতে থাকে "প্রভুর দোহাই, মাস্টার, আপনার কুকুরটাকে সামলান। প্লুটো ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।"

আমি তার কথায় কান দিইনি। "প্লুটো! প্লুটো! ওরে জাহান্নামী খুনী। এদিকে আয়।" উত্তেজিত কৃষক চীৎকার করতে করতে প্রাণপণে কুকুর দুটাকে ছাড়িয়ে দিতে ছোটে। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘূর্ণীঝড় তর্জন-গর্জন করতে করতে আরো এক শো গজ দূরে সরে পড়ে। সেখানে আবার প্যাঁচ শুরু হয়।

কৃষক তার লাঠিটা নামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "এবার এর দফা-রফা। কিন্তু মাস্টার আমি বলে রাখছি, আমি এক ফার্দিংও ক্ষতিপূরণ দেব না। আপনার কুকুরকে আপনার ফিরিয়ে আনা উচিত ছিলো।"

"কার দফারফা?" আমি প্রশ্ন করি।

"আপনার কুকুরের," কৃষক সসম্মানে জওয়াব দেয়। এই বদমায়েশ বুলডগটা আজ পর্যন্ত ডজনখানেক কুকুর খুন করেছে।

"আমার মনে হয় উলফ সম্বন্ধে দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই।" আমি তাকে বলি, "এটা সাধারণ মেষ পালা কুকুর নয়? এটা যুদ্ধ ফেরত কুকুর, পুরানো সৈনিক; আপনাকে বলে দিচ্ছি।"

ধুলোর ঝড় মিলিয়ে যায়। কুকুর দুটো এবার একটা তৃণাচ্ছাদিত স্থানে সরে এসেছে। আমি দেখছি, বুলডগটা উলফকে ফেলতে চেষ্টা করছে, যাতে এর গ্রীবাদেশে দাঁত বসিয়ে দিতে পারে। সফল হলে সত্যি উলফের দফারফা! কারণ তখন বুল ডগটা সহজেই তার ঘাড়টা ভেঙ্গে দিতে পারবে। কিন্তু উলফ বাইন মাছের মতন গড়িয়ে নিজকে মুক্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে বুলডগটাকে আক্রমণ করে। বুলডগটা চেঁচায়, কিন্তু উলফ নিঃশব্দে লড়াই করতে থাকে।

"জাহান্নামী।" কৃষক ক্রোধে চেঁচিয়ে ওঠে।

বুলডগটা নিজকে মুক্ত করে লাফ দিয়ে উলফকে আক্রমণ করে, কিন্তু উলফকে ধরতে পারে না; হাওয়ার উপর লাফ দেয়। আবার ক্রুদ্ধ বুলডগটা বার বার লাফ দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। উলফটা এত ক্ষুদ্রকায় যে চোখেই পড়েনা। মনে হয় বুলডগটা একলাই লাফালাফি করছে। মাটির ওপর উলফ বিড়ালের মতন ছুটে বেড়ায়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে দৌত্য কাজ করার সময় সে এই কৌশল শিখেছে। সে বুলডগের পায়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে তলা থেকে আক্রমণ করে। সে বুলডগের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, তারপর সুযোগ করে সহসা বুলডগের পেটে দাঁত ঢুকিয়ে দিয়ে ধরে রাখে।

বুলডগটা পাগলের মতন গর্জন করতে করতে মাটিতে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বিদ্যুৎ গতিতে উলফ বুলডগটাকে ছেড়ে দিয়ে এবার তার কণ্ঠনালী ধরার সুযোগ সন্ধানে থাকে। এই প্রথম তাকে গর্জন করতে শুনলাম। এবার সে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে। এবার সে সুযোগ পেয়ে বুলডগের কণ্ঠনালী কামড়ে ধরে। বুলডগটা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি করে, কিন্তু সে দিকে তার খেয়াল নেই।

"প্রভুর দোহাই মাস্টার, আপনার কুকুরটা ফিরিয়ে আনুন। প্লুটোকে সে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।" কৃষক চেঁচিয়ে অনুরোধ করে।

"আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ডাকাডাকি করলেও সে আমার কথায় কান দেবে না।" আমি কৃষককে বলি। "ভালোই হয়েছে। তোমার বদমায়েশ প্লুটোর একটা শিক্ষা পাওয়া উচিত।"

বুলডগটা গর্জন করে আর কাতরায়। কৃষক লাঠি উঁচিয়ে তাকে সাহায্য করতে যেতে চায়। আমি লাঠিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তার জ্যাকেটটা ধরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, "তুমি কি ভাবছ? তোমার জারজটাই মারামারি শুরু করেছে।" আর বাড়াবাড়ি করলে আমি নিজেই কৃষকের সঙ্গে লেগে যেতাম।

কিন্তু আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে দেখলাম, উলফ সহসা বুলডগটাকে ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে ধাওয়া করে আসছে। ভেবেছে যে কৃষক আমাকে আক্রমণ করছে। তাই সৌভাগ্যবশত আমি তার গতিরোধ করে দিতে পারলাম। নইলে আর বেশী কিছু না হোক কৃষককে একটা নতুন কোট কিনতে হতো।

ইতিমধ্যে প্লুটো পালিয়ে নিস্তার পেয়েছে। আমি উলফের মাথা চাপড়ে শান্ত করি। পরাভূত কৃষক তোতলিয়ে তোতলিয়ে বলে, "এ একটা শয়তান, সন্দেহ নেই।"

"সে ঠিক কাজ করেছে।" আমি গর্বভরে বলি। "তার মধ্যে প্রাক্তন সৈনিক এখনো বেঁচে আছে। অভিজাত রক্তের সঙ্গে গোলমাল বাধালে শেষ পরিণাম ভালো হয় না।"

আমরা আপন পথে চলতে থাকি। গাঁ পেরিয়ে প্রান্তর, প্রান্তরের পরেই জলাভূমি। সেখানে বৃক্ষরাজি লতাগুল্মের ঝোপ-ঝাড় আর পুরানো সমাধি ক্ষেত্র। বার্চ গাছের জঙ্গলের কাছে একদল মেষ বিচরণ করছে। অস্তগামী সূর্যের সোনালী কিরণে এদের পশমী পৃষ্ঠদেশ চিক চিক করছে।

হঠাৎ উলফ মেষপালের পানে ছুট দেয়। বুলডগের সাথে মারামারি করে তার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে ভেবে আমিও পিছনে ছুটি যাতে সে একটা মহা হত্যাকাণ্ড না ঘটাতে পারে। আমি মেষপালককে চেঁচিয়ে বলি, "ওহে, কুকুরটার প্রতি খেয়াল রেখো।"

মেষপালক হাসে। "এটা ত একটা মেষ রাখা কুকুর; কোন ক্ষতি করবে না।"

আমি আবার চেঁচিয়ে বলি, "এমনটি ভেবোনা, একে তুমি চেননা। এটা একটা যুদ্ধ-কুকুর।

"তাতে হলো কি?" মেষপালক জওয়াব দেয়, "যুদ্ধ-কুকুরই হোক আর যা-ই হোক, কোন ক্ষতি করবে না। ঐ দেখুন। খুব ভালো কুকুর। যাও ত, মেষগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে এসো ত?"

আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনা। উলফ—যে উলফ জীবনে কোন দিন মেষ দেখেনি, এখন মেষগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে আসছে। জীবনে এ কাজ ছাড়া যেন অন্য কোন কাজ করেনি। ঘেউ ঘেউ করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দুটো পথভ্রষ্ট মেষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। দুটো মেষ দাঁড়িয়ে থাকলে বা অন্য দিকে যেতে চাইলে সে এদের পথরোধ করে এদের পায়ে কট করে কামড়ে দেয়; তখন তারা আমার সামনে ছুটতে থাকে।

"চমৎকার সুদক্ষ কুকুর।" মেষপালক মন্তব্য করে। "এর চেয়ে ভালো কুকুর হয় না।"

কুকুরটার যেন রূপান্তর ঘটে গেছে। তার চোখ চকচক করে। সে মেষপালের চারদিকে কান খাড়া করে বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়ায়। দেখে মনে হয় খুব উত্তেজিত।

"আমি এখনই এটা কিনব।" মেষ পালক বলে। "আমার নিজের কুকুরটাও এমন দক্ষ নয়। ঐ দেখুন আপনার কুকুরটা মেষপালকে গাঁয়ের পথে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাজে একদম পাকা।"

আমি আনন্দে আত্মহারা। উলফ গোলা বারুদের মাঝখানে গোলা বিধ্বস্ত সীমান্তে বড় হয়েছে। কেউ একে কিছু শেখায়নি, কিন্তু তবু সে নিজের কাজ জানে।

"আমি এর বিনিময়ে নগদ পাঁচ পাউণ্ড আর একটা মেষ দেব।" মেষ পালক বলে।

আমি নেতিবাচক মাথা নেড়ে কঠোরভাবেই বলি, "দশ লাখ দিলেও হবে না।"

এবার মেষ পালক মাথা নাড়ে।

কাঁটা গুল্মের খোঁচা আমার চোখেমুখে লাগে। আমি একহাতে কাঁটা গুল্ম সরিয়ে অন্য হাতে চোখমুখ আড়াল করে পথ করে চলি। কুকুরটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আমার পাশে পাশে চলছে। দূর থেকে মেষ-পালের গলায় বাঁধা ঘন্টার টুংটাং শব্দ ভেসে আসছে। তা ছাড়া, সব স্তব্ধ নিঝুম।

সন্ধ্যাকালে মেঘের দল ভেসে বেড়াচ্ছে। সূর্য অস্তাচলে নামছে। ঘন সবুজ ঝোপ-ঝাড় ঘন পিঙ্গল রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে। দূর বনানী থেকে সান্ধ্য বাতাস ঝিরঝির বইছে। ঘন্টাখানেক পরেই বাতাস ভূর্জপত্রের সাথে মাতামাতি শুরু করবে। কিষাণ আর অরণ্যবাসীদের মতন সৈনিকেরাও এই পল্লী দৃশ্যের সাথে পরিচিত। তারাও বদ্ধ ঘরের অভ্যন্তরে বাস করেনি। তারাও বাতাসের আগমন কাল আর আসন্ন সন্ধ্যার দারুচিনি-ধূসর রঙের সাথে পরিচিত, তারাও মেঘঢাকা সূর্যের কিরণ রেখা আর চন্দ্রের রীতি বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত।

একবার ফ্লাণ্ডার্সে এক প্রচণ্ড গোলাগুলিতে আমাদের একজন সৈনিক আহত হয়েছিলো। তার জন্য সাহায্য আসার তখন অনেক দেরী। আমরা আমাদের কাছে যে সাহায্য উপাদান ছিলো তা দিয়ে যথাসম্ভব তার ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করলাম, কিন্তু কোন ফল হলো না। তার রক্তপাত বন্ধ হলোনা। রক্তপাতের ফলে সে মারা গেলো। তার পিছনে সন্ধ্যাকালে সারাক্ষণ এক খণ্ড মেঘ দাঁড়িয়ে রইলো। সাদা সোনালী রক্তলাল বিরাট মেঘের পাহাড়টা অকারণ মাথা উঁচিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মৃত্যুপথ যাত্রী সৈনিকটাও স্তব্ধ, রক্ত-রঙিন। দুজনের মধ্যে যেন কত নিবিড় আত্মীয়তা। তবু এক খণ্ড সুন্দর মেঘ এমনি করে আপন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে উদাসীন দাঁড়িয়ে থাকবে আর একটা লোক এমনি করে পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রহর গুনবে, তা আমার কল্পনাতীত।

অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি লতাগুল্মের ঝোপ-ঝাড়গুলোকে ফিকে রক্তিম রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। জলাভূমিতে সারস পাখির কলরব শোনা যাচ্ছে। আমি উন্মুক্ত সমতল ধূসর জলাভূমির পানে চেয়ে থাকি। হোসেলেটের একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রান্তরে রক্তরাঙা পপি ফুল ফুটে থাকতো, আমরা এর নাম দিয়েছিলাম রক্ত প্রান্তর, কারণ বজ্র বিদ্যুৎ আর ঝড়-ঝাপটার পর জায়গাটাকে সদ্য-ঝরা তাজা রক্তের মতন দেখাতো। সেখানে এক রাত্রে পথ চলাকালে কোহলার উন্মাদ হয়ে যায়। সে তখন দুর্বল ক্লান্ত। চাঁদের জ্যোৎস্নায় তার ধারণা হয় যে জায়গাটা একটা রক্ত হ্রদ। সে তাতে ঝাপিয়ে পড়তে চায়।

আমার দেহ শিউড়ে ওঠে: আমি উপরের দিকে তাকাই। এর মানে কি? এসব স্মৃতি এখন কেন বার বার আমার মনে উদয় হয়? সীমান্তে ত এমন হতো না। আমি কি সত্যি খুব নিঃসঙ্গ।

ঘুমন্ত উলফও উত্তেজনায় মৃদুকণ্ঠে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। সেও কি তার সেই মেষপালের স্বপ্ন দেখছে? আমি অনেকক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকি। তারপর তার ঘুম ভাঙিয়ে আমরা ফিরে যাই।

আজ শনিবার। আমি উইলির কাছে যাই। তাকে জিজ্ঞেস করি, সে রোববারে আমার সঙ্গে শহরে যাবে কি-না, কিন্তু সে এ কথায় মোটেই পাত্তা দেয় না। "আমাদের কাল ভোজোৎসব আছে। আমি এ সুযোগ ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি যাবে কেন?" সে জানতে চায়।

"এখানে রোববারে থাকতে আমার ইচ্ছে হয় না" আমি জওয়াব দিই। "আমি তোমাকে বুঝতে পারছিনা যে তুমি এমন একটা ভালো খানাপিনার কথাও বিবেচনা করছ না।" উইলি আপত্তির সুরে বলে।

আমি একলাই রওয়ানা হই। সন্ধ্যার সময় একটা কিছু পাওয়ার অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি ওয়াল্ডম্যানে যাই। স্থানটা কর্মমুখর। আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চারদিকে চাই। একদল তরুণ, যারা সময়ের সামান্য ব্যবধানের জন্য যুদ্ধে যোগদান করতে পারেনি, নাচঘরে বসে চোঁ চোঁ করে মদ খাচ্ছে। তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। তারা জানে, তারা কি চায়। তাদের জীবনেব প্রারম্ভ সহজ সরল, তাদের জীবনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট—লক্ষ্য জীবনে সাফল্য অর্জন। আমাদের চেয়ে বয়েসে তরুণ হলেও তারা আমাদের চেয়ে গুণী।

আমি যে মেয়েটার সঙ্গে নেচে আগে একবার পুরস্কার পেয়েছিলাম, সেই মেয়েটাকেও নাচিয়েদের দলে দেখতে পাই। আমার সঙ্গে নাচার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করি। এর পর থেকে আমরা দুজন কাছ-ছাড়া হইনি। কয়দিন আগে মাত্র মাইনে পেয়েছি। সেই জোরে আমি দুবোতল ভালো মদের অর্ডার দেই। আমরা ধীরেসুস্থে মদ খাই। কিন্তু যতই মদ খাই, ততই আমার মনে অদ্ভুত খেয়াল জাগে। কাউকে একান্তভাবে একলা করে পাওয়ার কথা আলবার্ট যে বলেছিলো তার তাৎপর্যটা কি? আমি বিষণ্ন মনে মেয়েটার বকবকানি শুনি। সে চড়ুই পাখীর মতন কিচিরমিচির করতে থাকে। সে জামাকাপড় সেলাইয়ের মজুরি, নতুন নাচ এবং আরো হাজার বিষয়ে বকবক করতে থাকে। সেলাইর মজুরিটা যদি সামান্য বাড়ে তবে সে রেস্তোঁরায় খেতে পারতো, সুখী জীবন যাপন করতে পারতো। তার সহজ সরল জীবনের প্রতি আমার ঈর্ষা জাগে। তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করি। এখানে সমবেত প্রত্যেকে

হাসছে; আমোদ স্ফূর্তি করছে। তাদের জীবনধারা সম্বন্ধে জানতে আমার ইচ্ছে হয়। তাদের মধ্যে হয়ত এমন কেউ আছে যে এমন কিছু বলতে পারবে যা আমার উপকারে আসবে।

এখানকার কাজ শেষ করে আমি চড়ুই মেয়েটার সঙ্গে তার বাড়ীতে যাই। সে ধূসর রঙের ভাড়াটে বাড়ীর একটা ঘরে বাস করে। আমরা দরজার সামনে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার হাতের উষ্ণতা আমার হাতে অনুভব করি। অন্ধকারে তার মুখে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। একটা মানুষের মুখে আর হাতে জীবন আর উষ্ণতা লুকিয়ে আছে, "আমাকে তোমার সাথে যেতে দাও। আমাকে ভিতরে যেতে দাও————"

আমরা নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে অতি সাবধানে পা টিপে টিপে উপরে উঠতে থাকি। আমি দেশলাইর একটা কাঠি জ্বালাতেই সে তা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়। সে আমার হাত ধরে আমাকে পথ দেখিয়ে তার পিছু পিছু নিয়ে যায়।

একটা ক্ষুদ্র অপরিসর ঘর। একটা টেবিল, একটা সোফা, একটা শয্যা আর দেয়ালে কয়েকটা ছবি। ঘরের কোণে একটা সেলাই কল আর সেলাই করার জন্য একটা ঝুড়িতে কিছু কাপড়।

ক্ষীণাঙ্গিণী মেয়েটা চটপট একটা স্টোভ এনে তাতে চা পাতার সঙ্গে আপেলের খোসা মিশিয়ে সিদ্ধ করে। এগুলো অন্তত আরো দশবার সিদ্ধ করে আবার শুকানো হয়েছে। সে দুটো পেয়ালায় এই পানীয় ঢালে। একটা ঈষৎ দুষ্টুমী ভরা হাস্যময়ী মুখ, চিত্ত-চাঞ্চল্য জাগানো নীল রঙের পোশাক, বাসস্থানের সৌহার্দ্যময় অনাড়ম্বর পরিবেশ আর যৌবনসর্বস্ব তন্বী-তরুণী। যৌবনই তার একমাত্র সম্পদ। আমি সোফায় বসে পড়ি। এমনি করেই প্রেমের সূচনা হয়। এমনি সহজ সকৌতুক ক্রীড়াচ্ছলে দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই কি প্রেম বিনিময়ে এক মাত্র প্রয়োজন?

মেয়েটা সরলা স্নেহপরায়ণা; রতিরঙ্গ বিলাসিনী। ঘর বাঁধার স্বপ্ন তার নেই। তার কামনা, কেউ তার কাছে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরুক। তারপর চলে যাক। তখন তার সেলাই কল চলবে। তার একজন ক্ষণিকের অতিথি আসবে, সে হাসবে, কাঁদবে, আবার সেলাই কল ভন ভন করে ঘুরতে থাকবে। সে একটা রঙিন আবরণ দিয়ে সেলাই কলটা ঢেকে দেয়। নিকেল আর লোহার তৈরী সেলাই কলটা তখন লাল নীল ফুলে আঁকা বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। রাত্রির জীবন সম্ভোগের

মুহূর্তে সে দিনের বেলার বিড়ম্বনাময় জীবনের কথা স্মরণ করতে চায় না। কেউ তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেবে তাও তার কাম্য নয়। হালকা নরম পোশাক পরে সে আমার বাহুবন্ধনে বন্দিনী হয়ে কূজন করে, ফিস ফিস করে, বিড়বিড় করে, গুঞ্জরণ করে। তার দেহটা এমনি ছিপছিপে আর ওজনে হালকা এবং দেহবর্ণ এমনি ফ্যাকাশে——অর্ধ ভুক্ত থাকে বলে তা হয়েছে। ---যে কেউ তাকে অতি সহজে তুলে তার লোহার খাটে পাতা শয্যায় শুইয়ে দিতে পারে। কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকা অবস্থার কি মধুর তার আত্মসমর্পণ। সে এবার দীর্ঘ শ্বাস ফেলে। অধরে তার মৃদু হাসি ফোটে। একটা শিশু যেন চোখ বুঁজে আছে, শ্বাস ফেলছে, কাঁপছে, আধো-আধো কথা বলছে। এবার সে গভীর নিশ্বাস ফেলে; সুখাতিশয্যের তীব্র অসহনীয় মধুর যন্ত্রণায় অনুচ্চ কণ্ঠে কাতরায়। আমি তার পানে তাকাই, বার বার তাকাই। তাকে মৌন কণ্ঠে প্রশ্ন করি, এটাই কি তবে সব? এটাই কি? মেয়েটা আমাকে কত মধুব নাম ধরে ডাকে। তার শরম রাঙা মুখখানা আমার বুকে লুকিয়ে রাখে। তার কাছ থেকে বিদায়কালে প্রশ্ন করি, "তৃপ্ত হয়েছ ছোট পাখিটি আমার?" এই প্রশ্নের জওয়াবে সে বার বার চুমো খায়, মাথা নাড়ে, হাত দুলিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানায়————।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বিস্ময়ে আমাব মন ভরে যায়। সে তৃপ্ত, কত সহজে তৃপ্ত। আমি তা বুঝতে পারিনা। সে কি এমনি আর একটা জীব নয় যে নিজকে নিয়েই মগ্ন; যার কাছে আমি আব কোন দিন আসতে পারব না? আমার বুকে প্রেমের জলন্ত অগ্নিশিখা নিয়ে এলেও সে এমন স্বার্থ চিন্তায় মগ্ন থাকবে না? আহ্ প্রেম ---এই প্রেমের মশাল গভীর গহ্বরে পড়ছে—গহ্বরের গভীরতা পরিমাপ করা ছাড়া অন্য কোন কাজেই তা লাগবেনা।

আমি স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করি। না, এটা প্রেম নয়, এটা কখনোই প্রেম নয়---এখানে এলে মানুষ আরো একাকীত্ব অনুভব করে।

(৩)

প্রদীপটা টেবিলের উপর একটা আলোর বৃত্ত সৃষ্টি করে। আমার সামনে এক স্তূপ নীল খাতা; তার পাশে একটা লাল কালির বোতল। আমি

খাতাগুলো পড়ে ভুলগুলো চিহ্নিত করি ; তারপর চোষ কাগজগুলো ভিতরে রেখে খাতাগুলো বন্ধ করি।

আমি উঠে পড়ি। তা হলে এই কি জীবন? এই অব্যাহত এক-ঘেঁয়েমী আর শিক্ষকতার ঘ্যানর ঘ্যানর? কিন্তু এতে যেমন ভরে না ; ভাবনা-চিন্তা করার জন্য অনেক সময় হাতে থাকে। ভেবেছিলাম এই নিয়মিত কর্মসূচীতে আমার মন শান্ত হবে, কিন্তু এখন দেখছি, তাতে মনে আরো অস্থিরতা জাগে। এখানকার সন্ধ্যা বেলাটা কত দীর্ঘ?

আমি গোলাবাড়িতে হেঁটে হেঁটে যাই। আবছা অন্ধকারে গাভীগুলো জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে আর পা ছুড়ছে। তাদের পাশে একটু জায়গা নিয়ে গয়লানীরা বসে আছে। শাদা কালো গাভীর আড়ালে তারা একে অন্যের দৃষ্টিগোচর নয়। গোয়াল ঘরে বাতাসে লণ্ঠনের প্রদীপগুলো কাঁপছে। গয়লানীরা গাভীগুলো দোহন করছে। গাভীগুলোর বাঁট থেকে ক্ষীণ ধারায় বালতিতে দুধ পড়ে আর নীল ব্লাউজের অভ্যন্তরে গয়লানীদের স্তনযুগল ঈষৎ দোলে। তারা মাথা তুলে শাদা ধবধবে দাঁত বের করে হাসে। অন্ধকারেও তাদের চোখ চিক চিক করে। গাভী আর বিচালির গন্ধ নাকে লাগে।

দরজায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার ঘরে যাই। নীল খাতাগুলো তখনো প্রদীপের নীচে পড়ে আছে। এগুলো কি এমনিভাবে সারা জীবন পড়ে থাকবে? আর আমিও? আমিও কি ওখানে বসে বসে ধীরে ধীরে বুড়ো হয়ে একদিন মরে যাব? এবার ঘুমোব বলে ঠিক করি।

রক্তিম চাঁদটা ধীরে ধীরে গোলাবাড়ির ছাদের উপর উঠে। আমার জানালার ছায়াটা ঘরের মেঝেতে পড়ে। চাঁদটা আরো উপরে উঠতে থাকে আর ছায়াটাও সঙ্গে সঙ্গে সরতে থাকে। ছায়াটা হামাগুড়ি দিয়ে আমার বিছানার উপর পড়ে। জানালার একটা অংশ আমার বুকের উপর ছায়া ফেলে।

লাল নীলের চৌকো ডোরাকাটা চাদরে ঢাকা বড় খাটিয়ার উপর আমি শুয়ে থাকি, কিন্তু ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে আমার চোখ দুটো বুঁজে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন এক অসীম শূন্যতার মাঝে ডুবে যেতে থাকি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সহসা একটা ভীতি যেন আমাকে

ঝাঁকি মেরে জাগিয়ে দেয়। তখন গীর্জার ঘড়িটার ঢং ঢং শব্দ আমার কানে আসে। আমি বিছানায় ছটফট করি।

অবশেষে বিছানা ছেড়ে আবার পোশাক পরি। জানালা দিয়ে উঠে কুকুরটাকে তুলে জলাভূমিটার দিকে যাই। মাথার উপর চাঁদ জলজ্বল করছে, মৃদু বাতাস বইছে; সম্মুখে সমতল জলাভূমি পড়ে আছে। রেলওয়ের বাঁধটা আড়াআড়ি পড়ে আছে।

একটা ঝোপের নীচে বসে থাকি। একটু পরে রেলপথের উপর কয়েকটা সিগন্যাল-বাতি চোখে পড়ে। রাতের ট্রেন আসছে। ট্রেনের হেডলাইটটা আকাশ রেখা পর্যন্ত আলো বিস্তার করে। রেল লাইনে মৃদু ধাতব ধ্বনি শোনা যায়। আলোর রশ্মি আমার উপরও পড়ে। ট্রেনটা গর্জন করে আমার পাশ দিয়ে চলে যায়। ট্রেনের জানালাগুলো আলোতে উদ্ভাসিত। এক মুহূর্তের জন্য গাড়ীর কামরার অভ্যন্তরের মালপত্র আমার খুব কাছে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। সমান্তরাল লোহার রেল লাইন দুটো হেড লাইটের আলোতে জ্বল জ্বল করে। এবার দূর থেকে শুধু গাড়ীর পিছনের লাল বাতিটা ভুতুড়ে চোখের মতন জ্বলতে থাকে।

চাঁদটা আমার চোখের সামনে আস্তে আস্তে হলদে পাণ্ডুর হতে থাকে। আমি ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে প্রদোষের আবছা নীল অন্ধকারে চলতে থাকি। গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা টুপ টাপ করে আমাদের উপর পড়ছে। গাছের শিকড় আর পথে বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের সাথে হোঁচট খেয়ে খেয়ে যখন বাড়ী ফিরি তখন উপরে অরুণোদয় হয়ে গেছে। ঘরের প্রদীপটা তখনো জ্বলছে। আমি বেপরোয়া হয়ে ঘরের চারদিকে তাকাই। না, আমি এখানে লেগে থাকতে পারব না। এমনি করে নিজকে বিলিয়ে দিতে হলে আরো বিশ বছর বয়েস বাড়াতে হবে।

ক্লান্ত দেহে আমি আমার পরিহিত কাপড়চোপড় খুলতে থাকি। ভয়ঙ্কর বিরক্ত লাগে। ঘুমোতে যাওয়ার সময়ও। আমার হাত দুটো একত্র চেপে আছে—না, আমি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করব না—আমি এভাবে আত্মসমর্পণ করব না—

আবার আমি অসীম অতল শূন্যতায় ডুব দেই.........

এবং আমি অতি সাবধানে কেঁচোর মতন বেরিয়ে আসতে থাকি; ইঞ্চি ইঞ্চি করে। মাঠের বুকে সূর্যের সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়েছে; ঝোপ-ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে। নিথর গরম বাতাস; দিক চক্রবালে পর্যবেক্ষক বেলুন আর

মেঘের দল ভাসছে। আমার লৌহ শিরস্ত্রাণের আশেপাশে রক্তরঙিন পপি ফুল দুলছে।

কাঁটা গাছের ঝোপের ওপর থেকে একটা অতি অস্পষ্ট শব্দ যেন আমি শুনতে পাই; আবার সেই শব্দটা মিলিয়ে যায়। আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করি। একটা গোবরে পোকা সোনালী সবুজ ডানা মেলে আমার সামনে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। দুপুরের স্তব্ধতায় আবার একটা অস্পষ্ট খসখস শব্দ কানে আসে। ঝোপের উপর দিয়ে একটা লৌহ শিরস্ত্রাণের প্রান্ত ভাগ চোখে পড়ে। তাবপর একটা কপাল, দুটো স্পষ্ট চোখ। একটা কঠি মুখ সন্ধানী চোখে চারদিকে তাকিয়ে ফিরে গিয়ে কাগজে কি লিখতে থাকে। বিপদাশঙ্কামুক্ত মনে লোকটা নিকটবর্তী খামার আর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানচিত্রটা আঁকছে·········

আমি হাত বোমাটা অতি সন্তর্পণে উঠিয়ে পাশে রেখে দেই। তারপর হাত বোমাটার বোতাম টেনে কালো জাম গাছের দিকে নিক্ষেপ করে দ্রুত পদে নিজের পরিখায় ফিবে আত্মগোপন করি। মাটির সাথে দেহটা মিশিয়ে দিয়ে মুখটা তৃণাচ্ছাদিত মাটিতে লুকিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকি।

বোমা ফাটার শব্দটা আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়। বোমার টুকরোগুলো চারদিকে ছিটকে পড়ে; একটা তীক্ষ্ণ মর্মন্তুদ আর্তনাদ শোনা যায়। এবার দ্বিতীয় বোমাটা হাতে নিয়ে পরিখা থেকে উঁকি দেই। ইংরেজটা খোলা ময়দানে পড়ে আছে; হাঁটুর জোড়া থেকে তার দুটো পা উড়ে গেছে—রক্ত ঝবছে। তার পায়ের পট্টি দুটোর বাঁধন খুলে ফিতের মতন লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। সে উপুড় হয়ে বাহুর উপব ভব দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে আর মুখ হা করে চেঁচাচ্ছে।

সে চারিদিকে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পায়; তারপর দু বাহুর উপর ভর দিয়ে সীল মাছের মতন দেহের নিম্নাংশটা বহন করে আমার উদ্দেশে চেঁচাতে থাকে আর তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। রক্তক্ষয়ের ফলে তার লাল মুখটা ক্রমশঃ পাণ্ডুর হয়ে যায়; দৃষ্টি ঘোলা হয়ে চোখের পাতা বুঁজে আসে। তার চোখ আর মুখ গহ্বরটা শেষ পর্যন্ত তার দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু মুখাবয়বে দুটো অন্ধকার গুহার মতন দেখায়। তার দেহটা আস্তে আস্তে একটা কাঁটা-ঝোপের উপর নুয়ে পড়ে। সে উপুড় হয়ে সাঁতার কাটার মতন করে দুটো হাত নাড়ে। মুখটা হা করে তখনো সে চেঁচাচ্ছে।

আমি কেঁচোর মতন বেরিয়ে এসে নিজেদের ট্রেঞ্চের দিকে রওয়ানা হই। একবার পিছন পানে তাকাই। মৃত লোকটা সহসা আবার বেঁচে উঠেছে। সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, যেন আমার পিছনে ধাওয়া করতে চায়। আমি দ্বিতীয় হাত বোমাটা তার প্রতি নিক্ষেপ করি। বোমা লোকটার দেহ থেকে এক গজ দূরে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে থেমে যায়। আমি সময় গুনতে থাকি। কেন বোমাটা ফাটছে না? মৃত ব্যক্তি এবার সোজা দাঁড়িয়ে আমাকে দাঁত দেখিয়ে ভেঙচি কাটে। পরবর্তী হাত বোমাটা তাকে লক্ষ্য করে আমি নিক্ষেপ করি। সেটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সে ইতিমধ্যে কয়েক পা এগিয়েছে। এবার সে হাটুর উপর ভর করে আমার দিকে ছুটে আসছে, দাঁত বের করে হাসছে। তার বাহু দুটো আমার দিকে প্রসারিত। আমার শেষ হাত বোমাটা তার প্রতি নিক্ষেপ করি। এটা তার বুকের দিকে উড়ে যায়। সে হাত দিয়ে তা সরিয়ে দেয়। আমি পালিয়ে যাবার জন্য লাফ দিয়ে উঠি। কিন্তু আমার জানুদ্বয় মাখনের মতন অবশ অকর্মণ্য হয়ে গেছে। কিছুতেই নড়ছে না। অতি কষ্টে আমি জানুদ্বয় টেনে টেনে সামনে আনি। আমি আমার অনুসরণ-কারীর হাঁপানীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আমি আমার অকর্মণ্য পা দুটোকে হাতের সাহায্যে সামনে টেনে আনি। কিন্তু পিছন থেকে দুটো হাত আমার গলা টিপে ধরে আমাকে পিছনে টেনে মাটিতে ফেলে দেয়। মৃত লোকটা আমার বুকের উপর হাঁটু চেপে বসে আছে। যে পট্টিটা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তার পিছনে পিছনে আসছে সে সেই পট্টিটা আমার গ্রীবাদেশে জড়িয়ে পাক দেয়। আমি গ্রন্থিটা এড়াবার জন্য দেহ পেশী শক্ত করি। মাথাটা সরিয়ে নেই। কিন্তু না, একটা ঝাঁকুনিতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করি। মৃত লোকটা আমাকে টেনে হেঁচড়ে একটা গহ্বরে ফেলে দেবে বলে নিয়ে যাচ্ছে। সে আমাকে গড়িয়ে গড়িয়ে গহ্বরে ফেলছে। আমি আমার ভারসাম্য হারিয়ে একটা কিছু আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করছি। আমি গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছি—অতল গহ্বরে পড়ে যাচ্ছি। চীৎকার করছি। একটা কিছুর সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগে, আমি চীৎকার করি-----

আমার চারদিকে খণ্ড খণ্ড অন্ধকার। আমার পাশে কি যেন একটি ক্রম করে পড়ে। আমি সামনে যা পাই তারই উপর আঘাত করতে থাকি আর চেঁচাতে থাকি। কে যেন আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

আমি একটা রাইফেল কেড়ে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করি। আমি রাইফেল কাঁধে তুলে ঘোড়া টিপি। কে যেন আমার নাম ধরে ডাকে "বিরখলজ,"—"বিরখলজ," আমি লাফ দিয়ে উঠি। এই বুঝি সাহায্য এলো। এবার আমাকে মুক্ত হতে হবে। আমি মোচড় দিয়ে মুক্ত হয়ে দৌড় দেই। আমার হাঁটুতে আঘাত লাগে, আমি পড়ে যাই। এবার আলো দেখতে পাই—চোখ ধাঁধাঁনো আলো। এখন শুধু আমার চীৎকার ছাড়া কিছুই নেই। কে যেন আমার নাম ধবে আবার ডাকে। সহসা সব থেমে যায়।

খামার মালিক আর তার স্ত্রী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার দেহের অর্ধেকটা বিছানায় আর বাকীটা মেঝের উপর পড়ে আছে। আমার হাতে একটা ছড়ি। আমি ছড়িটা রাইফেলের মতন ধরে আছি। আমার দেহের কোন অঙ্গ থেকে নিশ্চয়ই রক্ত ঝরছে; তারপর দেখি যে কুকুরটা আমার হাত চাটছে।

"মাস্টার" খামার মালিকের স্ত্রী কম্পিত দেহে প্রশ্ন করে, "মাস্টার, কি হয়েছে?"

আমি তার কথা বুঝতে পারি না। "আমি কেমন করে এখানে পড়ে আছি?" তাকে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করি

"মাস্টার, জেগে উঠ—তুমি স্বপ্ন দেখছিলে।"

"স্বপ্ন? এমন স্বপ্ন দেখা যায়?" সহসা আমি হেসে উঠি। অট্টহাসি আমার শিরা উপশিরায় টান পড়ে; আমি এই হাসিতে যন্ত্রণা অনুভব করি——

সহসা আমার হাসি মিলিয়ে যায় "সেই ইংরেজ কাপ্তানটা" আমি অনুচ্চ কণ্ঠে বলি, "যাকে আমি———"

খামার মালিক তার আহত বাহুটা মালিশ করছে। "তুমি স্বপ্নে বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিলে, মাস্টার।" খামার মালিক বলে, "তুমি কোন কথাই শুননি, আমাকে প্রায় খুন করেছিলে।"

আমি তার কথার অর্থ বুঝতে পারিনা। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত অভাগা। আমার হাতের ছড়িটা সরিয়ে আমি শয্যায় বসে পড়ি। কুকুরটা আমার দু'পায়ের ফাঁকে আশ্রয় নেয়।

আমি আর শয্যা গ্রহণ করি না। আমি গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে টেবিলে বসে থাকি। বাতিটা জ্বলুক। আমি অনেকক্ষণ এমনিভাবে

বসে থাকি। একজন নিঃসঙ্গ সৈনিকই কেবল এমনিভাবে বসে থাকতে পারে। কতকক্ষণ পর আমি ঘরের অভ্যন্তরে অন্য মানুষের উপস্থিতি অনুভব করি; আমার দৃষ্টিশক্তি আর উপলব্ধি ক্ষমতা ফিরে আসে। আমি সামান্য চোখ তুলতেই দেখতে পাই যে আমি ঘরের আয়নাটার মুখোমুখি হয়ে বসে আছি। আয়নার ভিতর থেকে একটা প্রতিবিম্ব আমার দিকে সামান্য তির্যক ভঙ্গিতে চেয়ে আছে। মুখে তার কালো ছায়া আর তার চোখের চার দিকে কালশিটে দাগ। এটা আমারই মুখাবয়ব। আমি উঠে গিয়ে আয়নাটা সরিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে দিয়ে আসি।

সকাল হয়। আমি ক্লাসে যাই। কচি বাচ্চারা জোড়হাতে বসে আছে। তাদের চোখে মুখে শিশুসুলভ বিস্ময়। তারা আমার পানে এমনি প্রত্যয় নিয়ে চেয়ে আছে যে সহসা আমার বুকটা স্পন্দিত হয়।

এই আমি লক্ষ দেউলিয়াদের অন্যতম, যুদ্ধ যাদের সমস্ত প্রত্যয় আর শক্তি ধ্বংস করে দিয়ে গেছে—তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি এখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছি তোমরা আমার চেয়ে কত প্রাণবন্ত। সংসারের সাথে তোমাদের সম্বন্ধ আমার চেয়ে কত নিবিড়। আমি এখানে তোমাদের শিক্ষক আর পথ প্রদর্শকরূপে দাঁড়িয়ে আছি। তোমাদের আমি কি শিক্ষা দেব? তোমাদের বলে দেয়া কি উচিত হবে যে আগামী বিশ বছরের মধ্যে তোমরা শুকিয়ে পঙ্গু হয়ে যাবে, তোমরা স্বাধীন সক্রিয় অনুপ্রেরণা হারিয়ে নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে ঠিক আমাদের ছাঁচে গড়ে উঠবে? আমি কি তোমাদের বলে দেব যে যত দিন মানুষ প্রভুর নামে আর মানবতার নামে গ্যাস, ইস্পাত, বিস্ফোরক আর অগ্নির সাহায্যে যুদ্ধ করবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা, কৃষ্টি আর বিজ্ঞান চর্চা একটা বীভৎস প্রহসন মাত্র? হে আমার কচি-কাঁচার দল, যুদ্ধের এই কয়টা বছরে তোমরা যারা কলুষ-মুক্ত রয়েছ,—তোমাদের তা হলে আমি কি শিক্ষা দেব?

তোমাদের শিক্ষা দেবার কি যোগ্যতা আমার আছে? আমি কি তোমাদের এই শিক্ষা দেব যে কেমন করে হাত বোমার সলতে টানতে হয়? কেমন করে একটা মানুষকে লক্ষ্য করে নির্ভুলভাবে হাত বোমা নিক্ষেপ করতে হয়? আমি কি দেখিয়ে দেব কেমন করে মানুষের বুকে বেয়নেট বসাতে হয়, কেমন করে তাকে মুগুরের আঘাতে ধরাশায়ী করতে হয়, কোদাল দিয়ে কেমন করে জবাই করতে হয়? আমি কি হাতে কলমে তোমাদের শিখিয়ে দেব কেমন করে নিখুঁতভাবে স্পন্দিত বুক আর জীবন্ত

হৃৎপিণ্ড তাক করে রাইফেল ছুড়তে হয়? আমি কি তোমাদের বুঝিয়ে দেব ধনুষ্টঙ্কার কাকে বলে, ভাঙ্গা মেরুদণ্ড কি এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথার খুলিই বা কি? আমি কি বিশদ বর্ণনা দিয়ে তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মাথার মগজ দেখতে কেমন? চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থি এবং দেহাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসা পাকস্থলী কেমন দেখায়? আমি কি অনুকরণ করে দেখাব পাকস্থলীর জখমী কেমন করে কাতরায়, ফুসফুসের জখমী কেমন করে গলগল শব্দ করে এবং মাথার জখমী কেমন করে চিঁচিঁ করে? এর বেশী আমি কিছু জানিনা, শিখিনি।

আমি কি রঙিন মানচিত্রটার কাছে তোমাদের নিয়ে গিয়ে আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দেব যে অমুক অমুক স্থানে প্রেমের অপমৃত্যু ঘটেছে? মানুষের বুক থেকে প্রেম নিশ্চিহ্ন হয়েছে? আমি কি তোমাদের বুঝিয়ে দেব যে তোমাদের হাতের পুস্তকগুলোর জাল পেতেই পরিকল্পিত উপায়ে মানুষ তোমাদের ফাঁদে ফেলেছে, সুন্দর সুন্দর বাক্য বিন্যাসে তোমাদের জড়িয়েছে, মিথ্যে ধারণার কাঁটা-বেড়ায় তোমাদের বন্দী করেছে?

আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি অপরাধী, আমার দেহ মন কলুষিত। তোমাদের প্রতি আমার একটি মাত্র আবেদন, তোমরা যেমনটি আছ তেমনটি থাক। তোমাদের শৈশবের উজ্জ্বল আলোক কোনো ঘৃণা বিদ্বেষের অগ্নিশিখা রূপে অপব্যবহৃত হতে দিয়োনা। তোমাদের শ্বাস-নিঃশ্বাস এখনো পবিত্র আর কলুষমুক্ত। তোমাদের শিক্ষা দেয়ার আশা কেমন করে পোষণ করব? আমার রক্তাক্ত অতীত এখনো আমাকে অনুসরণ করছে। আমি কোন দুঃসাহসে তোমাদের সাহচর্যে অবস্থান করব? আমাকে কি আবার নতুন করে মানুষ হতে হবে না?

আমার সারা দেহে খিঁচুনি অনুভব করি। আমি যেন পাথরে পরিণত হচ্ছি। আমি যেন ভেঙ্গে পড়ছি। আমি ধীরে ধীরে চেয়ারের উপরে নুয়ে পড়ছি। এবার উপলব্ধি করছি যে আমি এখানে আর থাকতে পারিনা। আমি একটা কিছু অবলম্বন হিসেবে ধরতে চাই, কিন্তু পারি না। কতক্ষণ পর—আমার মনে হয় অনেকক্ষণ—আমার মূর্চ্ছিত অবস্থার অবসান হয়। "হে শিশুর দল, আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, এখন তোমরা যেতে পার। আজ তোমাদের ছুটি।"

আমি তাদের সঙ্গে তামাশা করছি কি-না, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কচি বাচ্চারা আমার দিকে চায়। আমি আবার মাথা নেড়ে বলি,

"হ্যাঁ, তোমাদের ছুটি—বাড়ী গিয়ে খেলা কর, তোমাদের বিড়াল-কুকুর নিয়ে খেলা কর। আজ আর তোমাদের আসতে হবে না।"

তারা হুড়োহুড়ি করে বই-খাতাগুলো নিজেদের থলিতে ভরে কলরব করে ছুটে বেরিয়ে যায়।

আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধেছেদে পাশের গায়ে উইলির কাছে বিদায় নিতে যাই। সে জানালার পাশে বসে বেহালা বাজানো অভ্যেস করছে। তার টেবিলের উপর উত্তম খাদ্য সামগ্রী সাজানো।

"এই হবে আমার তৃতীয় আহার পর্ব," সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, "তুমি জেনে রাখ, আমি এখন উটের মতন ভবিষ্যৎ সংস্থানের দূরদর্শিতা নিয়ে যেতে পারি।"

আমি তাকে জানাই আজ বিকেলেই আমি এই স্থান থেকে চলে যাব। কাউকে প্রশ্ন করা উইলির স্বভাব নয়। সে চিন্তিত কণ্ঠে বলে, "আর্নস্ট, এখানে সব কিছু ধীর মন্থর গতিতে চলছে তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যত দিন তারা আমাকে এমনি করে যেতে দেবে, ততদিন দশটা ঘোড়াও আমাকে টেনে হেঁচড়ে এখান থেকে সরাতে পারবে না।"

এই বলে টেবিলের তলা থেকে সে একটা বিয়ারের বোতল বের করে বোতলের লেবেলটা প্রদীপের আলোতে ধরে বলে, "চমৎকার জিনিস!"

আমি অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে বলি, "হায় উইলি! আমি যদি তোমার মতন হতে পারতাম।"

"আমি তা বিশ্বাস করি।" বলে সে হেসে বোতলের ছিপিটা খোলে।

স্টেশনের পথে দুটো ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে মাথার চুল দুলিয়ে দুলিয়ে পাশের বাড়ী থেকে ছুটে এসে আমাকে অভিবাদন জানায়। তারা এই মাত্র একটা মরা ছুঁচো বাগানে সমাধিস্থ করে এসেছে। ছুঁচোটার জন্য তারা শেষ প্রার্থনা করেছে। এ খবরটা তারাই আমাকে দেয়। আমার সাথে করমর্দন করে তারা আমাকে সম্ভ্রমে বিদায় জানায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"আর্নস্ট, তোমার সঙ্গে সামান্য কয়েকটা কথা বলা দরকার।" বাবা বলেন।

কি কথা হবে, আমি আন্দাজ করতে পারি। কয়দিন থেকেই তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ কয়দিন প্রায়ই বাইরে কাটিয়ে আমি তাকে এড়িয়ে গেছি।

আমরা দুজন আমার ঘরে যাই। তিনি একটা শোফায় বসেন। তাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। "তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত, আর্নস্ট।" তিনি বলেন। আমি বুক কেস থেকে এক বাক্স সিগার বের করে বাবাকে দেই। তার চোখেমুখে খুশীর আমেজ দেখা দেয়। ভালো সিগার। কার্লের কাছ থেকে এনেছিলাম। সে বাজে সিগার খায় না।

"তুমি কি সত্যি শিক্ষকতার চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছ?" বাবা জিজ্ঞেস করেন। আমি ইতিবাচক মাথা নাড়ি।

"কেন তা করলে জিজ্ঞেস করতে পারি?"

আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দেই। কেমন করে তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব? আমরা দুজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। পরস্পরকে বুঝতে পারিনি বলেই আমরা এক সঙ্গে এতদিন কাটিয়ে দিতে পেরেছি।

"এখন কি করবে ভাবছ?" তিনি প্রশ্ন করেন।

"তা, যে কোন একটা কাজ," আমি জওয়াব দেই। "আমার জন্য সবাই সমান।"

তিনি আহত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে ভালো এবং সম্ভ্রান্ত কাজ এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। তার কথা আমি সহানুভূতি সহকারে শুনি বটে, কিন্তু তার কথায় আমার বিরক্তি ধরে যায়। অদ্ভুত মনে হয় যে অদূরে উপবিষ্ট লোকটা আমার বাবা আর তিনিই আগে আমার জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কিন্তু সীমান্তে আমার জীবনের কয়েকটা

বছর তিনি আমার দেখাশোনা করতে পারেননি। আমার ব্যারাক জীবনেও তিনি আমাকে কোন সাহায্য করতে পারেননি। যে-কোন এন-সি-ওর প্রতিপত্তি সেখানে তার ,চেয়ে অনেক বেশী। আমি নিজে নিজেই ত সেখানে বেশ কাটিয়ে এসেছি। তিনি বেঁচে আছেন কি নেই, সে ভাবনাও বড় একটা করিনি।

তার কথা শেষ হলে আমি তাকে এক গ্লাস কপনেক ঢেলে দেই। "তা হলে শোন বাবা," বলে আমি তার মুখোমুখি বসি। "আপনি হয়ত খাঁটি কথাই বলেছেন, কিন্তু ভেবে দেখুন, মাটির গর্তে বসে এক টুকরো রুটির খোসা আর এক ফোঁটা পাতলা সুপ খেয়ে কেমন করে বেঁচে থাকতে হয় তা আমি শিখেছি। যতক্ষণ শত্রুপক্ষের বোমা বর্ষণ না হয় ততক্ষণ এতেই আমরা তুষ্ট থাকতাম। কোন পুরানো কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় লাভ ত ছিলো রীতিমতন বিলাস। আর বিশ্রাম অঞ্চলে একখানা মাদুর পেলে ত স্বর্গসুখ। সুতরাং বুঝতে পারছেন যে আমি যে এখনো বেঁচে আছি. আর বোমা বর্ষণ হচ্ছে না, আমার পক্ষে এই মুহূর্তে তাই যথেষ্ট। আমার প্রয়োজনীয় সামান্য পরিমাণ পানাহার আমি যে কোন প্রকারে যোগাড় করতে পারব। বাকীটার জন্য আমার ভবিষ্যৎ জীবন পড়ে আছে।"

"হ্যাঁ" তিনি আপত্তির সুরে বলেন, "রোজ-আনা, রোজ-খাওয়া ত জীবন নয়। এমনভাবে বেঁচে থাকা--------"

"যার যা ভালো লাগে" আমি বলি, "এ জীবনের ত্রিশটি বছরেব প্রতিটি দিন স্কুলের একই কামরায় বা একই অফিসে হাজির হয়েছি বলতে পারাটাও জীবন নয়।"

বাবা বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে বলেন, "গেলো বিশটি বছর আমি পিজবোর্ড কারখানায় যাতায়াত করেছি, কিন্তু এমনি বুঝে শুনে চলেছি যে আমাকে কারো কাছে মাথা নত করতে হয়নি।"

"আমি ফন্দী-ফিকির করে কিছু হতে চাই না বাবা। আমি শুধু বেঁচে থাকতে চাই।"

"আমিও বেঁচেছি, সততা ও সম্মানের সাথেই বেঁচেছি।" তিনি গর্ব ভরে বলেন। "অকারণে আমি চেম্বাব অব কমার্সে নির্বাচিত হইনি।"

আমি রুক্ষ কণ্ঠেই বললাম, "আপনি যে এত সহজে তা পেয়েছেন সে জন্য কৃতজ্ঞ থাকুন।"

"কিন্তু তোমাকে যে একটা কিছু করতেই হবে তাত তুমি বোঝ।" তিনি অভিযোগের সুরে বলেন।

"আপাততঃ আমি আমার এক সৈনিক বন্ধুর কাছে একটা কাজ পেতে পারি। তিনি একটা প্রস্তাবও দিয়েছেন। তাতেই আমার প্রয়োজন মিটে যাবে," আমি জওয়াব দিলাম।

তিনি মাথা দুলিয়ে বললেন, "আর সে জন্য তুমি একটা ভালো বেসামরিক চাকরি ত্যাগ করবে?"

"বাবা, জীবনে আমাকে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে।"

তিনি বিরাগব্যঞ্জক অভিব্যক্তি সহকারে সিগারে একটা টান দিয়ে বলেন, "পেনশন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও।"

"ওহো-হো।" আমি হেসে বলি, "এমন সৈনিক কোথায় আছে যে ষাট বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে? আমাদের অস্থি-মজ্জায় এমন সব ব্যাধি লুকিয়ে আছে যা পরে আত্মপ্রকাশ করবে। ষাট বছর বয়েসের আগেই আমরা তল্পী গুটাব। তা নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমার সব কামনা বাসনা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে আমি ষাট বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকব। বিশ বছর বয়েসের কত তরুণকে আমি মরতে দেখেছি।"

আমি ভাবনা-বিভোর মনে সিগারেটে টান দিতে দিতে আমার বাবার পানে তাকাই। আমি দেখি যে তিনি আমার বাবা আর এটাও দেখি যে তিনি আমার চেয়ে বয়স্ক, একজন দয়ার্দ্র চিত্ত বাস্তববুদ্ধি বিবর্জিত পণ্ডিত-সুলভ সাবধানী ব্যক্তি মাত্র। আমার জীবনে তার মতামতের কোন অর্থ নেই। আমার মনে একটা ছবি ভেসে ওঠে। যুদ্ধ সীমান্তে গেলে তার কি দশা হতো। অন্যরা তার দেখা শোনা না করলে তার চলতো না। নিশ্চয়ই তিনি একজন এন-সি-ও পর্যন্ত হতে পারতেন না।

লুদভিগকে দেখতে যাই। সে অনেক পুস্তকপুস্তিকা নিয়ে বসে আছে। আমার অনেকগুলো সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই। সে হয়ত আমাকে পথ বাতলে দিতে পারবে; কিন্তু সে নিজেই আজ অশান্ত চঞ্চল। আমরা অল্পক্ষণ আজেবাজে কথা বলার পর সে বলে ওঠে "আমাকে এখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে"

"এখনো আমাশা আছে নাকি?" আমি জানতে চাই। "না, অন্য রোগ।"

"কেন? ব্যাপার কি লুদভিগ?" আমি বিস্ময়ে প্রশ্ন করি। সে কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকে; তার ঠোঁট কাঁপে। তারপর বলে, "আমি জানি না।"

"তুমি চাও যে আমিও তোমার সঙ্গে যাই? আমার এখন বিশেষ কোন কাজ নেই।"

টুপিটা খুঁজতে খুঁজতে সে বলে, "হ্যাঁ, তুমি সঙ্গে এসো।" পথ চলতে চলতে সে বার বার আমার দিকে আড়চোখে তাকায়। লিণ্ডে স্ট্রীটে মোড় নিয়ে আমরা একটা বাড়ীতে প্রবেশ করি। বাড়ীর সামনে একটা জীর্ণ বাগান। দরজায় একটা এনামেলের নাম ফলক। ফলকে 'ডাক্তার ফ্রেডারিখ সালটস—চর্ম, মূত্রাশয় ও যৌন ব্যাধি বিশেষজ্ঞ' লেখা রয়েছে। আমি থমকে দাঁড়াই। "ব্যাপারটা কি লুদভিগ? স্পষ্ট করে আমাকে তাই বল। যদি সামান্য একটা ফোঁড়া হয়ে থাকে, তাতে এমন কি হয়েছে লুদভিগ?" আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। "আমার যা দুষ্ট ব্রণ হয়েছিলো তা যদি তুমি দেখতে। কয়েকটা ত হয়েছিলো ইয়া বড়! শিশুর মস্তকের মত দেখতে। আমরা যে বাজে নোংরা খাবার খাই, তা থেকেই এগুলো হয়।"

আমরা ঘন্টা বাজাই। সাদা আংরাখা পরা একজন সিস্টার এসে দরজা খুলে দেয়। অমার্জিত ময়লা চেহারা নিয়ে ওয়েটিং রুমে ঢুকতে আমরা বিব্রত বোধ করি। প্রভুকে ধন্যবাদ, সে ঘরে আর কেউ নেই। টেবিলের উপর কয়েকটা ম্যাগাজিন ইতস্ততঃ পড়ে আছে। আমরা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাই। সবগুলো ম্যাগাজিন পুরানো।

ডাক্তার আসে। তার চোখের চশমা চিকচিক করে। তার পিছনে আধখোলা পরামর্শ কক্ষ। সেখানে নিকেলের পাত লাগানো চামড়ার গদি আটা একটা চেয়ার দেখা যায়। ভয়ঙ্কর বাস্তব আর যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য।

এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে অনেক ডাক্তারই তাদের রোগীদের শিশুর মতন গণ্য করে। দন্ত চিকিৎসকদের বেলায় এটা তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের অঙ্গ। এখানেও সে রকমই মনে হয়।

"তা হলে মিস্টার ব্রেয়ার।" সর্পের মতন কুটিল চশমা পরা লোকটা রসিকতা করে বলে, "আমাদের পরিচয় শীগগিরই আরো ঘনীভূত হতে যাচ্ছে।"

লুদভিগ ভূতের মতন অনড় দাঁড়িয়ে ঢোক গিলে "তা হলে এটা কি—"

ডাক্তার সোৎসাহে মাথা নাড়ে। "রক্ত পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে। পজিটিভ। এবার শক্ত হাতে পুরানো বদমায়েশটার মোকাবেলা করতে হবে।"

"পজিটিভ।" লুদভিগ তোতলিয়ে বলে, "তার অর্থ হলো আমার সিফিলিস হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

একটা মাছি ভন ভন করে উড়তে উড়তে জানালায় গিয়ে আঘাত করে। কালের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে, চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বাতাসের প্রবাহ রুদ্ধ, বিশ্ব প্রকৃতি বদলে গেছে। একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কা নিশ্চয়তায় পরিণত হয়েছে।

"রক্ত পরীক্ষার ফলাফল কি মিথ্যে হতে পারে না?" লুদভিগ প্রশ্ন করে: "আবার পরীক্ষা করে দেখা যায় না?"

ডাক্তার মাথা নাড়ে। "এখন তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করাই বিধেয়। রোগটা দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ছে।" 'লুদভিগ ঢোক গিলে বলে, "রোগটা কি আরোগ্যসাধ্য?"

ডাক্তারের মুখখানা উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার চোখেমুখে প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা।

"সম্পূর্ণ আরোগ্যসাধ্য। এই টিউবের ঔষধটা প্রথম পর্যায়ে অন্ততঃ ছয় মাস ইনজেকসন দিতে হবে। দেখা যাবে ফলাফল কি হয়। হ্যাঁ, আজকাল সিফিলিস সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।"

"সিফিলিস।" কথাটাই ঘৃণ্য। শুনলেই একটা লিকলিকে কালো সাপের কথা মনে হয়।

"যুদ্ধ সীমান্তে অবস্থান কালেই কি এই রোগ সংক্রামিত হয়েছে?" ডাক্তার প্রশ্ন করে। লুদভিগ ইতিবাচক মাথা নাড়ে।

"সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করাওনি কেন?"

"আমি তখন বুঝতে পারিনি। আগে কেউ আমাকে এ কথা বলেনি। তার বেশ কিছু দিন পর এই রোগ দেখা দেয়, তবে তখন তা ক্ষতিকর বলে মনে হয়নি। তারপর তা নিজে নিজেই সেরে যায়।"

ডাক্তার মাথা দুলিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে, "এটা হলো এই রোগের একটা লক্ষণ।"

ক্রোধে ডাক্তারের মাথায় চেয়ার তুলে আঘাত করতে ইচ্ছে হয়। সে ভালো করেই জানে তিন দিনের ছুটিতে রাতের ট্রেনে সোজা বোমা বিধ্বস্ত নোংরা গর্ত থেকে রক্তমাখা অপরিচ্ছন্ন দেহে আলোকোজ্জ্বল রাজপথ, বিপনী সম্ভার আর মেয়ে মানুষে ভরা ব্রুসেলস শহরে আসার অর্থ কি। সেখানে মনোরম হোটেল কক্ষ আছে, স্নানাগার আছে। আগন্তুকেরা সেখানে প্রাণভরে মদ্যপান করতে পারে, দেহের ময়লা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে পারে। সেখানে সুমধুর মন-মাতানো সঙ্গীত মনোরম চত্বর আর দামী সুরার ব্যবস্থা আছে। এই লোকটা খুব ভালো করেই জানে, সীমান্তের বিভীষিকাময় জীবনের ফাঁকে ফাঁকে শহরের এই নীলাভ আবছা পরিবেশের মধ্যে কি মোহিনী আকর্ষণ নিহিত আছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ফাঁকে এ যেন জ্যোৎস্নার ঝলক। এক মৃত্যু থেকে অন্য মৃত্যুর ক্ষণিক অবসর মুহূর্তে জীবনের জন্য চীৎকার। কে জানে হয়ত কয়েকদিনের মধ্যেই কাঁটা তারের বেড়ায় তার ক্ষত বিক্ষত অঙ্গ ঝুলবে; বুক ফাটা তৃষ্ণায় আর্তনাদ করে তার জীবনের অবসান হবে। তাই জীবনের সুরা-পাত্রে আরো একটি চুমুক। জীবনে আরো একটি নিঃশ্বাস, বর্ণ-গন্ধ-স্বপ্নময় নারীর রূপ লাবণ্য আর একবার উপভোগ, প্রাণ মাতানো মধুর প্রলাপ মুখরিত পৃথিবীর পানে আর একবার ক্ষণিক দৃষ্টিপাত। তাতে দোষ কি? এই ক্ষণিক উপভোগের ফলেই রক্ত ধারা কালো হয়ে শিরা উপশিরায় বইতে থাকে। এরই ফলে এই কয়েকটি বছরের গ্লানিময় জীবন, মস্তিষ্ক বিকৃতি আর নৈরাশ্যের রূপান্তর ঘটে। জীবন হয়ে ওঠে মধুময়। জীবনে মধুর স্মৃতি ও আশা আনন্দের স্রোত বইতে থাকে। আগামী কাল মৃত্যু আসবে মারণাস্ত্র—বন্দুক, হাতবোমা অগ্নি গোলক, রক্ত স্রোত আর বিনাশ নিয়ে। কিন্তু আজকের এই পেলব কোমল সুরভিত নারীদেহ, এই ত জীবন। কি মাতালকরা দুঃখ-হরা নারীর কোমল বাহু বল্লরীর আলিঙ্গন। এই আলিঙ্গনের তীব্র মধুর যন্ত্রণায় দেহ মর্মর করে, উত্তেজনায় দেহকোষ জ্বলে ওঠে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফেটে পড়ে। আকাশে আগুন লাগে। বর্ষণে দেহ শীতল হয়। সেই মুহূর্তে কে ভাবে যে এই মোহনীয় পরিবেশ আর মধুময় প্রলাপ কূজনের অন্তরালে নারীর এই সুরভিত দেহ সম্ভারের অভ্যন্তরে সিফিলিস নীরবে ওত পেতে আছে। কে তখন জানে বা জানতে চায় ভবিষ্যতের কথা?

আগামী কাল? আগামী কাল হয়ত সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। জঘন্য যুদ্ধ। জঘন্য যুদ্ধই বর্তমানকে স্বীকৃতি দিতে আর বর্তমান মুহূর্তকে উপভোগ করতে শিখিয়েছে।

"তা হলে এখন?" লুদভিগ প্রশ্ন করে।

"যত শীগগির সম্ভব চিকিৎসা শুরু করা যাক" ডাক্তার জওয়াব দেয়।

"তা হলে এক্ষুণি শুরু হোক।" লুদভিগ শান্তকণ্ঠে বলে। সে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ কক্ষে প্রবেশ করে।

আমি প্রতীক্ষা-কক্ষে বসে থেকে পুরানো ম্যাগাজিনটার পাতা ছেঁড়ার কাজে ব্যস্ত থাকি; কারণ এতে আছে শুধু কুচ-কাওয়াজ, যুদ্ধ বিজয়ের ছবি আর যুদ্ধবাজ পাদরীদের নীতি বচন।

লুদভিগ ফিরে আসে। "অন্য কোন ডাক্তার দেখাও লুদভিগ।" আমি তার কানে কানে বলি। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বেটা কিছু জানেনা। এই বেটার ঘিলু নেই।" লুদভিগ ক্লান্তিব্যঞ্জক ভঙ্গি করে। আমরা নীরবে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি। সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "তা হলে বিদায়------"

আমি তার দিকে মুখ তুলে তাকাই। সে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো পকেটে পুরে সিঁড়ির রেলিঙে হেলান দিয়ে আছে।

"হলো কি?" আমি বিস্মিত কণ্ঠে বলি।

"আমি এবার যাই" সে জওয়াব দেয়।

"তা হলে হাতটা এগিয়ে দাও। দেবেনা?" আমি অবাক। কম্পিত কণ্ঠে সে প্রতিবাদ করে। "আমাকে এখন তোমার ছোঁওয়া উচিত নয়। আমার যে এখন--------" সে সসঙ্কোচে তার রুগ্ন দেহটা নিয়ে রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, পিছন থেকে শত্রুর আক্রমণ এড়িয়ে থাকার জন্য মাটির ঢিবির আড়ালে যেমন করে দাঁড়ায়। বিষণ্ন আনত তার দৃষ্টি। "আহ্ লুদভিগ। লুদভিগ, এর পর আর কি বাজে কথা বলবে? তোমাকে ছোঁবনা? বেকুব, গাধা কোথাকার। তোমাকে ছোঁবনা? এক শো বার ছোঁব-----" তার কথাটা আমার মর্মে আঘাত করেছে। আমার কান্না পাচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর বোকা। আমি তার কাঁধে আমার হাত রেখে তাকে কাছে টানি, দেহ তার কাঁপছে----
"আহ্ লুদভিগ। এসব বাজে কথা। আমি জানি, আমার নিজেরও এ

রোগ হতে পারে। তুমি ঘাবড়িয়ো না। ঐ চশমা পরা বুড়ো সাপটাই তোমাকে রোগমুক্ত করে দেবে।" সে তবু কাঁপতে থাকে। তার কাঁপুনি থামেনা। আমি তাকে চেপে ধরে রাখি।

(২)

আজ অপরাহ্নে রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হয়েছে। গেলো কয়মাস থেকে দ্রব্যমূল্য অব্যাহত ভাবে বেড়ে চলছে। যুদ্ধকালীন সময়ের চেয়েও মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য বেড়ে গেছে। যে মজুরি পাওয়া যায় তা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানুষের কাছে যে টাকা পয়সা আছে তা দিয়ে কিছু কেনা সম্ভব নয়। অথচ মদ আর নাচের আড্ডার জন্য বিরাট বিরাট অট্টালিকা একটার পর একটা তৈরী হচ্ছে আর প্রকাশ্যে মুনাফাখোরি আর জুচ্চোরি চলছে।

ধর্মঘট। শ্রমিকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে রাজপথের উপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে। কখনো কখনো গোলমাল হচ্ছে। গুজব রটেছে যে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে একত্র করা হয়েছে, তবে তার কোন লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

এখানে-ওখানে চিৎকার ও প্রতি-চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কে একজন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। তারপর সহসা সব জায়গায় স্তব্ধতা নেমে আসে।

যুদ্ধ সীমান্তের ট্রেঞ্চ ফেরত রঙ-চটা উর্দিপরা লোকদের একটা মিছিল ধীর পদক্ষেপে আমাদের দিকে আসছে।

প্রতি সারিতে বারজন করে তারা আসছে। তাদের সামনে বৃহদাকার প্ল্যাকার্ড: "কোথায় পিতৃভূমির কৃতজ্ঞতা?" "যুদ্ধে আহত পঙ্গুর দল অনাহারে আছে।"

এক হাতওয়ালা মিছিলকারীরা প্ল্যাকার্ডগুলো বহন করে চলছে আর বার বার পিছন পানে তাকিয়ে দেখছে তাদের পিছনের মিছিল ঠিক মতন আসছে কিনা, কারণ প্ল্যাকার্ড বাহকেরা সবচেয়ে দ্রুত পায়ে চলছে।

তাদের যারা অনুসরণ করছে, গলায় চামড়ার ফালি বাঁধা পোষা কুকুর তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরগুলোর গলা-বন্ধনীতে অন্ধজনের পরিচয় বাহক রেডক্রস চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। কুকুরগুলো সর্তক দৃষ্টি মেলে তাদের মনিবদের নিয়ে যাচ্ছে। মিছিল থেমে পড়লে কুকুরগুলো দাঁড়িয়ে

পড়ে আর সংগে সংগে অন্ধ মিছিলকারীরাও থেমে যায়,। মাঝে মাঝে পথের কুকুরগুলো পোষা কুকুরগুলোকে তাড়া করে মিছিলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে লেজ নেড়ে ঘেউ ঘেউ করে পোষা কুকুরগুলোর সংগে খেলা করতে চায়। পোষা কুকুরগুলো নির্লিপ্ত চিত্তে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; তবে কান খাড়া করে সতর্ক দৃষ্টিতে পথ চলতে থাকে। পথের কুকুরের সাথে ছুটোছুটি লাফালাফি করার ইচ্ছে এদের নেই। এরা এদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। এরা এদের স্বগোত্রদের থেকে নিজেদের পৃথক করে ফেলেছে, যেমন করে সিস্টার অব মার্সির সেবিকারা নিজেদের বিপনীবালাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। পথের কুকুরগুলোও নাছোড়বান্দা হয়ে থাকেনা ; কয়েক মিনিট পরে এগুলো পালিয়ে যায়। কেবল হৃষ্টপুষ্ট কোন কোন কুকুরই মিছিল চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ করে।

চক্ষুহীনতা মানুষের চেহারা এমনি বদলে দেয় যে তা এক অদ্ভুত ব্যাপার। চেহারার উপরের অর্ধাংশ কেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কথা বলার সময় মুখাবয়ব তুলনামূলকভাবে কেমন কুৎসিৎ মনে হয়। কেবল মুখের নিম্নাংশই সজীব থাকে। গুলি খেয়ে তারা অন্ধ হয়েছে। তাই তাদের আচরণ জন্মান্ধদের আচরণ থেকে ভিন্ন। জন্মান্ধদের চেয়ে উগ্রতর তাদের আচরণ, তবে তারা অধিকতর সতর্ক। জন্মান্ধদের নির্লিপ্ততায় তারা এখনো অভ্যস্ত হতে পারেনি। রঙ বৈচিত্র্য, আকাশ, পৃথিবী ও প্রদোষের স্মৃতি এখনো তাদের মনে বিরাজ করছে। এখনো কেউ তাদের সঙ্গে কথা বললে, কে কথা বলছে তা জানার জন্য তারা অনিচ্ছায় মাথা ঘুরিয়ে দেখতে চায়। কারো কারো চোখে কালো পট্টি বাঁধা, তবে বেশীর ভাগই পট্টি বাঁধেনা, তাতে যেন তারা রঙ আর আলোর নৈকট্য লাভে সমর্থ হবে। তাদের চোখের পাতা বন্ধ ও নির্জীব। নিচের পাতাটাই সামান্য খোলা আছে। চোখের নিচ দিকটায় ক্ষতচিহ্ন, ভিজে আর লালচে। তাদের অনেকেই স্বাস্থ্যবান। সুস্থ সবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা আর খেলাধূলা করতে তাদের মন চায়। তাদের আনত মস্তকের পিছন দিকে মার্চ মাসের সান্ধ্য সূর্যের নিষ্প্রভ আলো পড়ছে। বিপনী গবাক্ষে আলো জ্বলে উঠছে কিন্তু সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ তারা তাদের চোখের পাতায় বড় একটা অনুভব করতে পারেনা। ভারি বুট পায়ে তারা চিরস্থায়ী অন্ধকারে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। তাদের চারদিকে মেঘের ঘন আবরণ। তাদের চিন্তাক্লিষ্ট মনে প্রচুর

আহার আর স্বচ্ছন্দ জীবনের অব্যাহত ভাবনা। তাদের মনের অন্ধকার কন্দরে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের আলোড়ন। অসহায় ও অস্পষ্ট ভীতি বিহ্বল চিত্তে তারা এই দুঃখ মোচনের আশা করছে, কিন্তু কোথাও আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না। তারা অন্যান্য অনেকের সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে রাজপথে মিছিল করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না। পথ চলতে চলতে তারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মুখ তুলে চাইছে। যারা চক্ষুষ্মান তাদের কাছে তারা মুক মৌন আবেদন জানাচ্ছে। চক্ষুষ্মানেরা তাদের এই দুঃখ দুর্দশা অনুধাবন করুক।

অন্ধদের পিছনে চলছে এক-চক্ষু কানার দল। তাদের মস্তকদেশ ক্ষত বিক্ষত। চেহারা ছিন্নভিন্ন। মুখাবয়ব; বিকট দর্শন, নাসিকা আর চোয়াল বিহীন মুখাবয়ব। সারা মুখ জুড়ে একটা দীর্ঘ রক্তিম ক্ষত চিহ্ন। এক কালে এখানে নাসিকা আর মুখ বিবরের অস্তিত্ব ছিলো। এই শূন্যতার উপর বিরাজ করছে একটা প্রশ্নব্যঞ্জক মানবীয় চোখ।

তাদের অনুসরণ করছে পা-কাটা লোকদের একটা দীর্ঘ সারি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই কৃত্রিম পা লাগিয়ে পথের উপর ঠক ঠক করে লাফিয়ে লাফিয়ে এঁকে বেঁকে চলছে। মনে হয় তাদের সারা দেহটাই লোহা আর কব্জার তৈরী কৃত্রিম। অন্যরা পায়জামা উপরে গুটিয়ে সেফটিপিন দিয়ে তা আটকে নিয়েছে। তারা কালো রঙের রবারের প্যাডে মোড়া ক্রাচে ভর দিয়ে চলছে।

তারপর আসে গোলার অভিঘাতে বিধ্বস্ত স্নায়ু কাঁপুনের দল। তাদের হাত, মাথা, পরিহিত পোশাক আর সারা অঙ্গ কাঁপছে। তাদের দেহ যেন এখনো আতঙ্কে শিউরে উঠছে। দেহের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাদের ইচ্ছাশক্তি বিলুপ্ত; তাদের মাংসপেশী আর স্নায়ুকেন্দ্র অবাধ্য।

এক চক্ষু আর একহাত ওয়ালারা অয়েল ক্লথে মোড়া বেতের ঠেলা গাড়ী ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এসব গাড়ীতে সেই সব ভয়ঙ্কর জখমীরা রয়েছে, যারা একমাত্র চাকাওয়ালা গাড়ীতেই চলাফেরা করতে পারে। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা সমতল ঠেলাগাড়ীতে আসছে। এমনি সব গাড়ীতে খাট, পালঙ্ক আর মৃতদেহ বহন করা হয়। এমনি একটা গাড়ীতে একজন হস্তপদবিহীন মানুষ উপবিষ্ট রয়েছে। কটিদেশ থেকে দেহের নিম্নাংশের কোন অস্তিত্ব নেই। একজন সুস্থ সবল মানুষের উর্ধ্বাংশ মাত্র। এর বেশী কিছু অবশিষ্ট নেই। প্রশস্ত স্কন্ধ দেশ,

সবল সাহসী মুখাবয়বে এক বিরাট গোঁফ জোড়া, মাথায় পিক ক্যাপ। এককালে সে হয়ত আসবাব পত্রের কারবার করতো। তার পাশে একটা প্ল্যাকার্ড। তাতে হিজিবিজিভাবে লেখা রয়েছে "বন্ধুগণ, আমাদেরও হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছে করে।" নিশ্চয়ই সে নিজেই তা লিখেছে। গম্ভীর মুখে সে বসে আছে; মাঝে মাঝে বাহুতে ভর দিয়ে সে সামনের দিকে নড়ে আসন পরিবর্তন করে।

তার পিছনে জানুদেশ থেকে কর্তিত পদ যুগল ও দুই বাহুবিহীন এক বিষণ্ণ তরুণ। ঘোড়ার খুরের মতন করে পুরু চামড়া দিয়ে তার জানুদ্বয় মোড়ানো। দেখতে এমন অদ্ভুত মনে হয় যে অনিচ্ছায়ই গাড়ীর তলার দিকে দৃষ্টি যায়। মনে হয়, হয়ত গাড়ীর তলায় তার পা দুটো ঝুলে ঝুলে চলছে। কর্তিত বাহুর উপরিভাগ দিয়ে সে একটা প্ল্যাকার্ড বহন করছে, "আমাদের মতন হাজার হাজার মানুষ হাসপাতালে পড়ে আছে।"

ক্লান্ত মন্থর গতিতে মিছিল রাজপথ দিয়ে চলছে। যে জায়গা দিয়ে মিছিল অতিক্রম করে সে জায়গাটা স্তব্ধ নিথর হয়ে যায়। হুক স্ট্রীটের মোড়ে মিছিলটাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সেখানে নতুন একটা নাচ ঘর নির্মাণের কাজ চলছে। চুন, সিমেণ্ট, বালি, ইট ইত্যাদি নির্মাণ উপাদানে রাজপথ বন্ধ হয়ে আছে। নির্মীয়মান প্রাসাদের প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান স্তম্ভের মাঝখানে আলোকোজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে, "এস্টোরিয়া ডানস এণ্ড ওয়াইন সেলুন।" হস্তপদহীন লোকটার বাহনটা ঠিক তার নিচে এসে থামে। লোহার কড়ি বর্গা আর অন্যান্য উপাদান না সরানো পর্যন্ত বাহনটাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। আলোকোজ্জ্বল বিজ্ঞাপনের আলো তার উপর পড়তেই তার নীরব মুখখানা রক্তিম হয়ে ওঠে; মুখখানা যেন প্রচণ্ড ক্রোধে ফুলে উঠছে। সহসা হয়ত এক বিকট চীৎকারে ফেটে পড়বে।

মিছিল আবার এগুতে থাকে। সেই হস্তপদহীন সদ্য হাসপাতাল থেকে আগত লোকটার বিবর্ণ ঠোঁটে তার কোন সাথী সিগারেট চেপে দিতেই কৃতজ্ঞায় তার মুখে সন্ধ্যার ম্লান আলোতে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। মিছিল শান্তভাবে এগিয়ে যায়। তাদের কণ্ঠে চীৎকার নেই, মুখে ক্রোধের অভিব্যক্তি নেই। ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পিতের দল। তাদের মনের মর্মস্থলে দুঃখ আছে, বঞ্চনাবোধ আছে, কিন্তু কারো বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ নেই। তারা জানে, গুলি করার সামর্থ্য তাদের আর

নেই। সুতরাং বেশী আশা করা তাদের পক্ষে অযৌক্তিক। তারা টাউন হলে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। কোন সেক্রেটারীর বা অন্য কেউ তাদের দু একটা সান্ত্বনার বাণী শোনাবে; তারপর তারা মিছিল ভেঙ্গে দিয়ে একা একা নিজেদের সংকীর্ণ বাসগৃহে জীর্ণ স্বাস্থ্য সন্তান-সন্ততি আর দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝখানে ক্ষীণ আশা নিয়ে ফিরে যাবে। তারা নিয়তির বন্দী। এই বন্দীত্ব অন্যেরা তাদের জন্য সৃষ্টি করেছে।

পরে সহরে আরো গোলমেলে আর বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমি আলবার্টের সঙ্গে রাজপথ দিয়ে এগিয়ে যাই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মানুষের জটলা। গুজব উড়ে বেড়াচ্ছে। গুজব রটেছে যে সেনাবাহিনী কোন এক বিক্ষুব্ধ শ্রমিক মিছিলের উপর গুলি করেছে।

সেণ্ট মেরি গীর্জার আশপাশ থেকে রাইফেলেব গুলির শব্দ শোনা যায়। প্রথম দিকে একটা একটা করে, তাবপর অনেকগুলো গুলির শব্দ একসংগে। আলবার্ট আর আমি পরস্পরের মুখের পানে তাকাই। কোন বাক্য ব্যয় না কবে যে দিক থেকে গুলির শব্দ আসছে সে দিকে রওয়ানা হই।

ক্রমে অধিকতর সংখ্যায় লোকজন আমাদের দিকে ছুটে আসতে থাকে। "রাইফেল নিয়ে এসো, জারজ বাচ্চারা গুলি কবছে", তারা চীৎকার করতে থাকে। আমরা আমাদের চলার গতি বাড়িয়ে দেই। এঁকেবেঁকে জনতার ভিড় এড়িয়ে এগুতে থাকি। আমরা ছুটতে শুরু করি। একটা ভয়াল পবিস্থিতির উত্তেজনা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আমরা হাঁপাচ্ছি। রাইফেলের গুলির আওয়াজ বাড়ছে। "লুদভিগ।" আমি চেঁচিয়ে ডাকি।

সে আমাদের পাশেই ছুটছে। তার ওষ্ঠদ্বয় নিবদ্ধ, চোয়ালের হাড় ফুলে উঠেছে; তার দৃষ্টি কঠোর আর উত্তেজিত। তার চোখেমুখে যুদ্ধ সীমান্তের ট্রেঞ্চ জীবনের অভিব্যক্তি। আলবার্ট আর আমারও তাই। রাইফেলের গুলির আওয়াজ লক্ষ্য করে আমরা ছুটতে থাকি। এ যেন এক রহস্যময় আদেশমূলক আহ্বানে আমরা সাড়া দিচ্ছি।

চীৎকাররত জনতা আমাদের পথ ছেড়ে দেয়। আমরা ঠেলে ধাক্কিয়ে পথ করে নেই। মেয়েরা তাদের মুখ ঢেকে টলতে টলতে পথ থেকে সরে যায়। ক্রুদ্ধ চীৎকারে চারদিক কাঁপছে। একজন আহতকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

আমরা মার্কেট স্কোয়ারে পৌঁছি। সরকারী সেনাবাহিনী টাউন হলের সামনে অবস্থান নিয়েছে। তাদের লোহার শিরস্ত্রাণ চিকচিক করছে। সিঁড়ির উপর একটা ম্যাসিন-গান প্রস্তুত হয়ে আছে। স্কোয়ারটা জনশূন্য। স্কোয়ারের প্রবেশ পথগুলোই কেবল জনাকীর্ণ। আর এগিয়ে যাওয়া একটা পাগলামো ; স্কোয়ারটা মেসি-নগানের আওতার মধ্যে রয়েছে।

একজন লোক একাকী সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনে উত্তেজিত জনতা রাজপথে ফেনায়িত হয়ে বাড়ীঘরের আশে পাশে সমবেত হয়েছে।

লোকটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। গীর্জার ছায়া থেকে সে জ্যোৎস্না-লোকিত স্কোয়ারের মাঝখানে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় : একটা স্পষ্ট কঠোর কণ্ঠ হেঁকে ওঠে—"ফিরে যাও।"

স্কোয়ারে দণ্ডায়মান লোকটা হাত তোলে। জ্যোৎস্না এমনই নির্মল যে, সে যখন চেঁচিয়ে বলে "কমরেডস," তখন তার মুখ বিবরের দন্তপাটি চকচক করে। চারদিক স্তব্ধ।

গীর্জা আব টাউন হলের মাঝখানে তার একক কণ্ঠ ঘুঘু পাখীর ঝাপটানির মতন করুণ শোনায়।

"কমবেডস। অস্ত্র ত্যাগ কব। তোমরা কি তোমাদের ভাইদের গুলি করবে? অস্ত্র ত্যাগ কর। আমাদের দলে এসো।"

জ্যোৎস্না বুঝি আগে কখনো এত উজ্জ্বল হয়নি। টাউন হলে সমবেত সৈন্যদের উর্দি চন্দ্রালোকে সাদা খড়ি মাটির মতন দেখায় ; টাউন হলের জানালাগুলো চিকচিক করে ; জ্যোৎস্নালোকিত গীর্জার গম্বুজের অর্ধেকটা সবুজ দর্পণের মতন দেখায়। চকচকে শিরস্ত্রাণ আর মুখোশ পরা সৈনিকেরা ছায়াঘেরা প্রাচীর থেকে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

"ফিরে যাও, নইলে গুলি করব।" নিবাবেগ কণ্ঠে হুকুম আসে। আমি লুদভিগ আব আলবার্টের দিকে তাকাই। এটাত আমাদের কোম্পানী কমাণ্ডার হীলের কণ্ঠস্বর। এক নিশ্বাস রুদ্ধকর উত্তেজনা আমাকে আচ্ছন্ন করে। এখনই বুঝি একটা হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। হীল গুলি করবে, আমি জানি।

ছায়া-কালো জনতা অভিযোগ করতে করতে বাড়ীর আড়ালে সরে যায়। এমনি করে অনন্ত কাল যেন অতিবাহিত হয়। টাউন হলের সিঁড়ি ছেড়ে রাইফেলধারী সৈনিকেরা স্কোয়ারের মাঝখানে অবস্থানরত

নিঃসঙ্গ লোকটার দিকে অগ্রসর হয়। লোকটার কাছে পৌঁছুতে তাদের অনেকক্ষণ লাগে বলে মনে হয়। চুমকি বসানো ছিন্ন পোশাকপরা একদল পুতুল যেন ধূসর জলাভূমিতে রাইফেল হাতে একই স্থানে দাঁড়িয়ে মার্ক টাইম করছে। নিঃসঙ্গ লোকটা স্থির দাঁড়িয়ে তাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। তারা সামনে পৌঁছলে সে "কমরেডস" সম্বোধন করে তাদের ডাক দেয়।

তারা তার বাহু ধরে তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সামনের দিকে নিয়ে যায়। লোকটা আত্মরক্ষা করে না। তারা তাকে এমনি দ্রুত ছুটিয়ে নিয়ে যায় যে সে হোঁচট খায়। আমাদের পিছনে জনতার চীৎকার শোনা যায়। সারা জনতা রাজপথ বেয়ে সামনের দিকে এলোমেলোভাবে এগুতে থাকে। স্পষ্ট কণ্ঠে হুকুম আসে, "তাড়াতাড়ি কর। তাকে নিয়ে এসো। আমি গুলি করছি।" একটা সাবধানী গুলির আওয়াজ শূন্যে ভেসে যায়। লোকটা সহসা নিজেকে মুক্ত করে নেয়। কিন্তু না, সে নিজেকে বাঁচাতে চাইছেনা। সে দ্রুত মেসিনগানের দিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচায় "কমরেডস, গুলি করোনা।"

কোন অঘটন ঘটেনা। নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ লোকটাকে সামনের দিকে ছুটে যেতে দেখে জনতা এগোতে থাকে। একটা ক্ষীণ জলধারার মতন জনতা গীর্জার পাশ দিয়ে চলতে থাকে। পর মুহূর্তে একটা আদেশ বাণী স্কোয়ারের চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে মেসিনগানের প্রচণ্ড ঠক্‌ঠক ধ্বনিও চারপাশের বাড়ীঘরে প্রতিধ্বনিত হয়। শোঁ শোঁ শব্দ করে বুলেটের টুকরো শান বাঁধানো রাজপথে ছিটকে পড়েতে থাকে।

বিদ্যুৎ গতিতে আমরা বাড়ী-ঘরের আড়ালে আশ্রয় নেই। এক অবশকরা আতঙ্ক আমাদের পেয়ে বসে। এই আতঙ্ক যুদ্ধ সীমান্তের আতঙ্ক থেকে ভিন্ন। কিন্তু মুহূর্ত পরেই এই আতঙ্ক ক্রোধে পরিণত হয়। আমি স্কোয়ারের সেই নিঃসঙ্গ মানুষটিকে ঘুরে ঘুরে মাটিতে পড়তে দেখে গৃহ কোণের আড়াল থেকে সাবধানে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকি। লোকটা বার বার উঠতে চেষ্টা করে, কিন্তু উঠতে পারছে না। সে বাহুর উপর ভর দিতে তার বিবর্ণ মুখটা তুলে গোঙাতে থাকে। ধীরে ধীরে তার বাহু দুটো বেঁকে যায়, মাথাটা নুয়ে পড়ে; তারপর অতি ক্লান্তিতে তার দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমার কণ্ঠ ফেটে বেরিয়ে পড়ে। "না, না" আর এই চীৎকার প্রাচীরে প্রাচীরে আঘাত করে।

আমাকে কে যেন পিছন থেকে ঠেলা দেয়। লুদভিগ স্কোয়াবের পড়ে থাকা মৃতদেহ পিণ্ডটার দিকে এগিয়ে যায়।

"লুদভিগ।" আমি তাকে চেঁচিয়ে ডাকি। কিন্তু সে আমার ডাকে কর্ণপাত করে না। সে চলতে থাকে। আমি সন্ত্রস্ত চিত্তে নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। "হট্ যাও।" টাউন হলের সিঁড়ি থেকে আবার হুকুম আসে।

এক মুহূর্তে লুদভিগ থমকে দাঁড়ায়। "গুলি করতে থাক, ল্যাফ-টান্যাণ্ট হীল।" বলে টাউন হলের দিকে মুখ করে প্রত্যুত্তর দেয়। তারপর এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা দেহ পিণ্ডটার উপর ঝুঁকে পড়ে। একজন অফিসারকে সিঁড়ি বেয়ে আমাদের দিকে আসতে দেখি। আমি আমার জ্ঞানের অগোচরে লুদভিগের পাশে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের প্রতীক্ষা করি। তার হাতে অস্ত্র বলতে একটা ছড়ি মাত্র। সে কোন দ্বিধা করে না, যদিও আমরা এখন তিনজন এবং ইচ্ছে করলেই তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে পারি। তার সৈনিকেরাও তখন তার গায়ে গুলি লাগবে ভয়ে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি করতে পারবে না।

লুদভিগ সোজা দাঁড়িয়ে বলে, "তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি লেফটান্যাণ্ট হীল। লোকটা মরে গেছে।"

মৃত লোকটার গায়ের জামাটার নিচে রক্তধারা বয়ে বয়ে মাঠের ফাটলে টপটপ করে প্রবেশ করছে। সামনে প্রসারিত তার জীর্ণ ডান হাতের কাছে জমাটবাঁধা রক্তের উপর জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হচ্ছে।

"ব্রেয়ার।" হীল সম্বোধন করে।

"তুমি চেন এই মৃত লোকটাকে?" লুদভিগ প্রশ্ন করে।

হীল মাথা নাড়ে। 'ম্যাকসওয়েল।"

"আমি চেয়েছিলাম সে সরে পড়ুক।" মুহূর্ত পরে হীল প্রায় করুণ কণ্ঠে জওয়াব দেয়।

"সে মরে গেছে।" লুদভিগ বলে।

হীল কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়।

"সে আমাদের কমরেড ছিলো।" লুদভিগ বলে যায়। হীল নিরুত্তর। লুদভিগ এবার নির্লিপ্ত আবেগহীন কণ্ঠে বলে, "চমৎকার কাজ করেছ।"

এই কথায় হীল চাঞ্চল্য প্রকাশ করে। শান্ত কণ্ঠে বলে, "এ কথা অবান্তর ; উদ্দেশ্যটাই আসল—আইন শৃঙ্খলা সংরক্ষণ।"

"উদ্দেশ্য-------" লুদভিগ তাচ্ছিল্যের সুরে বলে। "কবে থেকে তুমি তোমার কাজের কৈফিয়ত দিতে শুরু করেছ? উদ্দেশ্য। পেশা ----তুমি পেশা ছাড়া কিছুই বোঝনা। তুমি এবার তোমার লোকজন সরিয়ে নাও যাতে আর গোলাগুলি না হয়।"

হীল অধৈর্যের ভঙ্গি করে। "আমার লোকজন যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। আজ যদি তারা সরে যায়, তবে আগামীকাল আজকের দশগুণ লোক তাদের হামলা করবে, তা তুমি নিজেও জান। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি রাস্তার সব মুখগুলো অধিকার করব। এই মৃত দেহ এখান থেকে সরিয়ে নেবার জন্য আমি তোমাদের এই সময়টুকু দিলাম।"

"এ কাজে লেগে পড়।" লুদভিগ আমাদের বলে। তারপর হীলকে উদ্দেশ্য করে বলে, "তোমরা যদি এখন সরে যাও, কেউ তোমাদের হামলা করবে না আর যদি এখানে থাক তবে আরো প্রাণহানি হবে আর তুমিই হবে এ জন্য দায়ী। কথাটা বুঝতে পারছ?"

"তা বুঝতে পারছি।" হীল উদাস কণ্ঠে জওয়াব দেয়।

আর এক মিনিট আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকি। হীল আমাদের দিকে তাকায়। এক অদ্ভুত মুহূর্ত। তারপর আমরা মৃতদেহ সরানোর কাজে লেগে যাই। রাজপথে আবার ভিড় জমেছে। আমাদের চলার জন্য বিস্তীর্ণ পথ খুলে গেছে। চীৎকার তীব্রতর হচ্ছে। "ব্লাড হাউণ্ড। পুলিশ দস্যু। খুনী।" ম্যাকসওয়েলের পিঠ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।

আমরা তার দেহটা নিকটতম বাড়ীটাতে নিয়ে যাই। একটা রেস্তোঁরা—হল্যাণ্ডিথ ডিয়েল। নাচ ঘরে পড়ে থাকা দুটো আহতকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে দুটো এম্বুলেন্স এসেছে। রক্তমাখা এপ্রন পরা একজন স্ত্রীলোক বিলাপ করছে আর নিজ গৃহে চলে যেতে চাইছে। একটা স্ট্রেচার আর একজন ডাক্তার আসা পর্যন্ত তাকে অতি কষ্টে নিবৃত্ত করা হয়। তার পেটে গুলি লেগেছে। তার পাশে একজন আহত পুরুষ পড়ে আছে। তার পরনে এখনো সৈনিকের পুরানো উর্দি। তার দুটো জানুই গুলিবিদ্ধ। তার স্ত্রী তার পাশে জানু পেতে বসে বিলাপ করছে, "ও কিছু করেনি, পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। আমি তার

রাতের খাবার নিয়ে যাচ্ছিলাম" সে এনামেলের একটা পাত্র দেখায়। এতে তার খাবার—-"

নর্তকীরা ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে ঠাসাঠাসি বসে আছে। উত্তেজিত ম্যানেজার ছুটোছুটি করে তাড়াতাড়ি আহতদের অন্যত্র সরিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করছে' আহতরা এখানে পড়ে থাকলে তার ব্যবসা মাটি হয়ে যাবে। কোন অভ্যাগত অতিথি আর এখানে নাচতে আসবেনা। উর্দিপরা দারোয়ান এন্তন ডেমুথ এক বোতল ব্র্যাণ্ডি এনে আহত লোকটার মুখে তুলে ধরে। ভীত ম্যানেজার তার পানে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে, কিন্তু এন্তন সেদিকে খেয়াল করেনা। আহত লোকটা বলে, "তুমি কি মনে কর আমি আমার পা দুটো হারাব? আমি একজন সোফার—গাড়ী চালক।"

স্ট্রেচার আসে। আবার বাইরে গুলির আওয়াজ। আমরা লাফিয়ে উঠি। চীৎকার বিদ্রুপ ধ্বনি আর কাঁচ ভাঙ্গার ঝনঝন আওয়াজ। আমরা বাইরে ছুটে যাই। পাকা রাস্তা ভেঙ্গে ঢিল সংগ্রহ করি। রাস্তায় গাইতি চালাতে চালাতে একজন লোক চেঁচাতে থাকে। বাড়ী ঘর থেকে বিছানা মাদুর আর আসবাবপত্র রাস্তার উপর সৈন্যদের তাক করে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। স্কোয়াব থেকে গুলি আসছে আর বাড়ী ঘর থেকে এর প্রত্যুত্তর চলছে।

"বাতি নিবিয়ে দাও।" বলে একটা লোক রাস্তার বাতি লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। আলবার্ট চেঁচিয়ে বলে "কসোল!" কসোলই বটে, তার পাশে ভ্যালেণ্টিন। গুলির আওয়াজ সবাইকে ঘূর্ণী হাওয়ায় এক জায়গায় নিয়ে এসেছে। কসোল চেঁচিয়ে ওঠে, "আর্নস্ট, লুদভিগ, আলবার্ট! ওদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ো। শূয়রের বাচ্চারা মেয়েদের উপরও গুলি করছে।"

আমরা বাড়ীর দরজার আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি। গোলা-গুলি চলছে। চেঁচামেচি চলছে। আমরা ডুবে গেছি। আমরা পরাভূত হয়েছি। আমাদের খেটিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের বুকে ঘৃণা বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে; পথের বুকে রক্তের ফিনকি ছুটছে। আমরা আর একবার সৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছি; আর একবার আমরা যুদ্ধের কবলে পড়েছি। আমাদের মাথার উপর আমাদের পরস্পরের মধ্যে, আমাদের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চলছে—সব শেষ হয়ে গেছে। মেসিন-গান আমাদের বন্ধুত্ব বিদ্ধ করছে, সৈনিকেরা সৈনিকদের গুলি করছে, বন্ধুরা বন্ধুদের হত্যা করছে। সব শেষ হয়ে গেলো। সব শেষ হয়ে গেলো।

(৩)

এডলফ বেথকি তার গ্রামের বাড়ী বিক্রি করে সহরে বসবাস করতে চলে এসেছে।

স্ত্রীকে তার সঙ্গে ঘর-সংসার করতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পর কিছু কাল বেশ চলছিলো। সে তার নিজের কাজ করতো আর তার স্ত্রী নিজের কাজ করতো। মনে হচ্ছিলো সব কিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছু কাল পরেই তাদের নিয়ে গ্রামে কানাকানি শুরু হয়ে গেলো। তার স্ত্রী বিকেল বেলায় পথে বেরোলে তাকে লোকে ডাকাডাকি করতো। তার সাথে দেখা হলে তরুণেরা বেহায়া উদ্ধত হাসি হাসতো; মেয়েরা তাদের এপ্রনের আঁচল গুটিয়ে কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গি করতো। তার স্ত্রী কোন দিন তাকে এসব কথা জানতে দেয়নি। নীরবে গুমরে মরতো আর ক্রমে ক্রমে তা তাকে ক্লিষ্ট করে তুললো।

এডলফের বেলায়ও একই অবস্থা। সে কোন পানশালায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যেতো। সে কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলে, তাকে কেমন যেন এক বিব্রতবোধ সঞ্জাত নীরবতা সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হতো। গোপন ইঙ্গিত আর কুটিল প্রশ্নের দু:সাহসিকতাও তাকে সহ্য করতে হতো। চা-খানায় চা খেতে গিয়েও তাকে কুৎসিৎ বক্রোক্তি শুনতে হতো, আর তার বিদায়ের পর বিদ্রূপাত্মক হাসাহাসি শোনা যেতো। এ নিয়ে কি করবে, তা সে ভেবে পেতোনা। সে ভাবতো যে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাকে গ্রামের লোকদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে কেন? গ্রামের পাদরী এ ব্যাপারটা পছন্দ করতেন না। পথ চলা কালে তিনিও এডলফের দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাতেন। এসব ব্যাপারে এডলফ দু:খ পেতো, কিন্তু সেও তার স্ত্রীকে এ সব কথা বলতোনা।

এমনিভাবে তাদের জীবন কিছু কাল কেটে গেলো, কিন্তু এক রোববার বিকেলে এডলফের উপস্থিতিতেই একদল দু:সাহসী জ্বালাতনকারী তার স্ত্রীকে ডাকাডাকি করলো। সে রেগে গেলে তার স্ত্রী তাকে নিবৃত্ত করে বললো, "এদের কথায় কান দিয়োনা। তারা প্রায়ই এমনটি করে। আমি আর এখন তাদের ডাকাডাকিতে কান দেই না।"

"প্রায়ই এমন করে?" এডলফ বুঝতে পারে, কেন তার স্ত্রী আজকাল বিষণ্ন থাকে আর কম কথা বলে। ক্রুদ্ধ হয়ে সে দলের একটা লোকের

পিছনে ধাওয়া করলে দলের অন্যদের সহযোগিতায় লোকটা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

তারা দুজন বাড়ী গিয়ে নীরবে শুয়ে পড়ে। এডলফ অন্ধকারে চোখ মেলে একটা চাপা শব্দ শুনতে পায়। বিছানার চাদরে মুখ লুকিয়ে তার স্ত্রী কাঁদছে। সে যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তার স্ত্রী হয়ত প্রায়ই এমনি কাঁদে। "কোন চিন্তা করোনা মেরি।" সে সান্ত্বনার সুরে স্ত্রীকে বলে, "তারা যা খুশী বলুক।" তবু তার স্ত্রীর কান্না থামেনা।

এডলফ নিজেকে নিঃসহায় নিঃসঙ্গ মনে করে। জানালার বাইরের অন্ধকারও তার শত্রু; বাইরের বৃক্ষগুলোও যেন কুটনী বুড়ীদের মতন কানাকানি করে তার কুৎসা রটনা করছে। সে তার স্ত্রীর স্কন্ধদেশ কোমল হাতে স্পর্শ করে। তার স্ত্রী অশ্রুসিক্ত চোখে তার পানে তাকিয়ে বলে, "এডলফ, আমি বরং চলে যাই। তখন তারা আর জ্বালাতন করবেনা।"

তার স্ত্রী শয্যা ত্যাগ করে দাঁড়ায়। ঘরে তখনো মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলোতে তার ছায়াটা বড় হয়ে সারা ঘরময় আর দেয়ালে টলেটলে ঘুরছে অথচ তার দেহটা ছোটখাট। অদূরে শয্যার কিনারে বসে তার স্ত্রী পোশাকের জন্য আলনার দিকে হাত বাড়ায়। হাতের অপার্থিব বিরাট ছায়াটাও বাইরের অন্ধকার থেকে লুকিয়ে আসা নিয়তির মতন হাত বাড়ায় আর তার প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন অনুকরণ করে; অদ্ভুত বিকৃত চাপা হাসি হেসে তাকে বিদ্রূপ করে। এখনই বুঝি এই নিয়তি তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারকে বাইরে নিঃসীম অন্ধকারে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে।

এডলফ লাফ দিয়ে উঠে জানালার পর্দাটা নামিয়ে দেয়। যেন এমনি করে সে অন্ধকারের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেবে, যাতে অন্ধকার পেঁচকের বুভুক্ষ লোলুপ কুটিল দৃষ্টি নিয়ে জানালার চতুষ্কোণ শার্সির ভিতর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারকে বাইরে অন্ধকারে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে না পারে।

মেরি ইতিমধ্যে তার মোজা জোড়া পায়ে দিয়ে বডিস নিতে যেই মাত্র হাত বাড়িয়েছে, তখখুনি এডলফ তাকে ডাক দেয়, "কিন্তু মেরি..." মেরি তার দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে বডিসটা তার হাত থেকে পড়ে যায়। এডলফ মেরির চোখে মূক মৌন অসহায় জীবের দুঃখ কাতরতা দেখতে পায়। সে মেরির গ্রীবাদেশ জড়িয়ে ধরে। কত কোমল আর উষ্ণ এই

দেহ। কেমন করে মানুষ এই দেহের উপর কঠিন প্রস্তর নিক্ষেপ করতে পারে? তাদের দুজনের মনে কি সদিচ্ছার অভাব আছে? অন্যেরা কেন তাদের জ্বালাতন করবে? তাদের পিছনে লাগবে? সে মেরিকে কাছে টানে। মেরিও তার কাছে আত্মসমর্পণ করে তার গলা জড়িয়ে ধরে। তার বুকে মাথা রাখে। তারা দুজন নৈশ পোশাকে দাঁড়িয়ে পরস্পরের নৈকট্য অনুভব করে, পরস্পরের উষ্ণ সান্নিধ্য কামনা করে। তারপর তারা দুজনই নীরবে শয্যার কিনারে বসে। নিঃশেষিত প্রায় নিবু নিবু মোমবাতিটা নাচতে থাকে আর সেই আলোতে তাদের দেহের ছায়াও দেয়ালের গায়ে নাচতে থাকে। এডলফ তখন মৃদু হাতে তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে যেন বলতে চায়, এসো আমরা এক সঙ্গে থাকি; আবার চেষ্টা করে দেখি। তারপর মেরিকে বলে "মেরি, আমরা এই জায়গা থেকে চলে যাব। এইটাই নিষ্কৃতির একমাত্র পন্থা।"

"হ্যাঁ, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই এডলফ।" এই বলে সে এডলফের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই প্রথমবার সে গলা ছেড়ে কাঁদে। এডলফ তাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে বার বার বলতে থাকে, "কালই আমরা এ বাড়ীর গ্রাহক খুঁজব----কাল সকালে এটাই হবে প্রথম কাজ-----" এই সঙ্কল্প, আশা, ক্রোধ আর দুঃখের ঝাপটায় সে তাব স্ত্রীকে নিবিড় করে বুকে টেনে নেয়। এমনি করে নৈরাশ্য ভোগেচ্ছায় রূপান্তরিত হয়; ভোগেচ্ছা অবশেষে তৃপ্ত হয়। মেবির কান্নাও ক্ষীণতর হয়ে শিশুব কান্নার মতন ক্লান্তিতে নীরব শ্বাস-নিশ্বাসে পবিণত হয়।

মোমবাতিটা নিভে গেছে। মোমবাতির আলোতে ঘরে আর ছায়া পড়েনা। মেরি ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু এডলফ বিনিদ্র চোখে চিন্তা করতে থাকে। রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে মেরি লক্ষ্য করে যে এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সে যে মোজা পবেছিলো, তা এখনো তার পায়ে রয়ে গেছে। সে মোজা খুলে ভাঁজ করে বিছানার পাশেব চেয়ারটায় রেখে দেয়।

এর দুদিন পরে এডলফ তার বাড়ী আর কারখানা বিক্রি করে দিয়ে শহরের একটা বাড়ী ভাড়া করে আসবাবপত্র নিয়ে যায়। কুকুরটাকে রেখে যেতে হয়। তবে বাগানটা ছেড়ে যেতেই তার সব চেয়ে কষ্ট হয়। বাগানে সবে মুকুল ধরেছে। এমনিভাবে বসতবাড়ি ছেড়ে যাওয়া সহজ নয়। ভবিষ্যতে তার যে কি হবে তাও এডলফের জানা নেই। তার স্ত্রী অবশ্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে প্রস্তুত।

শহরের যে বাড়ীটার অংশবিশেষ তারা নিয়েছিলো তা ছিলো স্যাঁতস্যাঁতে আর অন্ধকার; সিঁড়িটা আর সমস্ত পরিবেশটা দুর্গন্ধময়। চিন্তা করা ছাড়া তাদের কোন কাজ নেই। তাদের দুজনের কারো মনেই আনন্দ নেই। তাঁরা যে প্রতিবেশ থেকে পালিয়ে এসেছে, সেই প্রতিবেশই যেন এখানেও তাদের অনুসরণ করছে।

রান্না ঘরে বসে বসে এডলফ ভাবে, কেন পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। রাতের বেলায় খবরের কাগজ পড়ে, আর খাবার শেষে খাবার টেবিল পরিষ্কার করার পর তারা দুজন মুখোমুখি বসে থাকে। সেখানেও বিষণ্ণতা বিরাজ করে। তখন হতাশাগ্রস্ত এডলফ দুশ্চিন্তায় ঝিমোতে থাকে। তার স্ত্রী একটা কিছু করে নিজকে ব্যস্ত রাখে। এডলফ ডাকে, "মেরি. এখানে এসো।" মেরি হাতের কাজ রেখে দিয়ে আসে। করুণ নিঃসঙ্গতায় পীড়িত এডলফ স্ত্রীকে কাছে টেনে কানে কানে বলে, "আবাব সব ঠিক হয়ে যাবে।" মেরি নীববে মাথা নেড়ে সায় দেয়। এডলফ চায়, মেরি হর্ষোৎফুল্ল হোক। এডলফ উপলব্ধি কবতে পাবেনা যে দীর্ঘ চার বছর ছাড়াছাড়ির পর তারা যে পরস্পর থেকে দূবে সরে গেছে, এ জন্য মেরিব মতন সে নিজেও দায়ী। তারা এখন একে অন্যের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে ভর্ৎসনার সুবে মেরিকে বলে, "একটা কিছু বল। কথা বলতে পারছ না?" সন্ত্রস্ত মেবি বলে যে এ বাড়ীতে এমন কোন ঘটনা ঘটেনা যা নিয়ে কোন কথা বলা যায়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন আলাপচারিতার মাধ্যমে এই সম্পর্ক শুধরানো ক্ষমতার বাইরে। মনে আনন্দ থাকলেই কথার আনন্দ উপভোগ করা যায়; তখন কথা বলাও সহজ হয়ে ওঠে। মনে আনন্দ না থাকলে কথার মারপ্যাঁচ কোন কাজে আসে? তাতে বরং সম্পর্কের অবনতিই ঘটে।

এডলফ স্ত্রীর চলা-ফেরা পর্যবেক্ষণ করে। আব এই চলা-ফেরার পটভূমিকায় এক অল্প বয়স্কা হাস্যময়ী সরলা বধুব ছবি তার মনে ভেসে ওঠে। এই ছবি তার স্মৃতিপটে অঙ্কিত তার স্ত্রী মেরিব ছবি। এ ছবি তার মনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। মেরির বর্তমান ছবির সঙ্গে স্মৃতি-পটে অঙ্কিত ছবির কোন মিল নেই। তার মনে সন্দেহ জাগে। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে "এখনো সেই লোকটার কথাই ভাবছ। তাই না?" মেরি বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার পানে তাকায়। সে বুঝতে পারে যে সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ করছে, তবু সে আরো কঠোর হয়ে বলে "নিশ্চয়ই তুমি তোমার সেই প্রেমিকের কথা ভাবছ। তুমি ত আগে

এমনটি ছিলে না। তাই যদি হয়, তবে তুমি কেন আমার কাছে ফিরে এলে? তার সঙ্গে থাকলেই ত পারতে।"

প্রতিটি কথায় সে নিজেও প্রচণ্ড আঘাত পায়, কিন্তু তাই বলে সে নীরব হবে কেন? সে এমনি ধরনের আরো কথা বলতে থাকে। তখন তার স্ত্রী ঘরের অন্ধকার কোনে আশ্রয় নেয় আর পথহারা শিশুর মতন কাঁদতে থাকে। হায়! আমরা সবাই এমনি পথহারা নির্বোধ শিশু। আমাদের চারদিকে রাত্রের স্থায়ী অন্ধকার।

এমনি অবস্থা এডলফের অসহনীয় মনে হয়। সে এবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। বিপনী গবাক্ষের সামনে দাঁড়ায়, কিন্তু বিপনী সামগ্রীব প্রতি তাব দৃষ্টি পড়ে না। যেখানে আলো দেখে সেখানেই সে যায়। পাশ দিয়ে ট্রাম গাড়ী হুস হুস করে চলে যায়; সে পথচারীদের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ল্যাম্প পোস্টের নিচের হলদে আলোর বৃত্তে গুরু নিতম্বিনী রূপজীবিনীরা দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করে। পরস্পরকে খোঁচা দেয়। "তোমরা কি সুখী?" বলে এডলফ তাদের কারো সঙ্গে চলে যায়। নতুন দৃশ্য দেখে, নতুন কথা বলে আনন্দ পায়। আবার বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায়। সে বাড়ী ফিরবে না, অথচ বাড়ী ফিরে যেতে তার মন চায়। পানশালায় ঢুবে ঘুরে অত্যধিক মদ খেয়ে মাতাল হয়।

এক পানশালায় তার দেখা পেয়ে তার কথা শুনি, তাকে দেখি। সে সেখানে ঘোলা দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে। কথা বলতে বলতে ঢেকুর তুলছে আর মদ খাচ্ছে।—এডলফ বেথ্‌কি। আমাদের মধ্যে সবার সেরা সতর্ক সৈনিক। আমাদের সবচেয়ে বিশ্বাসী বন্ধু। সে কত জনকে সাহায্য করেছে। কতজনের প্রাণ রক্ষা করেছে। যুদ্ধসীমান্তে সে ছিলো আমার প্রধান আশ্রয়, প্রধান সান্ত্বনা। যখন শত্রু পক্ষের প্যারাসুট বাহিনী বোঁ বোঁ করে মাথার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, যখন দীর্ঘ আক্রমণের ফলে স্নায়ু বিধ্বস্ত হয়েছে, মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে তখন কতবার সে আমার মা ভাইয়ের মতন আমাকে আগলে রেখেছে। স্যাতসেঁতে পরিখায় আমরা পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়েছি; আমার অসুখ হলে সে আমার সেবা শুশ্রূষা করেছে। সে সব কাজ করতে পারতো। কোন দিন তার বুদ্ধিভ্রম দেখিনি। আর এখন সে কাঁটা বেড়ার তারে আটকে পড়েছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, দৃষ্টি ঘোলাটে। সে বিষাদ কণ্ঠে বলে

"আর্নস্ট, যদি আমরা সীমান্তে থেকে যেতাম। আমরা ত সেখানে অন্ততঃ সবাই এক সঙ্গে ছিলাম।" আমি তার কথায় সাড়া দেই না। আমি আমার কোটের আস্তিনের দিকে তাকাই। সেখানে এখনো কয়েক ফোটা রক্তের লালচে দাগ রয়েছে। ম্যাকসওয়েলের রক্ত। হীলের হুকুমে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এমনি নীচু স্তরে এসে পৌছেছি। আবার যুদ্ধ বেঁধেছে কিন্তু কমরেডশিপ বা সাথীত্বের অবসান হয়ে গেছে।

(৪)

জাদেন কসাই কন্যা মেরিয়েনের সাথে তার বিয়েব উৎসব উদযাপন করছে। ঘোড়ার গোশ্তের কসাইখানার ব্যবসাটা সোনার খনির ব্যবসায়ের মতন ফুলে ফেঁপে উঠছে আর মেরিয়েনের প্রতি তার আসক্তিও সেই অনুপাতে বেড়ে চলছে।

সকাল বেলা বরকনে কালো চকচকে বার্নিশ করা সাদা রেশমী কাপড়ে সজ্জিত কোচে গীর্জায় যায়। অবশ্য চার ঘোড়ায় টানা কোচ। যেহেতু এই বৈবাহিক মিলনের আদি উৎস ঘোড়া, তাই চার ঘোড়ার কোচ এ ক্ষেত্রে মানানসই। উইলি আর কসোল এই বিয়েতে সাক্ষী নির্ধারিত হয়েছে। এই উপলক্ষে উইলি এক জোড়া সাদা দস্তানা কিনেছে—বিশুদ্ধ সুতোর দস্তানা। তা কিনতে গিয়ে আমাদের খুব বেগ পেতে হয়েছে। আধা ডজন দস্তানা আমাদের জন্য অর্ডার দিতে কার্লকে বলা হয়েছিলো। আমরা পুরো দুদিন খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু উইলিব সাইজের দস্তানা কোথাও পাওয়া গেলো না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমাদের খোঁজাখুঁজি বিফল হয়নি। এই ধবধবে সাদা দস্তানা জোড়া, যা শেষ পর্যন্ত তার পছন্দ হলো, তার নতুন রঙকরা লম্বা ঝুলওয়ালা কোটের সঙ্গে চমৎকার মানালো। জাদেনের পরণে ফ্রক কোট আর মেরিয়েনের পরণে কমলা রঙের ফুল-আঁকা মস্তকাবরণ সহ কনের বিয়ের নিখুঁত পোশাক।

রেজিস্ট্রি অফিসে যাত্রার একটু আগে একটা সামান্য দুর্ঘটনা ঘটে। কসোল এসে ফ্রক কোট পরা জাদেনকে দেখে মূর্চ্ছা যায়। এই মূর্চ্ছা থেকে একটু ভালো হতেই জাদেনের সার্টের শক্ত কলারের উপর তার খাড়া কানের দিকে চোখ পড়তেই সে আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। এই

রোগের কোন চিকিৎসা নেই। গীর্জার মাঝখানে আবার তার এই রোগ দেখা দিতে পারে; তখন সমস্ত অনুষ্ঠানটাই মাটি হবে। তাই শেষ পর্যন্ত আমাকেই বাধ্য হয়ে কসোলেব স্থান গ্রহণ করতে হয়।

সারা কসাইখানাটা ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রবেশ পথটা ফুল আর বার্চ গাছের শাখা-প্রশাখা দিয়ে সাজানো; কসাই ঘরটায় পর্যন্ত কার-শাখার মালা ঝুলানো হয়েছে। সেখানে উইলি "স্বাগতম" কথাটা লিখে সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। ভোজন কালে কচি বাছুরের গোশত খাওয়ার পর জাদেন তার ফ্রক কোর্ট আর কলার খুলে ফেলে। এবার কসোল সোয়াস্তি পায়। এর আগে সে মূর্চ্ছার ভয়ে এদিক ওদিক সাহস করে তাকাতে পারেনি। আমরাও জাদেনের দেখাদেখি আনুষ্ঠানিক পোশাক খুলে ফেলি। এবার আরাম লাগে।

অপরাহ্ণে জাদেনের শ্বশুর একটা দলিল পাঠ করে শোনায়, তাতে তার সমস্ত ব্যবসায়ে জাদেনকে একজন অংশীদাররূপে ঘোষণা করা হয়। আমরা সবাই জাদেনকে অভিনন্দন জানাই। তারপর উইলি আমাদের হয়ে তার সাদা দস্তানা পরা হাতে আমাদের দেয়া বিয়ের উপহার—একটা পিতলের ট্রেতে বারোটা পলতোলা মদের গ্লাস গাম্ভীর্য সহকারে উপস্থাপন করে। কার্লের দোকান থেকে আনা তিন বোতল কগনেকও এর সংগে দেয়া হয়। তাতে জাদেনের শ্বশুর এমনি অভিভূত হয় যে সে উইলিকে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তার একটা কসাইখানার ম্যানেজারের পদ অর্পণের প্রস্তাব করে। উইলি এই প্রস্তাবটা ভেবে দেখবে বলে জানায়।

বিকেলের দিকে লুদভিগ একবার এসে দেখা দিয়ে যায়। জাদেনের বিশেষ অনুরোধে সে তার সামরিক উর্দি পরে আসে। কারণ জাদেন তার লোকজনদের দেখাতে চায়, তার. বন্ধুদের মধ্যে একজন সত্যিকার ল্যাফটান্যাণ্ট আছেন। লুদভিগ তাড়াতাড়ি চলে যায়। খাবার টেবিলের উপর হাড় আর খালি বোতল ছাড়া যখন আর কিছুই নেই তখন পর্যন্ত আমরা টেবিল ত্যাগ করিনা।

মাঝ রাতে আমরা শেষ পর্যন্ত পথে নামলে আলবার্ট কাফে গ্রগারে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়।

"তা অনেকক্ষণ আগে বন্ধ হয়ে গেছে।" উইলি মন্তব্য করে।

"আমরা পিছন দিক থেকে ঢুকতে পারব।" আলবার্ট গোঁ ধরে। "কার্ল জানে, কেমন করে ঢুকতে হয়।"

আমাদের কারোই তখন কাফেতে যাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছে নেই, কিন্তু আলবার্টের পীড়াপীড়িতে আমরা শেষ পর্যন্ত সম্মত হই। একটা কথা ভেবে আমি বিস্মিত হই যে আলবার্ট সাধারণতঃ তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে আগ্রহী।

কাফের বাইরেটা নীবব এবং অন্ধকার, কিন্তু পিছনের প্রাঙ্গনে ঢুকেই দেখি যে সব কিছু পুরোদমে চলছে। গ্রগার একটা মুনাফাখোরদের আড্ডা। প্রতি দিন সেখানে শেষ রাত পর্যন্ত কারবার চলে। বাড়ীটাব একাংশে লাল মখমলের পর্দা-ঢাকা কয়েকটা শয্যা কক্ষ রয়েছে। সেগুলো সুরা সরবরাহ শাখা। অধিকাংশ কক্ষের পর্দা নামানো। সেই কক্ষগুলো থেকে চীৎকাব আর হাসির শব্দ আসছে। উইলি হেসে বলে, "এগুলো গ্রগারের মেয়ে মানুষের গোপন দোকান।"

আমবা সামনের দিকটায় আসন গ্রহণ করি। কাফেটা গ্রাহকে ভর্তি। ডান দিকের টেবিলগুলোতে বেশ্যাদের বসাব ব্যবস্থা। কারবার জমজমাট হলে আনন্দোজ্জ্বলতাও বাড়ে। সুতরাং বাবোজন মেয়ে মানুষ এখানে খুব বেশী নয়। মনে হয় এদের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। কার্ল হাতেব ইশারায় মিসেস নিকেলকে দেখায়। একজন কৃষ্ণনয়না ইন্দ্রিয় বিলাসিনী বেহায়া মেয়ে মানুষ। তার স্বামীও একজন ছোটখাট মুনাফাখোর। তবে তার স্ত্রী মিসেস নিকেল তাব স্বামীর ব্যবসায়ে মন্ত্রণাদাতা। পৃষ্ঠপোষকদের সে তাব নিজের বাড়ীতে সাধারণতঃ এক ঘন্টা কাল মনোবঞ্জন করে। প্রত্যেক টেবিলেই ফিসফিস, কানাকানি আর কোলাহল চলে। ইংলিশ স্যুট আব নতুন টুপী পবা লোকদের ঝুলানো কোটপরা কলারবিহীন লোকেরা ঘরের কোণে নিয়ে যায়। পকেট থেকে প্যাকেট আর মালের নমুনা দেখায়। এগুলো পরীক্ষা করে আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়। নোট বই বের করে টোকাটুকি হয়। একটু পরপরই কেউ না কেউ টেলিফোন করে বাইরে যায়, ট্রাক বোঝাই বা টন ওজনে মাখন, হেরিং মাছ, গোশত, ডলার, গুলডেন, স্টক, শেয়াব এবং টাকার অংকের গুঞ্জন ঘরময় শোনা যায়।

আমাদেব ঠিক পাশেই এক ট্রাক বোঝাই কয়লা নিয়ে জোব দর কষাকষি চলে। কার্ল অবজ্ঞা ভরে তা উড়িয়ে দিয়ে বলে, "এ হলো

শূন্যের উপর কারবার। কেউ একটা মালের খবর শুনেছে; সে খবরটা তৃতীয় ব্যক্তিকে দেয় আর তৃতীয় ব্যক্তি এই মাল সম্বন্ধে চতুর্থ ব্যক্তিকে আগ্রহী করে তোলে। তখন ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আসলে কিছুই হয় না। এরা সব দালাল। এ করে কিছু দালালী পেলেই এরা খুশী। আসল' কাপ্তান মুনাফাখোরেরা এমন একজন আর বেশী হলে দুজন দালালের মাধ্যমে কারবার করে, যাদের এরা ব্যক্তিগতভাবে জানে। ঐ যে মোটা লোকটা তার কথাই ধর। সে দুই ট্রাক ডিম পোল্যাণ্ডে নিয়ে এসেছে। আমি জানতে পারলাম বর্তমানে বাহ্যতঃ এই মাল হল্যাণ্ডের পথে আছে। রাস্তায় নতুন করে তাতে লেবেল এঁটে এই মাল পোল্যাণ্ডে ফিরিয়ে এনে হল্যাণ্ডের টাটকা ডিম বলে তিন গুণ দামে বিক্রি হবে। আর এই যে সামনের লোকগুলো রয়েছে, এরা হলো কোকেইন ব্যবসায়ী। এরা বিস্তর লাভ করে। আর ঐ লোকটা শূয়রের মাংসের কারবাব করে। এটাও খুব লাভজনক ব্যবসায়।

"এইসব শূয়রের বাচ্চাদের জন্যই আমরা অনাহারে পেটের ব্যথা নিয়ে ঘুরে বেড়াই।" উইলি গর্জে ওঠে।

"যে কোন অবস্থাতেই তোমাদের তা করতে হতো।" কার্ল জওয়াব দেয়। "এই ত গেলো সপ্তাহে সরকার দশ পিপে মাখন বিক্রি করে দিলো; কারণ দীর্ঘ .কাল গুদামে থেকে তা পচে গিয়েছিলো। শস্যেব বেলায়ও এমনটি হয়। বার্টচার সে দিন কয়েক ট্রাক শস্য কয়েক পেন্স দিয়ে কিনে নেয়, কারণ সেই শস্য সরকারী গুদামে থেকে থেকে পচে গিয়েছিলো।

"কার কথা বললে?" আলবার্ট প্রশ্ন করে।

"বার্টচার। জুলিয়াস বার্টচার।"

"সে কি প্রায়ই এখানে আসা যাওয়া করে?"

"হ্যাঁ, তাই আমার মনে হয়।" কার্ল বলে। "তার সঙ্গে কারবার করতে চাও?"

"তার কি অনেক টাকা পয়সা আছে?" আলবার্ট প্রশ্ন করে।

"টাকার স্তূপ।" সম্ভ্রমের সাথে কার্ল জওয়াব দেয়।

"ঐ দেখ আর্থার আসছে।" উইলি হেসে বলে।

হলদে রঙের বর্ষাতি গায়ে একজন লোক পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। অন্য দুই লোক তার দিকে এগিয়ে যায়। সে তাদের পাশ

কাটিয়ে যেতে যেতে মুরব্বীর মতন তাদের অভিবাদনের জওয়াবে মাথা দুলিয়ে একজন জেনারেলের মতন টেবিলের দিকে যায়। আমি লক্ষ্য করলাম। কি কঠোর আর অপ্রীতিকর মেজাজ সে ধারণ করেছে। হাসিতেও সেই মেজাজ প্রকাশ পায়।

সে সদম্ভে আমাদের অভিবাদন জানায়। "আর্থার বসো।" উইলি কৃত্রিম হাসি হেসে বলে। লেদারহোজ দ্বিধা করে, কিন্তু এখানে তার স্বরাজ্য। সে যে একজন কেউকেটা তা আমাদের দেখাবার সুযোগ সে ছাড়তে পারে না।

"বসবো, তবে বেশীক্ষণ নয়।" বলেই সে আলবার্টের চেয়ারে বসে পড়ে। আলবার্ট কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমিও তার পিছনে পিছনে যেতে চাই, কিন্তু সে হয়ত বাইরের প্রাঙ্গনে যাচ্ছে। তাই ভেবে থেমে যাই। লেদারহোজ জিনের অর্ডার দেয়। সে ইতিমধ্যেই একজন লোকের সঙ্গে পাঁচ হাজার জোড়া সামরিক বুট আর বিশ ট্রাক পুরানো মাল নিয়ে দর কষাকষি শুরু করে দিয়েছে। লোকটার আঙ্গুলে ডায়মণ্ডের আঙটি চকচক করছে। আর্থার বার বার তাকিয়ে দেখছে। আমরা তার কথা শুনছি কিনা এ সম্বন্ধে সে সুনিশ্চিত হতে চায়।

আলবার্ট পাশের গোপন কক্ষগুলোর দিকে যাতায়াত করছে। কে যেন তাকে কি বলেছে। কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না, কিন্তু কথাটা তার মগজে ঢুকে আছে। শেষ কক্ষের আগের কক্ষটায় উঁকি দিতেই যেন সহসা তার মাথায় কুঠারাঘাত পড়ে। এক মুহূর্ত তার মাথাটা পাক খায়; আর সঙ্গে সঙ্গে সে এক টানে কক্ষের পর্দাটা সরিয়ে দেয়।

টেবিলের উপরে স্যাম্পেন গ্লাস আর একটা গোলাপ ফুলের তোড়া। টেবিলের ঢাকনিটা এলোমেলো হয়ে মেঝেতে ঝুলছে। টেবিলের পাশে লম্বা হেলান দেয়া আসনের উপর একজন সুকেশিনী মেয়ে বেঁকে বসে আছে। তার পরিহিত বসন বিস্রস্ত, কেশ আলুথালু, বক্ষদেশ অনাবৃত। মেয়েটা আলবার্টের দিকে পিছন ফিরে কেশ বিন্যাস করতে করতে গুণগুণ করছে।

"লুসি!" আলবার্ট রুক্ষ কণ্ঠে ডাক দেয়।

মেয়েটা দ্রুত ঘুরে আলবার্টের দিকে তাকায়, যেন ভূত দেখছে। সে জোর করে হাসতে চেষ্টা করে কিন্তু আলবার্ট নিস্পলক দৃষ্টিতে তার অনাবৃত বুকের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে তার ঠোঁটের হাসি এক নিমেষে

মিলিয়ে যায়। মিথ্যে বলে আর লাভ নেই। ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটা আসনের আড়ালে লুকোতে চেষ্টা করে। সে জড়িত কণ্ঠে বলে, "আলবার্ট, আমার কোন দোষ নেই। এই-----এই লোকটা—"তারপর তাড়াতাড়ি বলে ফেলে, "এই লোকটা আমাকে মাতাল করেছে। আলবার্ট—আমি মদ খেতে চাইনি—সে আমাকে বার বার মদ দিতে থাকে, তারপর আমি আর বুঝতে পারিনি আমি কি করছি। আমি কসম খেয়ে বলছি আলবার্ট—"

আলবার্ট নিরুত্তর।

"এ সবের অর্থ কি?" একটা লোক পিছন থেকে কৈফিয়ৎ চায়।

বার্টচার আঙ্গিনা থেকে ফিরে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে টলছে। সে আলবার্টের মুখের উপর তার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, "মেয়ে মানুষের দালালি করছ? তাই না? বেরিয়ে যাও বলছি! বেরিয়ে যাও।"

এক মুহূর্ত আলবার্ট তার মুখোমুখি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সহসা সোনার চেইন লাগানো পিঙ্গল বর্ণের স্যুট পরা লাল মুখো লোকটার স্পষ্ট মূর্তিটা তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের টেবিলে উপবিষ্ট উইলি সে দিকে তাকায়; হঠাৎ লাফিয়ে উঠে লোকদের ঠেলে সেই কক্ষটার দিকে ছুটে যায়। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তার পৌঁছার আগেই আলবার্ট তার সামরিক রিভলভারটা বের করে গুলি করে দিয়েছে। আমরাও ছুটে যাই।

বার্টচার একটা চেয়ার উঠিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলো। চেয়ারটা চোখ পর্যন্ত তোলার আগেই আলবার্ট চোখের এক ইঞ্চি উপরে কপালে গুলি করে দিয়েছে। তাকও করেনি। আমাদের কোম্পানীতে আলবার্টের তাক ছিলো সব চেয়ে অব্যর্থ। এ কাজে কেউ তার সমকক্ষ ছিলো না। বার্টচার দপ করে মেঝেতে পড়ে যায়। পা খিঁচতে থাকে। গুলিটা মারাত্মক। মেয়েটা আর্তনাদ করে ওঠে। উইলি ধাবমান দর্শকদের বাধা দিয়ে চেঁচায়, "তুমি সরে যাও।" মেয়েটার পাশে স্থির দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান আলবার্টকে আমরা জোর করে আঙ্গিনা পার করে দিয়ে রাস্তায় পাঠিয়ে দেই। সেখানে দুটো আসবাবপত্র ভর্তি ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। উইলি আমাদের অনুসরণ করে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে আলবার্টকে বলে, "তুমি এখনি সরে পড়। আজ রাতেই। এই মুহূর্তে।"

আলবার্ট উইলির পানে তাকায়। এই মাত্র যেন তার ঘুম ভেঙ্গেছে। সে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে বলে, "না, উইলি আমাকে ছেড়ে দাও। কি করতে হবে আমি জানি।" নিস্তেজ তার কণ্ঠ।

"তুমি কি পাগল হয়েছ?" কসোল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে।

আলবার্ট গা মোড়া দেয়। আমরা তাকে ধরে রাখি। আবার সে নিজকে মুক্ত করে নেয়। "না ফার্ডিন্যাণ্ড," সে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, যেন খুবই ক্লান্ত। "একটা কাজ যে করেছে, তাকে অন্য কাজটাও করতে হবে।"

এই বলে আলবার্ট ধীর পদে পথে নেমে যায়।

উইলি তার পিছনে ছুটতে ছুটতে তার সঙ্গে তর্ক করে, কিন্তু আলবার্ট কেবল নেতিবাচক মাথা নেড়ে মিল স্ট্রীটে প্রবেশ করে। উইলি তাকে অনুসরণ করে।

"তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনতে হবে।" কসোল চেঁচিয়ে বলে "নতুবা সে পুলিশের কাছে আত্ম সমর্পণ করবে।"

"ফ্যার্ডিন্যাণ্ড, তাতে কোন ফল হবে বলে আমার মনে হয় না। আমি আলবার্টকে চিনি।" কার্ল নিরাশ কণ্ঠে বলে।

"আত্মসমর্পণ করে ত আর মৃত লোকটাকে ফিরিয়ে আনা যাবেনা। কসোল বলে, "তাতেকি সুফল ফলবে? আলবার্টকে পালাতেই হবে।"

উইলির প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় আমরা দাঁড়িয়ে থাকি।

"কিন্তু কেন সে এ কাজ করলো?" একটু পরে কসোল প্রশ্ন করে।

"মেয়েটার উপর সে যারপর নাই ভরসা করতো।" আমি জওয়াব দেই।

উইলি একলা ফিরে আসে। কসোল উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে। "সে কি পালিয়েছে?"

উইলি নেতিবাচক মাথা নাড়ে। "সে পুলিশের কাছে চলে গেছে। তার সঙ্গে আমি পেরে উঠিনি। তাকে টেনে আনার চেষ্টা করলে সে আমাকেই গুলি করে আর কি।"

"হায় যীশু খ্রীষ্ট!" বলে কসোল ভ্যানের পাটাতনে মাথা ন্যস্ত করে। উইলি ঘাসের উপর বসে পড়ে। কার্ল আর আমি ভ্যানের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়াই।

কসোল—ফার্ডিন্যাণ্ড কসোল শিশুর মতন ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

একটা গুলি ছোঁড়া হয়ে গেছে, একটা প্রস্তর খণ্ড আলগা হয়ে গেছে, একটা কালো হাত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমরা একটা ছায়া থেকে পালাচ্ছি, কিন্তু আমরা একটা বৃত্তের মধ্যে ঘুরছি; তাই ছায়াটা আমাদের ধরে ফেলেছে।

আমরা দাবী আদায়ের জন্য চেঁচামিচি করেছি; পথের সন্ধান করেছি। আমরা নিজেদের ইস্পাত কঠিন করেছি, কিন্তু তবু আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। আমরা এই পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছি, তবু তা আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। আমরা পথ হারিয়েও না থেমে সামনে ছুটে চলেছি কিন্তু আমরা অনুভব করেছি যে ছায়াটা আমাদের পিছনে ধাওয়া করছে। তাই আমরা তার আক্রমণ থেকে পলায়নের চেষ্টা করেছি। আমরা ভেবেছি যে এটা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। আমরা জানতে পারিনি যে ছায়াটাকে আমরা টেনে হিঁচড়ে সঙ্গে নিয়ে আসছি। আমরা যেখানে ছিলাম ছায়াটাও সেখানে নীরবে দাঁড়িয়েছিলো।—আমাদের পিছনে নয়, আমাদের অভ্যন্তরে, আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গরূপে।

আমরা নিজেদের জন্য গৃহ নির্মাণের কথা ভাবছিলাম। সে গৃহের চত্বরে উদ্যান থাকবে। সে চত্বরে দাঁড়িয়ে সাগরের পানে তাকিয়ে বায়ু সেবনের আনন্দ উপভোগ করব। কিন্তু এ জ্ঞান আমাদের ছিলো না যে গৃহ নির্মাণের জন্য ভিত্তি প্রয়োজন। আমরা ফ্রান্সের সেই সব বোমা বিধ্বস্ত গর্ত-ভরা প্রান্তরের মতন। সেই প্রান্তর বাহ্যতঃ আশেপাশের কর্ষিত ক্ষেত-খামারের মতনই শান্তিপূর্ণ; কিন্তু ফ্রান্সের বোমাবিধ্বস্ত প্রান্তরের গর্ভে এখনো বিস্ফোরক পদার্থ লুকিয়ে আছে। আর যত দিন মাটি খুঁড়ে সেই প্রান্তরটাকে বিস্ফোরকমুক্ত করা না হবে ততদিন এই প্রান্তর কর্ষণ করতে গেলে তা কৃষক এবং কর্ষিত ভূমি উভয়ের পক্ষেই বিপদসঙ্কুল হয়ে থাকবে।

আমরা এখনো সৈনিক রয়ে গেছি, অথচ এই সত্যটা আমরা উপলব্ধি করছিনা। আলবার্টের তরুণ জীবন শান্তিপূর্ণ আর বাধাগ্রস্ত না হলে তার জীবনে অনেক কিছু প্রিয় হতো, অনেক কিছুর প্রতি তার অন্তরঙ্গতা জন্মাতো আর এই ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠতো। আজ এই ভালোবাসা আর অন্তরঙ্গতাই

তাকে আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করতো, তাকে এই সংসারে আত্ম-রক্ষার সামর্থ্য দিতো; কিন্তু ভালোবাসা আর অন্তরঙ্গতা তার জীবন থেকে মুছে গেছে। যুদ্ধ সীমান্ত থেকে সে নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছে। তার অবদমিত তারুণ্য আর নিস্ফল কামনা; স্বগৃহ ও স্বজনের প্রতি প্রেম-প্রীতি, আকর্ষণবিহীন অস্তিত্ব এই একটি মাত্র মানুষের প্রতিই তাকে অন্ধের মতন ঠেলে দিয়েছে। সে মানুষটি তাকে ভালোবাসে বলে তার ধারণা ছিলো: কিন্তু এই ভুল ধারণা যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো, তখন সে গুলি করা ছাড়া আর কিছুই জানে না। কারণ গুলি করা ছাড়া আর কোন কাজ তাকে শিখানো হয়নি। সে একজন সৈনিক না হলে তার এ ছাড়াও অনেক পন্থা জানা থাকতো। তাই গুলি করতে তার হাত কাঁপেনি—বহু কাল ধরে সে গুলি করতেই অভ্যস্ত, গুলি লক্ষ্যভ্রস্ট করতে নয়।

স্বপ্নচারী তরুণ আলবার্ট আর লাজুক প্রেমিক আলবার্টের অস্তিত্বের অন্তরালে এখনো সৈনিক আলবার্ট বিরাজ করছে।

বলিরেখা চিহ্নিত বৃদ্ধা মহিলা তার মা এটা বুঝতে পারে, না। তাই মহিলা প্রশ্ন করেন, "কেমন করে সে এমন কাজ করতে পারলো? সে কত শান্ত সুবোধ ছেলে ছিলো।" তাঁর চুলে বাঁধা ফিতা আর ওড়নাটা কাঁপে—তাঁর সারাটা দেহ বিষাদ ব্যথায় কাঁপে। "হয়ত পিতৃহারা বলেই সে এমন গর্হিত কাজ করতে পেরেছে। তার বাবা যখন মারা যান, তখন সে সবে চার বছরের শিশু, কিন্তু সে যে অত্যন্ত শান্ত সুশীল ছেলে ছিলো—"

"এখনো সে তেমনি আছে, ফ্রাঁ ট্রসকি," আমি বলি। তিনি আমার কথার খেই ধরে আলবার্টের শৈশব জীবনের কথা বলতে শুরু করেন। কথা তাঁকে বলতেই হবে। তাঁর জীবন যে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। তাঁর প্রতিবেশীরা, পরিচিত লোকজন তাঁকে দেখে গেছে। আলবার্টের দু'জন শিক্ষকও তাঁর সাথে দেখা করে গেছেন, কিন্তু কেউ ব্যাপারের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারেনি।

"তাদের উচিত এখন চুপ করে থাকা।" আমি বলি "তারাই এ জন্য আংশিক দায়ী।"

মহিলা আমার পানে তাকান। আমার কথাটা মনে হয় তাঁর বোধগম্য হয়নি। তিনি আবার কথা বলতে থাকেন—কেমন করে আলবার্ট প্রথম

হাঁটতে শিখে। আলবার্ট কখনো অন্যান্য শিশুর মতন কান্নাকাটি করতো না। সে ছিলো অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ইত্যাদি। কিন্তু কেমন করে সে এমন কাজ করতে পারলো ?

আমি অবাক হয়ে মহিলার পানে তাকাই। আলবার্ট সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। আমার নিজের মায়েরও হয়ত এমনি অবস্থা। মায়েরা শুধু ভালোবাসতেই জানেন ; তাঁরা শুধু এটাই বোঝেন।

"কিন্তু ফ্রাঁ ট্রসকি," আমি সাবধানে বললাম, "আলবার্ট যুদ্ধে গেছলো, আপনাকে এ কথাটা মনে রাখতে হবে।"

"হ্যাঁ, তাই"। তিনি জওয়াব দেন কিন্তু আমার কথার তাৎপর্যটা তিনি বুঝতে পারেন না। "আচ্ছা, বার্টচার লোকটা কি খারাপ ছিলো ?" তিনি জিজ্ঞেস করেন।

"লোকটা ছিলো পাঁজি।" আমি সংক্ষেপে জওয়াব দেই, "সে যে পাঁজি ছিলো, আমি বাজি রেখে তা বলতে পারি।"

তিনি আমার কথায় সায় দেন। "আমারও তাই মনে হয়। আলবার্ট জীবনে কোন কীট-পতঙ্গকেও কষ্ট দেয়নি। হ্যান্স অবশ্য তা করতো কিন্তু আলবার্ট নয়। আচ্ছা, আলবার্টকে এখন তারা কি করবে বলে তোমার মনে হয় ?"

"এমন সাংঘাতিক-কিছু করবে না।" তাঁকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে আমি বলি। "উত্তেজিত অবস্থায় সে এ কাজ করেছে। এটা প্রায় আত্ম-রক্ষামূলক আক্রমণের পর্যায়ে পড়ে।"

"প্রভুকে ধন্যবাদ," তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। "কিন্তু উপর তলার দর্জি যে বলে যে এ জন্য তার ফাঁসি হবে।"

"তা হলে দর্জিটা একটা আস্ত পাগল।" আমি রুক্ষ কণ্ঠে বলি।

"হ্যাঁ, সে আরো বলে যে আলবার্ট একটা খুনী। না, আলবার্ট কখনো খুনী নয়। কখনো নয়।" এই বলে তিনি ফুঁপিয়ে ওঠেন।

"দর্জি বেটাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি বেটাকে দেখে নেব।" আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলি।

"আমি আজকাল সাহস করে বড় একটা বাড়ীর বাইরে যাইনা।" তিনি কাঁদতে থাকেন। "ঐ বেটা সব সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।"

"আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, ফ্রাঁ ট্রসকি।" আমি বলি।

আমরা দরজার বাইরে যাই। মহিলা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে ফিসফিস করেন, "ঐ যে আবার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।" বলে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। আমি মনস্থ করি যে লোকটা একটা কিছু বললে আমি তার মাথাটা গুড়িয়ে দেব। সে জন্য দশ বছর শ্রীঘরে থাকতে হলেও রাজি; কিন্তু সে আমাদের এড়িয়ে চলে। তার সঙ্গে যে দুটি মেয়েলোক সেখানে ঘুরাঘুরি করছিলো, তারাও।

ঘরে ফিরে গেলে আলবার্টের মা হ্যান্স আর আলবার্টের অল্প বয়েসের ফটো দেখিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার কান্না থামিয়ে দেন; যেন লজ্জা পেয়েছে। এব্যাপারে বৃদ্ধরা বাচ্চাদের মতন। সহজেই তাদের কান্না পায় আবার সহজেই তা থেমে যায়। বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার মুখে তিনি প্রশ্ন করেন, "তোমার কি মনে হয় আলবার্ট প্রচুর খাবার পায়?"

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পায়।" আমি জওয়াব দেই। "কার্ল ব্রোগার সে দিকে খেয়াল রাখবে। সে যথেষ্ট খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে।"

"আমার কাছে এখনো গুটিকয় প্যানকেক আছে; আলবার্ট তা খুব পছন্দ করে। তুমি কি মনে কর তারা আমাকে এগুলো নিয়ে যেতে দেবে?" তিনি জানতে চান।

"চেষ্টা করতে দোষ নেই,' আর যদি তারা এগুলো নিয়ে যেতে না দেয়, তবে আপনি আলবার্টকে শুধু বলবেন, "আলবার্ট, আমি জানি তুমি নির্দোষ। শুধু এতটুকুই বলবেন।"

তিনি সম্মত হন। "আমি হয়ত আলবার্টকে যথেষ্ট আদর করিনি।" তিনি বলেন, "কিন্তু হ্যান্স? তুমি জান হ্যান্সের পা নেই—"

আমি তাকে নিশ্চয়তা দেই। "বেচারা বাছা আমার।" তিনি বলেন, "ওখানে একলা বসে আছে।"

তার কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বলি, "আমি এবার দর্জি বেটার সঙ্গে কথা বলব। সে আর আপনাকে বিরক্ত করবে না। আমি দিব্যি করে বলছি।"

দর্জি এখনো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা বৈশিষ্ট্যবিহীন নির্বোধ ধরনের ব্যবসায়ী চেহারা। সে বিদ্বেষভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। আমি কাছে যেতেই বকবক শুরু করে। আমি তার কোটের কলারটা

চেপে ধরে বলি, "বদমায়েশ কাঁচিওয়ালা। যদি তুমি এই ভদ্র মহিলাকে কখনো একটা কথা বলেছ তবে আমি তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব। আমার কথা শুনছ?" এই বলে তাকে ধাক্কা দিয়ে কাপড়ের গাঠরীর মতন দরজাব হাতলের উপর ফেলে দেই। "নোংরা ইতর কোথাকার! আবার যদি আমাকে আসতে হয়, তবে আমি তোমার শরীরের হাঁড় গুড়ো করে দেব। বদমায়েশ কাঁচিওয়ালা!" তারপর তাব দুই গালে চড় কষিয়ে দেই।

আমি অনেক দূব চলে আসার পর সে আমাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাতে থাকে, "আমি তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাব, তোমাকে অন্তত: একশো মার্ক জরিমানা করিয়ে ছাড়ব।" আমি ফিরে তার দিকে এগুতেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পথশ্রান্ত অপরিচ্ছন্ন রাহে লুদভিগের ঘরে বসে আছে। সংবাদপত্রে আলবার্টের সংবাদ পড়ে সে তৎক্ষণাৎ ফিবে এসেছে। "তাকে যে-করেই হোক বের করে আনতে হবে।" সে বলে।

লুদভিগ তার দিকে তাকায়।

"আধডজন তেজস্বী বুদ্ধিমান পুরুষ আর একটা মোটব গাড়ী হলে" রাহে বলে যায়, "প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পাবে না। তাকে যখন কোর্টে নেয়া হয় তখনই উপযুক্ত সময়। আমরা জনকয়েক আসামীর গাড়ীতে লাফিযে উঠে একটা গোলমালের সৃষ্টি করব; আর সেই ফাঁকে আমাদের জন দুয়েক মোটর গাড়ীতে করে তাকে নিয়ে পালাবে।"

লুদভিগ কয়েক মুহূর্ত তার কথা শুনে মাথা নাড়ে, "তাতে কোন কাজ হবে না, জর্জ। চেষ্টা ব্যর্থ হলে আলবার্টের আরো ক্ষতি হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আলবার্ট বরং অল্পে নিষ্কৃতি পেতে পারে। তুমি যা বলছ, তাতে কোন যুক্তি নেই। আমি অবশ্য নির্দ্বিধায় তোমাদেব সঙ্গে থাকতে রাজি, কিন্তু আলবার্টকে তোমরা বেরিয়ে আসতে সম্মত করতে পারবে না। সে তা চায় না।"

"তা হলে আমবা তাকে বাধ্য করব।" রাহে ব্যাখ্যা করে বলে, "তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে আর আমি একবাব তাতে হাত দিলে—।"

লুদভিগ নীরব।

"তাতেও কোন ফল হবে না, জর্জ।" আমি বলি, "তাকে বের করে আনলেও সে আবার ফিরে যাবে। জোর করে তাকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলে সে উইলিকে প্রায় গুলি করেছিলো আর কি!"

রাহে হাতে মাথা ন্যস্ত করে। লুদভিগকে বিবর্ণ ও দুর্বল দেখায়। "আমার ধারণা, আমরা সবাই হারিয়ে গেছি।" সে নৈরাশ্য ভরা কণ্ঠে বলে।

কেউ এই কথায় সাড়া দেয় না। মরময় মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করে।

আমি অনেকক্ষণ লুদভিগের সাথে একলা বসে থাকি। সে হাতের উপব মাথা রেখে বসে থাকে। "সব ব্যর্থ আর্নস্ট। সব ব্যর্থ। আমরা খতম হয়ে গেছি, কিন্তু পৃথিবী আপন ধারায় এমনিভাবে চলছে যেন কোন দিন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। বেশী দিন বাকী নেই যখন আমাদের উত্তর পুরুষেরা স্কুলের বেঞ্চে বসে সাগ্রহে যুদ্ধের কাহিনী শুনবে আর ভাববে যে তাবা সেকালে বেঁচে থাকলে তারাও যুদ্ধে গিয়ে স্কুলের একঘেয়েমী থেকে রেহাই পেতো। এমন কি এখনই তারা ফ্রি কোর-এ যোগদানেব জন্য সমবেত হচ্ছে—সতর বছব বয়েসে তারা বাজনৈতিক অপরাধে অপবাধী; আমি অত্যন্ত ক্লান্ত আর্নস্ট।"

"লুদভিগ,—" বলে আমি আবেগে তার স্কন্ধদেশ জড়িয়ে ধরি।

সে নিরানন্দ হাসি হেসে বলে, "আর্নস্ট, স্কুল জীবনে একবার আমার একটা প্রেমঘটিত ব্যাপার ঘটেছিলো। তা যুদ্ধেব আগের ঘটনা। কয়েক সপ্তাহ আগে সেই মেয়েটার সঙ্গে আমার দেখা হয। মেয়েটাকে আগের চেয়েও সুন্দর লাগলো। মনে হলো, আমাদের জীবনে অতীত দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে। আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতে লাগলো। আরপর সহসা একদিন আমি উপলব্ধি করলাম—" বলেই সে তার মাথাটা টেবিলের উপর স্থাপন করে; আবার সে যখন মাথাটা তোলে তখন তার দৃষ্টিতে মৃত্যুযন্ত্রণা—"এ সব কাজ আমার জন্য নয়, আমি যে ভয়ঙ্কর অসুখে অসুস্থ।"

সে দাঁড়িয়ে জানালা খুলে দেয়। বাইরে স্নিগ্ধ রাত্রি, তাবা-ভরা আকাশ। আমি বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে বাইরেব দিকে তাকিয়ে আছি। লুদভিগও অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকে। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "তোমাব মনে পড়ে ছোট বেলায় আমরা আইকেনডর্ফের গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে রাত্রের বেলায় বনভূমিতে বেরিয়ে পড়তাম?"

"হ্যাঁ লুডউইগ, মনে পড়ে," সে অন্য কথা ভাবছে মনে করে সানন্দে সাড়া দিলাম। "গ্রীষ্মের শেষ দিকটায় আমরা বেরিয়ে পড়তাম। একবার আমরা একটা সজারু ধরেছিলাম।"

তার মুখাবয়বে স্বাভাবিকতার আভাস। "আমরা ভাবতাম যে ভেঁপু বাজিয়ে বাজিয়ে শ্লেজ-কোচে ভ্রমণে গেলে একটা সত্যিকার এডভেঞ্চার হবে। মনে আছে ইতালী ভ্রমণে যাওয়ার জন্য আমাদের কি প্রবল আকাঙ্খা ছিলো?"

"হ্যাঁ, যে-কোচটা আমাদের নিয়ে যাবার কথা ছিলো, সে কোচটা আর কোন দিন এলো না; আর ট্রেনে চড়ে যাবার পয়সাও আমাদের ছিলো না।"

লুদভিগের মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো; তাকে অস্বাভাবিক শান্ত সৌম্য মনে হলো, "তারপর আমরা ওয়ার্থারের গ্রন্থ পড়তে আরম্ভ করলাম।" লুদভিগ বললো।

"আর মদ খেতে আরম্ভ করলাম।" আমি সংযোজন করলাম।

সে হাসে। "আর গ্রীন হেনরিখ! মনে আছে আমরা জুডিথ সম্বন্ধে কেমন কানাকানি করতাম?"

আমি মাথা নাড়ি। "কিন্তু পরে কিন্তু তুমি হোণ্ডারলিনকেই সব-চেয়ে বেশী পছন্দ করতে।"

লুদভিগকে অদ্ভুত শান্ত ও দুর্ভাবনামুক্ত মনে হলো। সে সহজ শান্ত কণ্ঠে কথা বলছে, "আমাদের কত রঙিন পরিকল্পনা ছিলো। কত যোগ্য আর মহান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিলো। আমরা সব তালগোল পাকিয়ে দিলাম আর্নস্ট।—বোকা হাবা গোরুর দল—"

"হ্যাঁ", আমি বিষণ্নভাবে বললাম, "শেষ পর্যন্ত সে সবের কি পরিণতি হলো—"

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলাম। চেরি গাছে মৃদু বাতাস বইছে—মৃদু বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, একটা উল্কা স্থানচ্যুত হয়। ঢং ঢং করে বারোটা বাজে।

"এবার ঘুমোতে হয়" বলে লুদভিগ হাত বাড়িয়ে দেয়, "শুভরাত্রি, আর্নস্ট।"

"তোমার সুখ নিদ্রা হোক।"

রাত্রির শেষ দিকে কে আমার দরজায় প্রচণ্ড আঘাত করে। আমি চমকে উঠে সোজা বসে পড়ি। "কে?"

"আমি। কার্ল। দরজা খোল।"

আমি এক লাফে শয্যা ত্যাগ করি।

সে সবেগে ঘরে প্রবেশ করে। "লুদভিগ---"

আমি তাকে ঝাপটে ধরে বলি, লুদভিগের কি হয়েছে?"

"মরে গেছে----"

ঘরটা ঘুবতে থাকে। আমি আবার বিছানায় পড়ে যাই, "ডাক্তার আন।"

কার্ল একটা চেয়ার মেঝেতে আঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। "আর্নস্ট। সে মরে গেছে—শিরা কেটে---"

কেমন করে যে কাপড়-চোপড় পরলাম জানি না, কেমন করে এখানে এলাম তাও জানি না। সহসা দেখলাম যে আমি একটা ঘরে আছি। চোখ ধাঁধানো আলো। রক্ত, স্ফটিক আর পাথরেব টুকবো সেই আলোতে ঝলমল কবছে আর পাশে একটা বেঞ্চে একটা জীর্ণশীর্ণ মৃত দেহ পড়ে আছে। মৃতদেহেব শানিত বিবর্ণ যন্ত্রণা কাতর মুখাবয়বে অর্ধ মুদিত চোখ।

কি যে হচ্ছে আমি বুঝতে পারিনা। বাড়ীওয়ালা আছে, কার্ল আছে, হৈ-চৈ আছে। তাদের একজন আমার সঙ্গে কথা বলছে—এখানে থাকতে বলছে, আমি তা বুঝতে পারি। তারা কাকে আনতে যেতে চায়। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। আমি একটা সোফায় নিচু হয়ে কুঁকড়ে বসে থাকি। দরজায় শব্দ হয়। আমি নডতে পারি না, কথা বলতে পারি না। সহসা আমি আবিষ্কাব করি যে লুদভিগের সঙ্গে আমি একা। তার পানে তাকাই।

কার্লের সাথেই তার শেষ দেখা। তখন তাকে শান্ত এবং বলতে গেলে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো। কার্লের বিদায়ের পর সে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে কতকক্ষণ কি যেন লিখে। তাবপর সে একটা চেয়ার জানালার পাশে টেনে গবম পানি ভবা একটা গামলা পাশের টেবিলে রাখে; দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নগ্ন বেঞ্চটার উপর ঠিকঠাক হয়ে বসে; তারপর হাতটা গামলার পানিতে ডুবিয়ে হাতের শিরাটা কাটে। কাটার সময় সামান্য ব্যথা লাগে। সে রক্ত ধারার নির্গমন দেখে। এই দৃশ্যে ভাবনা সে অনেকদিন ভেবেছে—জঘন্য বিষাক্ত রক্ত দেহ থেকে বের করে দেয়ার ভাবনা।

সারা ঘর তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘরের প্রতিটি পুস্তক প্রতিটি পেরেক, স্ফটিকের বিকীরণ, রঙ ধনুর বর্ণাঢ্যতা। সে তার ঘর আর ঘরের অভ্যন্তরের সবকিছু আত্মস্থ করে নেয়; সবকিছু তার শ্বাস-প্রশ্বাস

আর অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে যায়। আবার সবকিছু অস্পষ্ট অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এবার যৌবনের ছবি তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। আই-কেনডর্কের রচনার প্রতি আসক্তি, অরণ্যভূমি পেরিয়ে অরকাঁটার ফাঁদ, বোমাবর্ষণ আর কামানের,গোলা। তারপর সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসে। তার মনে আর আতঙ্ক জাগে না; সব ধ্বনি একাকার হয়ে ঘন্টা ধ্বনির মতন বাজে; ঘন্টাধ্বনি তীব্রতর হয়। ঘন্টাধ্বনি তার মস্তিষ্কে এমনি জোর আঘাত করে যে মনে হয় মস্তিষ্ক ফেটে যাবে। তারপর ঘন্টাধ্বনি অস্পষ্টতর হয়ে যায়। জানালার বাইরে অন্ধকার নামে, টুকরো টুকরো মেঘ ভাসতে থাকে, মরালের ঝাঁক দেখার ইচ্ছা একবার তার মনে জাগে। এইত রক্তাভধূসর মরালের ঝাঁক। একবার ফ্লাণ্ডার্সে এক ঝাঁক মরাল আকাশ পথে রক্তিম চাঁদের অভিমুখে উড়েছিলো—না? এই দৃশ্য দূর দুরান্তরে মিলিয়ে যায়। এবার রজতশুভ্র স্রোতস্বিনী স্ফীত হয়ে ঝলমল করে, সাগরের বুকে দ্বীপ ভেসে ওঠে, দিক চক্রবাল জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। এবার সহসা এক করুণ আর্তনাদে তার কণ্ঠ বন্ধ হয়ে যায়; ভাবনাগুলো মস্তিষ্কের অভ্যন্তর থেকে বিলীয়মান চৈতন্যের উপর ছিটকে পড়ে। আতঙ্ক আর পরিত্রাণের চিন্তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে টলতে টলতে দাঁড়াতে চেষ্টা করে হাত তুলতে চায়; সে দেহটা ঝাঁকি দেয়, কিন্তু ইতিমধ্যে দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছে। চার দিকে সব কিছু ঘুরছে আর ঘুরছে। ধীরে ধীরে এই ঘূর্ণনের অবসান হয়। দৈত্যপাখীটা তখন তার বিরাট কালো ডানা মেলে ধীর মন্থর গতিতে এসে ডানা দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়।

কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। আবার লোকজন সমবেত হয়েছে। তারা লুদভিগকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি লোকটাকে সরিয়ে দেই। কেউ যেন লুদভিগকে স্পর্শ না করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মুখাবয়ব আমার চোখে পড়ে—নির্জীব, বিবর্ণ কঠিন, অদ্ভুত মুখাবয়ব। আমি আর তাকে চিনতে পারি না—আমি আর তাকে চিনতে পারি না। আমি টলতে টলতে বেরিয়ে পড়ি।

কেমন করে আমি আমার ঘরে এলাম জানি না। আমার মনে শূন্যতা বিরাজ করছে। আমার অবশ হাত দুটো চেয়ারের হাতলে ন্যস্ত হয়ে আছে।

আমি ফুরিয়ে গেছি, লুদভিগ। আমিও শেষ হয়ে গেছি। আমি আর বেঁচে থাকব কেন? এখানে থাকার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। আমরা এখানে সমূলে উৎপাটিত, ভস্মীভূত। তুমি কেন একলা চলে গেলে?

আমি উঠে দাঁড়াই। আমার হাত তপ্ত, চোখ জ্বালা করছে, জ্বর জ্বর লাগছে। আমার চিন্তার খেই নেই। কি করছি বুঝতে পারছিনা। আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলি, "আমাকে নিয়ে যাও। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।"

শীতে আমার দাঁত ঠকঠক করছে; হাত দুটো ঘামে ভিজা। আমি সামনের দিকে হোঁচট খয়ে পড়ে যাই। আমার চোখের সামনে বড় বড় কালো বৃত্ত কাঁপছে।

সহসা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনড় শক্ত হয়ে যায়। ওটা কি দরজা জানালার শব্দ? আমার দেহ শিউরে ওঠে। আমি স্খলিত পদে উঠে দাঁড়াই। আমার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে চাঁদের আলো প্রবেশ করছে। সেই আলোতে দেখতে পাই, দেয়ালের গায়ে আমার বেহালাটার পাশে আমার পুরানো সামরিক কোটটা ঝুলছে। আমি সন্তর্পণে এগিয়ে যাই যাতে কোটটা আমাকে দেখতে না পায়। আমি কোটটার কাছে এগিয়ে যাই। এই কোটই আমাদের সবকিছু বিনষ্ট করেছে—আমাদের তারুণ্য, আমাদের জীবন। এক টানে কোটটা নামিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব ভাবি, কিন্তু পর মুহূর্তেই কোটটা কোমল হাতে ঝেড়ে মুছে গায়ে দেই। অনুভব করি এই কোটটা আমার দেহ-মনের মাধ্যমে আমাকে আয়ত্ত্ব করে ফেলেছে। আমার দেহ শিউরে ওঠে, হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করে। এই নীরবতার মাঝখানে ছেঁড়া তারের একটা বেসুরো আওয়াজ বেজে ওঠে। আমি চমকে ঘুরে দাঁড়াই। ভয়ে আমি দেয়াল ঘেঁষে আত্মগোপন করি।

খোলা দরজার অস্পষ্ট আলোতে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে দুলতে থাকে; আরো এগিয়ে এসে আমাকে হাতছানি দেয়—একটি মানব মূর্তি। মুখাবয়বে কালো চক্ষু কোটর। দুই চোখের মাঝখানে একটা হাঁ-করা ফাটল। মুখটা কথা বলছে, কিন্তু শব্দ হচ্ছে না। "তুমি কি ওয়াল্টার?" আমি অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করি। ওয়াল্টার উইলেন ব্রুক আগষ্টের ১৭ তারিখ পেসেনডেলে নিহত হয়। আমি কি পাগল হয়ে গেছি? স্বপ্ন দেখছি? আমি কি অসুস্থ? তার পিছনে আর একজন ঘরে প্রবেশের জন্য ঠেলাঠেলি করছে। বিবর্ণ, পঙ্গু, নুব্জদেহ—ফ্রেডাবিক টমবার্গ। তার শিরদাঁড়াটা সয়সনসে শেলের টুকরোর ঘায়ে ভেঙ্গেছিলো। সে তখন ট্রেঞ্চের সিঁড়িতে বসেছিলো। এবার তারা—একদল ছায়ামূর্তি ঠেলাঠেলি করে ঘরে প্রবেশ করে। দৃষ্টিহীন নির্জীব চোখ—বিবর্ণ বিকট চেহারা,

ছায়া মূর্তিতে ঘর ভরে গেছে। ফ্রান্স কেমেরিখ—সতর বছর বয়েসে পা কেটে ফেলার তিন দিন পর সে মারা যায়—স্টেনিলসস কেটাজিনস্কি টেনে টেনে মাথা নুইয়ে আসছে,—মাথা থেকে এখনো রক্তের ক্ষীণ ধারা চুয়ে পড়ছে—জেরার্ড ফেলডক্যাম্প—ইপরেসে মর্টারের আঘাতে যার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, পল বমার-অক্টোবরে '১৮ নিহত হয়, —হেনরিখ ভেসলিং, এন্তন হেইনজম্যান, হ্যায় ওয়েস্হাস, অটো মেথিস, ফ্রান্স ওয়াগনার। কেবল ছায়ামূর্তি আর ছায়ামূর্তি—ছায়ামূর্তির দীর্ঘ মিছিল—অন্তহীন এই মিছিল। তারা জোর করে ঘরে ঢুকে বই-পুস্তক আর দরজা-জানালার উপর চেপে বসে। তাদের আগমনে ঘর ভরে যায়।

কিন্তু হঠাৎ আতঙ্ক আর বিস্ময় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ধীর মন্থর গতিতে একটি বলিষ্ঠতর কালো ছায়ামূর্তি দেখা দেয়। দুই বাহুর উপর ভর দিয়ে ছায়ামূর্তিটা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে। ছায়া-মূর্তিটা দেহ ধারণ করে সজীব হয়ে ওঠে। দেহটা নিজকে টেনে টেনে ঘরে প্রবেশ করে। কালো মুখে সাদা দন্তপাটি চকচক করে; গভীর চক্ষু কোটরে চোখ দুটোও জলজল করে। সীল মাছের মতন গড়িয়ে গড়িয়ে সে আমার দিকে এগোয়—সেই ইংরেজ কাপ্তান। তার পিছনে পিছনে তার পায়ের পট্টিও খসখস করে সামনের দিকে এগোয়। একটু গড়িয়ে এসে সে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত আমার দিকে তুলে ধরে। আমি আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠি, "লুদভিগ। লুদভিগ। লুদভিগ আমাকে বাঁচাও।"

আমি পুস্তকের স্তূপ তুলে তার হাত লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করি। বোমা। লুদভিগ। বোমা।" আমি গোঙাতে থাকি। আমি আমার মাছ-পালার বাক্সটা তার দিকে ছুঁড়ে মারি। তারপর বেহালাটা। আমি একটা চেয়ার উঠিয়ে ওর বিকৃত হাস্যময় মুখটার উপর আঘাত করি, আর "লুদভিগ। লুদভিগ।" বলে চেঁচাতে থাকি। আমি পালিয়ে দরজা পেরিয়ে যাই। আমার ধাক্কায় একটা চেয়ার মেঝেতে পড়ে যায়। আমার পিছনে চীৎকার—গলাফাটা চীৎকার—আমি হাঁপাতে থাকি। ইংরেজ কাপ্তানটা আমার পিছন পিছন ছুটছে; আমি রাস্তায় নামি, লোকটাও রাস্তায় নামে। আমি "বাঁচাও। বাঁচাও।" বলে চীৎকার করতে করতে ছুটি। একটা থাবা আমার কাঁধ চেপে ধরে। কাপ্তানটা আমাকে ধরে ফেলেছে। আমি হোঁচট খাই। একটা চকচকে কুঠারের আঘাতে আমি ধরাশায়ী হই।

সপ্তম অধ্যায়

তা কি অনেক বছরের কথা? কিম্বা কয়েক সপ্তাহের কথা মাত্র? কুয়াশার মতন বা দুরান্তের বজ্রঝটিকার মতন অতীত আমার মনের দিক-চক্রবালে ভাসতে থাকে। আমি দীর্ঘ কাল থেকে অসুস্থ। জ্বরের তীব্রতা কমলেই মায়ের উদ্বেগ কাতর মুখ আমার চোখে পড়েছে। তারপর এক অসীম ক্লান্তি আমার সব দুর্দমনীয়তা কেড়ে নিয়েছে; এক জাগর-নিদ্রায় আমার সব চিন্তা-ভাবনা মুছে দিয়েছে; আমি রক্তের মৃদু মধুর সঙ্গীত ধ্বনি আর সূর্য রশ্মির উষ্ণতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি।

শেষ গ্রীষ্মের সমারোহে প্রান্তর ভূমি উদ্ভাসিত তৃণ শয্যায় গা এলিয়ে পড়ে থাকা। তৃণ শীর্ষ মুখাবয়বের চেয়ে উঁচু। এই তৃণ-ডগাগুলো বাতাসে আন্দোলিত হয়ে মুখের উপর নুয়ে নুয়ে পড়ে। এই ত পৃথিবী। বাতাসের ছন্দায়িত মৃদু আন্দোলন ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। যেখানে শুধু ঘাস জন্মেছে, সেখানে কাস্তে দিয়ে ফসল কাটার মৃদু শব্দের মতন মৃদু গুঞ্জরন বাতাসে ভেসে বেড়ায়। কোথাও এই গুঞ্জরনে গভীর বিষাদের সুর। দীর্ঘক্ষণ নীরবে কান পেতে থাকলে এই গুঞ্জরন শোনা যায়।

তখন এই নিস্তব্ধতা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিচিত্র বর্ণের পতঙ্গের দল ঘাসের ডগায় বসে দোল খায়, ভ্রমরেরা এরোপ্লেনের মতন গুণগুণ করে উড়ে বেড়ায় আর নিসঙ্গ কোন নাম-না-জানি পাখী গাছের আগডালে বসে থাকে।

একটা পিপীলিকা আমার হাতের কব্জিতে উঠে আমার কোটের আস্তিনের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়। পিপীলিকাটা তার চেয়েও লম্বা একটা শুকনো ঘাসের টুকরো টেনে নিয়ে যায়। আমি মৃদু আঁচড় অনুভব করি; বুঝতে পারি না পিঁপড়েটা না ঐ ঘাসের টুকরোটা আমার বাহুতে জীবনের অনুভূতি জাগিয়ে আমার দেহে শিহরণ তুলছে; কিন্তু আস্তিনের অভ্যন্তরে বাতাস ঢুকতেই আমার মনে হয় মৃদু প্রেমালিঙ্গনাবদ্ধ পিঁপড়েটা অস্বস্তি অনুভব করছে।

প্রজাপতিরা বাতাসে ভর করে ঘুরে বেড়ায় যেন বাতাসে সাঁতার কাটছে। তারা ফুলের উপর বসে আর পরক্ষণে আমি চোখ তুলে তাকাতেই দেখি, দুটো প্রজাপতি আমার বুকের উপর বসে আছে। একটা লাল ডোরাওয়ালা হলদে পাতার মতন আর একটা ময়ূরের চোখের মতন বেগুনী রঙের। এরা গ্রীষ্ম ঋতুর অলঙ্কার, সাজ-সজ্জার উপকরণ। আমি অত্যন্ত সন্তর্পণে শ্বাস-নিঃশ্বাস গ্রহণ করি ; তাতেও তাদের পাখা কাঁপে, তবে তারা আমাকে ছেড়ে যায় না। বর্ণাঢ্য তৃণভূমির মাথার উপর নির্মল উজ্জ্বল আকাশ বিরাজমান। একটা ডাঁশ পোকা আমার জুতোর উপর বসে বোঁ বোঁ করছে।

চড়কা বুড়ীর সাদা সুতো মাকড়সার জাল আর লুতাতন্তু বাতাসে ভাসে, গাছের ডাল-পাতায় ঝোলে আর বাতাস এগুলো বয়ে বেড়ায়। এগুলো আমার দেহে আর পোশাকে জড়িয়ে যায় ; আমার চোখ-মুখ ঢেকে দেয়। এবার আমার দেহটা পর্যন্ত তৃণভূমির সঙ্গে মিশে যায় ; আমার দেহ-সীমা অনিশ্চিত হয়ে যায়। তৃণ-সীমার সঙ্গে আমার দেহ-সীমার ব্যবধান ঘুচে যায়। আলোর বিকিরণে আমার দেহ রেখা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমার জুতোর চামড়ার উপর ঘাসের শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে ; আমার পশমী কোটের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাটির গন্ধ লাগে। আমার মাথার চুলের ভিতর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়, দেহাভ্যন্তরের রক্ত কণিকা দেহ-চর্মে আঘাত করে। রক্ত কণিকা আগত বস্তুরাশির মিলন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে, স্নায়ু-কেন্দ্রে শিহরণ জাগে, প্রজাপতির পদস্পর্শ আমি আমার বক্ষদেশে অনুভব করি। পিঁপড়ের পদচারণা ধ্বনি আমার ধমনীর অবতলে প্রতিধ্বনিত হয়—তারপর তরঙ্গ শক্তি সঞ্চয় করে, আমার প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমি এবার একটা নাম পরিচয়হীন পর্বত মাত্র।

পৃথিবীর নিস্তব্ধ প্রবাহে জোয়ার ভাটা চলে, আমার রক্তধারাও সেই প্রবাহের সাথে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। পৃথিবীর উষ্ণ অন্ধকারের মাধ্যমে আমার রক্তধারা গোপনে বিন্দু বিন্দু রূপে স্ফটিকের তাৎপর্য নিয়ে শিকড়ে প্রবেশ করে গতিপথের সন্ধান করে, মাটির তলার বাঁধ ভেঙ্গে উথলে ওঠে। আমার রক্তবিন্দু ক্ষুদ্র স্রোত-ধারা, নদ-নদী, সাগর এবং জলসিক্ত বাষ্পরাশি উপরে তুলে নিয়ে মেঘের সঞ্চার করে সেই বাষ্পধারার সঙ্গে মিলে যায়। এমনি করে তা বৃত্তাকারে

নিয়ত আবর্তিত হয়। শেষ পর্যন্ত দেহটা অদৃশ্য হয়ে যায়; দেহের কাঠামোটা অবশিষ্ট থাকে, খোসাটা পড়ে থাকে। আমি হারিয়ে যাই; বিস্মৃত হয়ে যাই। পৃথিবী আমার দেহটাকে আবার জড়িয়ে ধরে; আমি যেন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাই।

আমি চোখ মেলে তাকাই।

আমি কোথায় আছি? কোথায় ছিলাম? ঘুমিয়েছিলাম? সেই রহস্যময় মিলনের উপলব্ধি এখনো আমার মধ্যে রয়েছে। আমি কান পেতে রাখি, নড়তে সাহস পাইনা। আমার উপলব্ধি অব্যাহত থাকে। আমি ঘাসের উপর শুয়ে থাকি। প্রজাপতিরা উড়ে গেছে, বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে, পাখীরাও তাদের গন্তব্যস্থলের দিকে গেছে, লুতাতন্তু এখনো আমার কাপড়ে লেগে আছে। আমি আমার হাত সঞ্চালন করি। কী আনন্দ! আমি আমার জানু বাঁকিয়ে উঠে বসি। আমার মুখাবয়ব সিক্ত। আমি আবিষ্কার করি যে আমি কাঁদছি, অশান্ত কান্না কেঁদেছি—যা ছিলো তা যেন চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেছে।

আমি তবু কতক্ষণ বিশ্রাম করি; তারপর উঠে কবরস্থানের দিকে চলতে থাকি। আগে কোন দিন আমি সেখানে যাইনি। লুদভিগের মৃত্যুর পর এই প্রথম একাকী বেরিয়ে পড়লাম।

এক বৃদ্ধা লুডউইগের কবরটা দেখিয়ে দিতে আমার সঙ্গে যায়। একটা বীচ গাছের বেড়ার পিছনে কবরটা। কবরে চিরশ্যামল পেরিউঙ্কিল লতা লাগানো হয়েছে। কবরের মাটি এখনো আলগা রয়েছে। কবরের উপর কয়েকটা শুকনো মালা পড়ে আছে; কবরের উপর খোদাই করা সোনালী অক্ষরের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে গেছে। অক্ষরগুলা পড়া যায় না।

এখানে আসতে বরং আমার ভয় হচ্ছিলো, কিন্তু এখানকার স্তব্ধতায় কোন ভয় নেই। কবরের উপর দিয়ে মৃদু বাতাস বইছে। সেপ্টেম্বরের আকাশে সোনালী রঙ। একটা গাছে বসে একটা কালো পাখী ডাকছে।

আহ্ লুদভিগ! আজই প্রথম আমি কিছুটা শান্তি ও স্বগৃহের আনন্দ অনুভব করলাম, অথচ তুমি এখানে নেই। আমি এখনো তা বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি এখনো সন্দেহ করছি যে এটা আমার ক্লান্তি আর দুর্বলতা, কিন্তু হয়ত একদিন এটা আমাদের ধরা দেবে। হয়ত এ জন্য আমাদের নীরবে প্রতীক্ষা করতে হবে। এটা একদিন নিজেই আসবে;

হয়ত আমাদের দেহ আর পৃথিবী এই দুটোই আমাদের পরিত্যাগ করেনি, হয়ত আমাদের কিছু করার প্রয়োজন নেই, আমরা শুধু এদের নির্দেশ শুনব আর তা পালন করব।

হায়, লুদভিগ। আমরা কেবল অনুসন্ধান করেছি—কেবলই অনুসন্ধান করেছি। অথবা পথভ্রান্ত হয়েছিলাম, আমাদের পতন ঘটেছিলো; আমরা জীবনের লক্ষ্য খুঁজতে গিয়ে নিজেদের ডিঙিয়ে গেছি। আমরা লক্ষ্য খুঁজে পাইনি আর তুমি মাটির তলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে। আর এখন তৃণভূমির উপর বায়ু প্রবাহ আর পাখীর গানই কি আমাদের একত্র করে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? দিকচক্রবালের এক খণ্ড মেঘ আর গ্রীষ্মের একটি মাত্র বৃক্ষই কি ইচ্ছাশক্তির চেয়ে শক্তিমান?

লুদভিগ, আমি তা জানিনা; আমি তা বিশ্বাস করি না, কারণ আমি আশা ত্যাগ করেছিলাম। তবে এটা সত্য যে আত্মসমর্পণ কি তা আমরা এখনো জানি না, এর শক্তিও আমরা অনুভব করিনি। আমরা দৈহিক ক্ষমতার কথাই শুধু জানি।

কিন্তু একটি পথের দিশা যদি মিলেই তাতে আমার কি?—তুমি যে নেই—

বৃক্ষরাজির ওপার থেকে রাত্রি নেমে আসছে—সঙ্গে নিয়ে আসছে অশান্তি আর বিষণ্নতা। আমি কবরের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চেয়ে থাকি।

নুড়ি বিছানো পথের উপর পদচারণার খচ খচ শব্দ শোনা যায়; চোখ তুলে তাকাই। জর্জ রাহে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আমাকে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

"তোমাকে অনেক দিন দেখিনি জর্জ। এতদিন কোথায় ছিলে?" আমি প্রশ্ন করি।

সে একটা দুর্বোধ্য ভঙ্গি করে বলে, "অনেক কিছুতে হাত লাগিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম।"

"তা হলে তুমি আর সেনাবাহিনীতে নেই?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"না" বলে সে রুক্ষ কণ্ঠে উত্তর দেয়।

শোক পোশাক পরিহিত দুজন স্ত্রীলোক বৃক্ষসারির মাঝের পথ দিয়ে আসছে। তাদের হাতে পানি ঢালার পাত্র। বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে।

রাহে চোখ তুলে চায়, "আমি যুদ্ধ সীমান্তে পুরানো বন্ধুত্বের অবশেষটুকু পাব বলে ভাবছিলাম, কিন্তু সেখানে এখন ইতরজনোচিত দুর্বৃত্তসুলভ মনোবৃত্তি বিরাজ করছে। সেখানে যুদ্ধের একটা হাস্যকর প্রহসন চলছে। তারা কল্পনা করে যে, কয়েক ডজন রাইফেল সংগ্রহ আর গুদামজাত করেই পিতৃভূমি উদ্ধার করা যাবে। যে সব অভাবগ্রস্ত বেকার অফিসারদের করার কিছু নেই, তারাই যেখানে কোন গোলমালের সম্ভাবনা দেখে সেখানে জড়ো হয়। স্থায়ী ভবঘুরের দল সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেসামরিক জীবনে ফিরে আসার ভয়ে সামরিক বাহিনীতে ঘোরাফেরা করে। এরা যুদ্ধ ফেরত পরিত্যক্তদের অবশিষ্টাংশ। এদের সঙ্গে রয়েছে কতিপয় আদর্শ-বাদী আর কৌতূহলী তরুণ, যারা নতুন কিছু করার নেশায় ঘুরে বেড়ায়। এসব ঘর পালানো হিংসাতুর বেপরোয়ার দল পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত। তারপর..."

রাহে কতকক্ষণ নীরবে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি আড়-চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বুঝবার চেষ্টা করি। তাকে কেমন যেন স্নায়বিক দুর্বল আর ক্ষ্যাপাটে বলে মনে হয়। তার চোখের চারদিকে কালশিটে দাগ। সে এবার সোজা হয়ে বলে, "আর্নস্ট, তোমাকে বলছি। আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। একদিন আমাদের মধ্যে যুদ্ধের মতন একটা সংঘাত হলো। তারা বললো, এযুদ্ধ নাকি কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে। কিন্তু মৃতদেহগুলো যখন দেখলাম—তাদের অনেকের গায়ে পুরানো সামরিক পোশাক, তারা অনেকেই আমাদের পুরানো বন্ধু—আমার অন্তরটা ব্যথায় কেঁদে উঠলো। বিমান হামলায় একবার আমি একটা অর্ধেক কোম্পানী খতম করে দিয়েছিলাম, তাতে মনে আঘাত পাইনি। যুদ্ধ-যুদ্ধই, কিন্তু জার্মানীর এই মৃত বন্ধুরা তাদের পুরানো বন্ধুদের গুলি খেয়ে মরেছে। না অর্নস্ট, আমি তাতে নেই। এ কাজ আমার নয়।"

আমার তখন ম্যাকসওয়েল আর হীলের কথা মনে পড়ে। আমি মাথা নাড়ি।

আমাদের মাথার উপর একটা পাখী ডাকছে, সূর্য আরো রক্তিম হয়ে পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ছে। রাহে চিবানো তামাকের থুথু ফেলে বললো, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তার কিছু কাল পরে বলা নেই কওয়া নেই, আমাদের দুজন লোক নিখোঁজ হয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নাকি আমাদের একটা রাইফেল কারখানার অবস্থান সম্বন্ধে শত্রুপক্ষকে অবহিত

করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কোন তদন্ত ছাড়াই তাদের সাথীরা তাদের দুজনকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। নিহতদের একজন যুদ্ধ সীমান্তে আমার কর্পোরেল ছিলো; মানুষ নয়, খাঁটি রত্ন। তাই আমি সব ছেড়েছুঁড়ে চলে এলাম।" এই বলে সে আমার দিকে চায়; তারপর বলতে থাকে, "অবস্থা এই স্তরে নেমেছে আর্নস্ট। হ্যাঁ, পুরানো দিনের কথা ভাবতে গেলে মনে পড়ে কি দৃঢ় মনোবল আর আক্রমণাত্মক মানসিকতা নিয়ে আমরা তখন বেরিয়েছিলাম।" সে তার হাতের সিগারেটটা দূরে ফেলে দিয়ে বলে, "আর এখন কি জাহান্নামী কাণ্ড কারখানা চলছে! কেন অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটলো তাই আমি জানতে চাই।"

আমরা এবার উঠে নিগর্মন পথের দিকে হাঁটতে থাকি। সূর্যালোক গাছের পাতায় আর আমাদের চোখেমুখে খেলা করছে। সব কিছু অবাস্তব মনে হয়—আমাদের আলোচনার বিষয়-বস্তু, এই উষ্ণ মৃদু বাতাস, পাখীর কূজন আর করুণ স্মৃতির মন্থন।

"আসলে তুমি এখন কি করছ বাছে?" আমি প্রশ্ন করি।

তৃণ-লতার ডগায় সে তার লাঠি দিয়ে আঘাত করতে করতে চলছে। "আমি অনেক কিছু দেখলাম আর্নস্ট।—পেশা, আদর্শ, রাজনীতি। কোনটার সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলাম না। এর অর্থ কি? সব জায়গায় মুনাফাখোরি, সন্দেহ, ঔদাসীন্য আর চরম স্বার্থপরতা—"

চলতে চলতে আমি ক্লান্তি অনুভব করি। তাই আমরা এক জায়গায় বসে পড়ি।

শহরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চূড়াগুলো কেঁপে কেঁপে চকচক করছে. বাড়ীর ছাদ থেকে বাষ্প আর চিমনি থেকে সাদাটে ধোঁয়া কুণ্ডলায়িত হয়ে পাকিয়ে উপরে উঠছে। জর্জ সে দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে, "মাকড়সার মতন তারা তাদের অফিসে, দোকানে, তাদের পেশায় ওত পেতে পরস্পরের রক্ত চুষে নিঃশেষ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে; আর অন্যরা—তাদের পরিবার-পরিজন, সমাজ, কর্তৃপক্ষ, আইন আর রাষ্ট্র—তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে আছে। এই মাকড়সার জালের উপর আর এক মাকড়শার জাল। এটা সত্যি, কেউ কেউ এটাকেই জীবন বলে আখ্যায়িত করতে পারে, কেউ হয়ত এই অবস্থায় চল্লিশটি বছর বা আরো অধিক কাল হামাগুড়ি দিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে পারে, কিন্তু সীমান্তের জীবনে আমি এই শিক্ষা পেয়েছি যে সময় জীবনের মাপ-কাঠি

নয়। কেন আমি জীবনের চল্লিশটি বছর নিম্নমুখী হয়ে চলব? আমি আমার সমস্ত সম্পদ একটা কার্ডের উপর বাজি রেখেছি আর সেই বাজিটা হলো জীবন। তাই আমি নগণ্য প্রাপ্তির আশায় খেলতে পারি না।"

"শেষ বছর তুমি সীমান্তে ট্রেঞ্চে ছিলে না জর্জ," আমি বলি। "বিমান-বাহিনীর ক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্ন হতে পারে, তবে মাসের পর মাস আমরা কোন দুশমনের মুখ দেখতে পাইনি, কামানের খোরাক হয়েছি মাত্র। কোন খেলা নেই, কোন ডাকাডাকি নেই, বাজি ধরার সুযোগ নেই,—শুধু প্রতীক্ষা। শেষ পর্যন্ত কোন একজন তার তাসের প্যাকেটটা বন্ধ করে দিলো।"

"আমি যুদ্ধের কথা মোটেই বলছি না আর্নস্ট। আমি তারুণ্য আর সাথীত্বের কথা বলছি।"

"হ্যাঁ, তা শেষ হয়ে গেছে।" আমি বলি।

"আমরা একটা কৃত্রিম গৃহে বাস করছি" জর্জ-গম্ভীর চিত্তে বলে, "এখন বুড়ো হতে চলছি, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি অভিযোগ করছিনা, জীবনের হিসেব-নিকেশ করছি মাত্র। আমার জন্য সব রাস্তা বন্ধ। উদ্ভিদের নিষ্কর্মা জীবন যাপন ছাড়া আমার আর অন্য গতি নেই। সে জীবন আমার কাম্য নয়। আমি মুক্ত স্বাধীন জীবন চাই।"

"ওহে জর্জ," আমি তার কথার উত্তরে বলি, "তুমি যা বলছ, তার অর্থ হলো, সব কিছুর অবসান হয়ে গেছে; কিন্তু আমার বক্তব্য হলো যে কোথাও যেমন করেই হোক আমাদের জন্য একটা প্রারম্ভ আছে। আমার বিশ্বাস, আমি আজ তার একটা আভাস পেয়েছি। লুদভিগ তা জানত, কিন্তু সে ছিলো ভয়ঙ্কর অসুস্থ—"

জর্জ আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি আর্নস্ট। তুমি একটা কোন কাজে লাগতে চাও ------"

আমি তার উপর ভর দিয়ে বলি, "তোমার এই কথায় মনে হয়, তুমি কাজে লাগাটাকে আবেগপূর্ণ আর ঘৃণ্য মনে কর, কিন্তু এর মধ্যেও কোথাও সাথীত্ব রয়েছে, যদিও এখন পর্যন্ত হয়ত আমরা তা উপলব্ধি করতে পারিনি।"

প্রান্তর-ভূমিতে আমি আজ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা তাকে বলতে আমার ইচ্ছে হয়, কিন্তু ভাষায় তা আমি প্রকাশ করতে পারি না।

আমরা নীরবে পাশাপাশি বসে থাকি। ক্ষণেক পরে তাকে প্রশ্ন করি "এখন তুমি কি করবে বলে ভাবছ জর্জ?"

সে চিন্তাক্লিষ্ট হাসি হাসে। "আমি কি করব তাই জিজ্ঞেস করছ আর্নস্ট? আমার দুর্ভাগ্য যে আমি নিহত হইনি। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, আমি এখন হাস্য-বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠেছি।"

আমি তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকাই। "আমার মনে হয়, আমি আর একবার কিছু কালের জন্য সীমান্তে যাব------" সে নিশ্চিত কণ্ঠে আমাকে জানায়।

হাতের ছড়িটা নাচাতে নাচাতে সে সামনের দিকে চেয়ে থাকে।, "তোমার মনে পড়ে জিয়েসকে একবার কি বলেছিলো? পাগলা গারদে বসে? সে ফ্লুরিতে ফিরে যেতে চেয়েছিলো। তার ধারণা ছিলো, তাতে তার লাভ হবে।"

আমি ইতিবাচক মাথা নাড়ি, "সে এখনো পাগলা-গারদেই আছে। কার্ল সেদিন তাকে দেখতে গিয়েছিলো—."

সহসা মৃদু বাতাস বইতে থাকে। আমরা পপলার বৃক্ষের সারির উপর দিয়ে শহরের দিকে তাকাই। এখানে আমরা ছোটবেলায় খেলা করতাম। জর্জ ছিলো আমাদের সর্দার। আমি তখনই তাকে ভালোবাসতাম যদিও ভালোবাসা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তখন আমাদের ছিলো না।

আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেই।

(২)

বিচারের দিন যতই এগুতে থাকে, আলবার্টের কথা তত বেশী আমার মনে পড়তে থাকে। হঠাৎ একদিন আমার চোখের উপর স্পষ্ট ভেসে উঠে একটা মাটির প্রাচীর; প্রাচীরের গায়ে ছিদ্র। একটা রাইফেল হাতে একজন লোক গভীর মনোযোগ সহকারে সেই ছিদ্রের উপর তাক করে আছে। সেই লোকটা ব্রুনো মুয়েকেনহপট। আমাদের ব্যাটেলিয়ানের সর্বোত্তম স্নাইপার—আড়াল থেকে দুশমনদের গুলি করে মারার ওস্তাদ। তার গুলি কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

আমি লাফিয়ে উঠি। সে এখন কি করছে তা দেখতে হবে আর এসব নিয়ে সে এখন কি করছে তা জানতে হবে।

অনেকগুলো ফ্ল্যাটের একটি উঁচু বাড়ী। সিঁড়িটা ভেজা। আজ শনিবার। সব জায়গায় পানির বালতি আর ধোওয়া-মোছার বুরুশ। পরনের পোশাক গুটিয়ে কয়েকজন স্ত্রীলোক ধোওয়া মোছা করছে।

দরজায় অত্যন্ত কড়া আওয়াজের ঘন্টা। কে একজন দ্বিধাভরে এসে দরজাটা খুলে দেয়। আমি ব্রুনোর সঙ্গে দেখা করাব ইচ্ছে প্রকাশ করি। স্ত্রীলোকটা আমাকে ভিতরে যেতে দেয়। সার্টের আস্তিন গুটিয়ে ব্রুনো তার মেয়ের সাথে খেলা করছে। মেয়ের বয়েস পাঁচ কি এমনি একটা কিছু হবে। গালিচার উপর সে রূপালী কাগজ বিছিয়ে নদী বানিয়েছে; তার উপরে কাগজের নৌকা বসানো হয়েছে। কোন কোনটায় আবার ছোট চাকা লাগানো হয়েছে। এগুলো স্টীমার; তাতে পুতুলের আরোহী। ব্রুনো তৃপ্তিতে একটা পাইপ টানছে। একটা পর্সেলিনের গামলায় একটা পুতুলেব সৈনিক, সৈনিকটা জানু পেতে তাক করছে। গামলার গায়ে নীতি বাক্য লেখা: পিতৃভূমির জন্য চক্ষু ও হস্ত ব্যবহার কর।

"হ্যালো আর্নস্ট।" বলে ব্রুনো অভিবাদন জানিয়ে মেয়েকে নিজের মনে খেলা করতে ছেড়ে দেয়। আমরা এবার বসার ঘরে যাই। ঘরে সোফা আব লাল রঙেব মখমল মোড়া চেয়ার; চেয়ারেব পিছনে ফুল-তোলা আচ্ছাদন। মেঝেটা এমনি মসৃণ যে আমার পা পিছলে যায়। প্রতিটি আসবাব আপন জায়গায় পরিপাটি সাজানো। বড় বড় শঙ্খ এবং অন্যান্য ঘর সাজানো ছোটখাট জিনিস আর আলোক চিত্র পাশের একটা টেবিলে রক্ষিত। এগুলোর মাঝখানে লাল মখমলের উপর একটা কাঁচের ঢাকনির অভ্যন্তরে ব্রুনোর সুটিং কৃতিত্বের সাক্ষী তার মেডেলগুলো।

আমরা এবার পুরানো দিনের কথা আলাপ করি। "তুমি কি এখনো তোমার লক্ষ্যভেদের কৃতিত্বের তালিকাটা রেখেছ?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করি।

"তুমি ভাবছ কি?" ব্রুনো ভর্ৎসনার সুরে প্রতিবাদ করে "সেই তালিকাটা আমি সযত্নে সসম্মানে রেখে দিয়েছি।"

সে তালিকাটা একটা ড্রয়ার থেকে বের করে উৎসাহ ভরে পাতা উল্টোতে থাকে। "অবশ্য গ্রীষ্মকালটাই আমার পক্ষে সব সময় অনুকূল ছিলো। কারণ তখন সন্ধ্যার শেষ সময় পর্যন্ত ভালো দেখা যায়। এখানে—না একটু সবুর কর। হ্যাঁ—১৮ই জুন চারটে, ১৯শে জুন তিনটে, ২০শে

জুন একটা, ২১শে দুটো, ২২শে একটা, ২৩শে জুন একটাও না—বাদ গেলো। কুত্তার বাচ্চারা ইতিমধ্যেই চালাক হয়ে গেছে। তাই খুব সতর্ক। কিন্তু ২৬শে জুন নতুন সৈন্যেরা আসে—তারা ব্রুনোর খ্যাতির কথা শোনেনি—নয় জন। তুমি এখন কি বলতে চাও?"

সে খুশীতে উপচে পড়ে। "আর তাও কি? দু ঘন্টার মধ্যে। মজার ব্যাপার। জানিনা কেমন করে তা হলো। সম্ভবতঃ আমি বেটাদের থুৎনীর নিচে লক্ষ্য করতাম আর বেটারা ছাগলের মতন পড়তো। আবার দেখ ২৯শে জুন রাত ১০টা ২ মিনিট—মাথায় গুলি। তামাসা করছিনা আর্নস্ট। মনে রেখো আমার সাক্ষী-প্রমাণ আছে। এইত লেখা রয়েছে: "বিবরণের সত্যতা স্বীকৃত কম্পানী সার্জেন্ট মেজর শেলীর সই। রাত্রি দশটা। প্রায় অন্ধকার; একেই স্যুটিং বলে। সে একটা সময় ছিলো।"

"হ্যাঁ ব্রুনো", আমি বলি, "চমৎকার লক্ষভেদ সন্দেহ নেই। থাক গে। আচ্ছা, সে সব বেচারা বোকাদের জন্য তোমার এখন মাঝে-মাঝে দুঃখ হয় না?"

"কি বললে?" সে অবাক হয়।

আমি আমার কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বলি, "অবশ্য তখনকার পরিস্থিতিতে কাজটা সঠিকই হয়েছিলো, কিন্তু এখন কেমন যেন অন্য রকম মনে হয়।"

সে তার চেয়ারটা ক্রোধে-বিরক্তিতে পিছনে ঠেলে নিয়ে যায়। "তা হলে তুমি বলশেভিক; আমি নিশ্চিত বলতে পারি। তা ছিলো আমাদের কর্তব্য—হুকুম। আর—" মর্মাহত হয়ে সে তার বইটা বন্ধ করে সযত্নে কাগজে মুড়িয়ে আবার ড্রয়ারে রেখে দেয়।

আমি একটা ভালো সিগার দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করি। তাতে কয়েকটা টান দেওয়ার পরেই আমাদের মধ্যে আবার সদ্ভাব ফিরে আসে। তখন সে তার রাইফেল ক্লাব সম্বন্ধে আমাকে বলে, "প্রতি শনিবার সেখানে আসর বসে। এইত সে দিন সেখানে বল-নৃত্যের অনুষ্ঠান হলো; খুব উঁচুদরের নৃত্য। এর পরে স্কিট্‌ল খেলা হবে, পুরস্কার বিতরণ হবে। আর্নস্ট, তুমিও মাঝে মধ্যে এসো। তুমি সেখানে খুব ভালো বিয়ার পাবে, দরেও সস্তা। তবে দাম বেড়ে যাচ্ছে, বুঝতেই ত পাচ্ছ। এই যে—" বলে সে একটা সোনালী কলার-চেইন দেখায়, তাতে 'চ্যাম্পিয়ান—সট, ব্রুনো প্রথম।' লেখা। বেশ ভালো নয় কি?"

তার মেয়েটা আসে। একটা নৌকোর কাগজ খুলে গেছে। ব্রুনো সযত্নে তা মেরামত করে দিয়ে মেয়েটাকে আদর করে। নীল ফিতে পরা মেয়েটা খিলখিল করে হাসে।

এবার ব্রুনো আমাকে আর একটা সাইন-বোর্ডের কাছে নিয়ে যায়। তাতে বিচিত্র জিনিসের সমাবেশ। এগুলো বার্ষিক মেলায় সে স্যুটিং প্রতিযোগিতায় অর্জন করেছে। এক পেনিতে তিনটে সট্। যে নির্দিষ্ট সংখ্যায় লাগাতে পারে সে নিজেই তার পুরস্কার বেছে নিতে পারে। সে-দিন ব্রুনোকে স্যুটিং গ্যালারী থেকে টেনেও সরানো যায়নি। সেদিন সে একগাদা টেডি বিয়ার, ডিশ, কাপ, বিয়ার-মগ, কফিপট, এ্যাস্ট্রে, এমন কি দুটো বেতের চেয়ার পর্যন্ত জয় করে আনে। "প্রতিযোগিতার শেষের দিকে তারা আমাকে কোথাও ঢুকতে দেবেনা।" সে হাসতে থাকে। "আমি তাদের দেউলিয়া করে ছাড়তাম। একবার ঠকে তারা চালাক হয়ে যায়।"

আমি অন্ধকারে পথে বেরিয়ে পড়ি। বাড়ী থেকে রাস্তায় আলো পড়ে। ব্রুনো আবার তার মেয়ের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠবে, তার স্ত্রী সেখানে তার রাতের খাবার নিয়ে আসবে। রোববার সে তার পরিবারকে প্রমোদ-ভ্রমণে নিয়ে যাবে। সে একজন স্নেহপ্রবণ পিতা, আদর্শ স্বামী এবং সম্মানিত নাগরিক। তার বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ নেই।

আর আলবার্টের বিরুদ্ধে? আমাদের বিরুদ্ধে?

আলবার্টের বিচার শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগেই আমরা আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। শেষ পর্যন্ত সাক্ষীদের ডাক পড়ে। দুরু দুরু বুকে আমরা বিচার কক্ষে প্রবেশ করি। বিষন্ন মুখে আলবার্ট তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সামনের মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা চোখের ইশারায় তাকে বলতে চেষ্টা করি "সাহস রাখ আলবার্ট। আমরা তোমাকে বিপদে ফেলে ত্যাগ করব না।" কিন্তু সে চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকায় না।

আমাদের নাম ডাকার পর আমাদিগকে আবার বিচার-কক্ষ ত্যাগ করতে হয়। বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পাই জাদেন আর ভ্যালেনটিন দর্শকদের মধ্যে সামনের সারিতে বসে আছে। তারা আমাদের চোখ টিপে।

একের পর এক সাক্ষীদের ডাকা হয়। উইলির সাক্ষ্য গ্রহণে বিশেষ করে দীর্ঘ সময় লাগে। তারপর আমার পালা আসে। আমি ভ্যালেনটিনের

দিকে চট করে একবার তাকাই; একবার অন্যের অলক্ষ্যে মাথা নাড়ি। আলবার্ট কোন বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেছে। এমনটিই আশা করেছিলাম। সে তার উকিলের পাশে নির্লিপ্ত চিত্তে বসে আছে। কিন্তু উইলির কান লাল; শিকারী কুকুরের মতন সে বাদী পক্ষের উকিলের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। স্পষ্টতঃই মনে হয়, দুজনের মধ্যে একচোট হয়ে গেছে।

আমাকে শপথ বাক্য পড়ানো হয়; তারপর কোর্টের প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করতে শুরু করেন। তিনি জানতে চান আলবার্ট আগে কোন দিন বার্টচারের সাথে একটা হেস্তনেস্ত করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে কিনা। আমি নেতিবাচক উত্তর দিতেই তিনি বলেন যে কতিপয় সাক্ষী আলবার্টের এই শান্ত ও সতর্ক আচরণে বিস্মিত হয়েছেন।

"সে সব সময়ই এই রকম।" আমি জওয়াব দেই।

"সতর্ক?" বাদী পক্ষের উকিল বাধা দিয়ে বলেন।

"শান্ত।" আমি সমুচিত জওয়াব দেই।

প্রেসিডেন্ট আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করেন, "এমন পরিস্থিতিতেও?"

"অবশ্যই।" আমি জওয়াব দেই। "এর চেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেও তাকে শান্ত স্থির দেখা গেছে।"

"কেমন খারাপ পরিস্থিতিতে?" বাদী পক্ষের উকিল অঙ্গুলি তুলে প্রশ্ন করেন।

"বোমা-বর্ষণের কালে।"

সে তার অঙ্গুলি নামিয়ে নেয়। উইলি আনন্দে ঘোঁৎঘোৎ করে। সে উইলির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানে।

"তা হলে আসামী অপরাধ অনুষ্ঠানের কালেও ধীর স্থির ছিলো?" প্রেসিডেণ্ট আবার প্রশ্ন করেন।

"এখন যেমন ধীর স্থির আছে তখনো তেমন ছিলো।" আমি নিরস কণ্ঠে জওয়াব দেই। "আপনি দেখতে পাচ্ছেন না সে কেমন ধীর স্থির বসে আছে, যদিও তার বুকে আগুন জ্বলছে। সে সৈনিক; সীমান্তে সে এই শিক্ষা পেয়েছে যে সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে লাফালাফি করে নৈরাশ্যে অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। এই শিক্ষা না পেলে তাকে আর এখন এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না।"

বিবাদী পক্ষের আইনজীবী তার নোট বইয়ে এটা টুকে নেয়। প্রেসিডেণ্ট এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন "তাই যদি হয়, সে গুলি করলো কেন? নিশ্চয় মেয়েটার পক্ষে এক আধবার অন্য কারো সাথে কাফেতে যাওয়া এমন কোন গুরুতর ব্যাপার নয়।"

"তার কাছে পেটে গুলি লাগার চেয়েও এটা গুরুতর।"—আমি জওয়াব দেই।

"তা কেমন করে হয়?"

"কারণ এই মেয়েটাই ছিলো পৃথিবীতে তার একমাত্র সম্বল।"

"তার ত মা রয়েছে।" বাদী পক্ষের উকিল ফোড়ন কাটে।

"সে ত আর তার মাকে বিয়ে করতে পারে না।" আমি ঝাঁঝালো জওয়াব দেই।

"বিয়ে করাটা তার জন্য এত জরুরী হলো কেন? বিয়ে করার পক্ষে সে কি এখনো খুব অল্প বয়স্ক নয়?" প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করেন।

"একজন সৈনিক হওয়ার পক্ষে সে ত অল্প বয়স্ক ছিলো না।" আমি প্রতিবাদ করি। "আর সে এই কারণে বিয়ে করতে চেয়েছিলো যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সে দিশেহারা হয়ে পড়ে, নিজকে নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তার স্মৃতি তাকে সর্বদা সন্ত্রস্ত করে রাখে। তাই সে এমন একটা কিছু চেয়েছিলো যা তাকে সুস্থির ও নির্ভয় রাখবে। আর এই মেয়েটাই ছিলো তার একমাত্র উপায়।"

প্রেসিডেণ্ট আলবার্টের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওহে আসামী, তুমি কি এখন প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত? এই সাক্ষী যা বললো, তা কি সত্যি?"

আলবার্ট এক মুহূর্ত দেরী করে। উইলি আর আমি চোখের ইশারায় তার উত্তর নির্ধারণ করে দেই। সে অনিচ্ছায় বলে, "হঁ্যা"।

"এবার আমাদের বলবে, তোমার সঙ্গে একটা রিভলভার ছিলো কেন?" প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করেন।

আলবার্ট নিরুত্তর।

"সে সব সময় তা সঙ্গে রাখতো," আমি কথার ফাঁকে বলি।

"সব সময়?" প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করেন।

"নিশ্চয়ই।" আমি জওয়াব দেই, "রুমাল আর ঘড়ির মতন।"

প্রেসিডেণ্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান, "কিন্তু রিভলভার আর রুমাল ত ভিন্ন জিনিস।"

"তা ঠিক," আমি বলি, "কিন্তু তার কাছে রুমালের প্রয়োজনীয়তা রিভলভারের চেয়ে কম ছিলো—প্রায়ই সে সঙ্গে রুমাল রাখতো না।"

"আর রিভলভার—"

"রিভলভার বহুবার তার জীবন রক্ষা কবেছে। সে তিন বছর অনবরত এটা বহন করেছে। এই অভ্যেস সে সীমান্ত থেকে নিয়ে এসেছে।"

"কিন্তু এখন ত তার এটার প্রয়োজন নেই ; এখন শান্তির সময়।"

আমি কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে বলি, "আমরা এখনো তা আবিষ্কার করতে পারিনি।"

প্রেসিডেণ্ট এবার আলবার্টকে উদ্দেশ করে বলেন, "আসামী, তুমি কি এখন তোমার বিবেকের বোঝা নামাতে চাও না? যা করেছ, তার জন্য কি তুমি অনুতপ্ত নও?"

"না"—আলবার্ট উদাস কণ্ঠে জওয়াব দেয়।

চারদিক স্তব্ধ। জুরির সদস্যবৃন্দ মনোযোগ দিযে সব কথা শোনেন। বাদী পক্ষের উকিল সামনের দিকে ঝোঁকে। উইলিকে দেখে মনে হয় সে বুঝি আলবার্টের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। আমি বেপরোয়াভাবে তার দিকে চেয়ে থাকি।

"কিন্তু তুমি একটা মানুষ খুন করেছ," প্রেসিডেণ্ট জোর দিয়ে বলেন।

"আমি অনেক মানুষ খুন করেছি।" আলবার্ট নির্লিপ্ত কণ্ঠে জওয়াব দেয়।

বাদী পক্ষের উকিল তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দরজার পাশে উপবিষ্ট জুরি সদস্য নখ কামড়ান বন্ধ করে দেয়। "তুমি কি করেছ বললে?" প্রেসিডেণ্ট রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করেন।

"যুদ্ধক্ষেত্রে", আমি চট করে বাধা দেই।

"তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।" বাদী পক্ষের আইনজীবী নৈরাশ্যব্যঞ্জক সুরে মন্তব্য করে।

আলবার্ট এবার মাথা তোলে, "তা ভিন্ন ব্যাপার হলো কেমন করে?"

বাদী পক্ষের উকিল দাঁড়িয়ে বলে, "তুমি এখানে যা করেছ তার সঙ্গে পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধের তুলনা করতে চাও?"

"না", আলবার্ট রুক্ষ কণ্ঠে বলে, "তবে আমি তখন যাদের গুলি করেছি, তাদের কেউ আমার কোন ক্ষতি করেনি।"

"ভয়ঙ্কর কথা।" বিরক্তিতে বাদী পক্ষের উকিল প্রেসিডেণ্টের দিকে মুখ ফিরায়, "আমার সনির্বন্ধ নিবেদন—"

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ধীর স্থির। "যদি প্রতিটি সৈনিক তুমি যা ভাবছ তেমন ভাবনা ভাবে তখন আমাদের দশা কি হবে?"

"তা সত্যি" আমি বলি, "তবে তা আমাদের দায়িত্ব নয়।"

"যদি এই লোকটাকে—' আমি আলবার্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলি, "যদি এই লোকটাকে গুলি করার প্রশিক্ষণ দেয়া না হতো তবে সে এখন একটা লোককে গুলি করতো না।"

বাদী পক্ষের উকিল ক্রোধে লাল হয়ে যায়। "অযাচিতভাবে সাক্ষীরা কথা বলবে, এমনটি কখনো শোনা যায়নি।"

প্রেসিডেণ্ট তার আপত্তি অগ্রাহ্য করে বলেন, "আমার মনে হয় অন্তত এক আধবার আমরা প্রচলিত বিধানের ব্যতিক্রম করতে পারি।"

ইতিমধ্যে আমাকে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় ডাকা হয়েছে। আলবার্ট জড়োসড়ো হয়ে ঠোঁট চেপে থাকে। মেয়েটা কালো রেশমী পোশাক পরেছে, নতুন করে মাথার চুল তরঙ্গায়িত করেছে। সে আত্মসচেতন হয়ে এগিয়ে আসে। স্পষ্টত সে নিজকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বলে ভাবছে।

প্রেসিডেণ্ট আলবার্ট ও বার্টচারের সঙ্গে তার সম্পর্ক জানতে চান। সে আলবার্টকে ঝগড়াটে আর বার্টচারকে অমায়িক মানুষ হিসেবে মন্তব্য করে, আলবার্টের সঙ্গে তার বিয়ের কথা সে কোন দিন ভাবেনি আর বার্টারের সাথে তার বাগদান হয়েছিলো বলেই বলা যায়। "মিস্টার ট্রসকির বয়েস ত খুব অল্প।" এই ব্যাখ্যা দিয়ে সে তার কটিদেশ দোলায়।

আলবার্টের কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকে, তবে সে ধীর স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। উইলি তার হাত কচলায়। আত্মসংবরণ করতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে।

আলবার্টের সাথে তার কি সম্পর্ক ছিলো, প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞেস করেন।

"সম্পূর্ণ নির্দোষ সম্পর্ক ; আমাদের উভয়ের মধ্যে পরিচয় ছিলো মাত্র।" মেয়েটা জওয়াব দেয়।

"ঘটনার সময় আসামী কি খুব উত্তেজিত ছিলো?"

"নিশ্চয়ই।" মেয়েটা উৎসাহ সহকারে জওয়াব দেয়।

এই কথায় সে যেন তোষামোদ অনুভব করে।

"সে উত্তেজিত ছিলো তা কেমন করে জান?"

"কারণ সে আমার প্রেমে গভীরভাবে মজেছিলো।" এই বলে সে হেসে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

উইলি চাপা কণ্ঠে গর্জন করে; বাদীর উকিল চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে চায়।

"নোংরা কুত্তি।" বিচাব-কক্ষে এই কথা প্রথিধ্বনিত হয়।

বিচার-কক্ষে তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়, "কে এই কথা বললো?"

প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করেন।

জাদেন বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়।

বিচারালয়ের অবমাননার অভিযোগে তার পঞ্চাশ মার্ক জরিমানা হয়।

পকেট বই বের করে সে বলে, "বড় সস্তা হলো; এখনি আদায় করতে হবে?"

তাকে আরো পঞ্চাশ মার্ক জরিমানা করে বিচার-কক্ষ পরিত্যাগের হুকুম দেয়া হয়।

মেয়েটার বেহায়াপনা এবার স্পষ্টতই কমে যায়।

"সেই সন্ধ্যায় তোমার আর বার্টচারের মধ্যে কি ঘটেছিলো?" প্রেসিডেণ্ট আবার প্রশ্ন করেন।

"কিছুই ঘটেনি," সে অস্বস্তিতে প্রতিবাদ করে। "আমরা বসে ছিলাম মাত্র।"

বিচারক আলবার্টের দিকে তাকায় "তোমার কিছু বলার আছে?"

আমি তাকে চোখ ইশারা করি। সে শান্ত কণ্ঠে 'না' বলে।

"তাহলে এই সাক্ষীর বিবৃতি সত্য?"

আলবার্ট তিক্ত হাসি হাসে; তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে যায়। মেয়েটা প্রেসিডেণ্টের মাথার উপর দেয়ালে টাঙ্গানো যীশু খ্রীস্টের প্রতিকৃতির পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। "সে যা বলছে তা হয়ত সত্যি," আলবার্ট বলে, "তবে আমি আজই প্রথম এই কথা শুনলাম। তাই যদি হয়, তবে আমার ভুল হয়েছিলো।"

মেয়েটা এবার স্বস্তিতে শ্বাস নিশ্বাস গ্রহণ করে, কিন্তু এই স্বস্তিবোধ ক্ষণস্থায়ী। উইলি লাফিয়ে ওঠে। "মিথ্যাবাদিনী। কুত্তির মত মিথ্যে কথা বলছে। তখন সে ঐ বেটার সঙ্গে পরস্পর দেহ ঘর্ষণ করছিলো। বেরিয়ে আসার সময় এই কুত্তিটা অর্ধোলঙ্গ ছিলো।"

আবার হৈ চৈ। বাদী পক্ষের আইনজীবী প্রতিবাদ করে। প্রেসিডেণ্ট উইলিকে ভর্ৎসনা করেন, কিন্তু উইলি এখন নিয়ন্ত্রণেব বাইরে। আলবার্ট তার পানে নিরাশ চোখে তাকায়। তাকে লক্ষ্য করে উইলি বলে, "তুমি এখন নতজানু হয়ে আমাকে অনুরোধ করলেও আমি এই কথা বলব যে এই মেয়েটা বেশ্যাবৃত্তি করছিলো। কাঠ-গড়ার আসামীর মুখোমুখি হলে এই মাগী তাকে জানায় যে বার্টচাব তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করেছিলো। তখনই আসামী দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গুলি করে। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাওয়ার সময় আসামী আমাকে এ কথা বলেছে।"

বিবাদী পক্ষের উকিল এই কথাটা আঁকড়ে ধরে, "হ্যাঁ, আসামী তাই করেছিলো—তাই করেছিলো।" বিভ্রান্তিতে মেয়েটা চেঁচাতে থাকে। বাদী পক্ষের উকিলও প্রচণ্ড চেঁচামেচি আর অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। "আদালত অবমাননা—আদালতের মর্যাদা—"

উইলি বাদী পক্ষের উকিলের উপর ষাঁড়ের মতন খেপে যায়। "তুমি বড় বড় বুলি আওড়িয়োনা নির্বোধ পণ্ডিত কোথাকার। বুড়ো সাপ! তুমি কি ভাবছ তোমার পরচুলা আর অপকৌশলকে পরোয়া করি? যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে এখান থেকে বের করে দিতে চেষ্টা কর। আমাদের সম্বন্ধে তুমি কি জান? কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ছেলেটা অত্যন্ত ধীর আর শান্ত ছিলো। ছিলো কি না, তার মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। কিন্তু এখন সে গুলি করে, এক কালে যেমন সে ঢিল ছুঁড়তো। অনুশোচনা? কিসের অনুশোচনা? যে লোকটা এই পৃথিবীতে তার যথাসর্বস্ব হরণ করে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে, সেই লোকটাকে গুলি করেছে বলে সে

কেন এবং কেমন করে অনুশোচনা করবে? তাকে যে দীর্ঘ চার বছর নির্দোষ মানুষকে গুলি করে হত্যা করতে হয়েছে। হ্যাঁ, একটি মাত্র ভুল সে করেছে—ভুল মানুষকে গুলি করেছে। এই মেয়েমানুষটাকে তার গুলি করা উচিত ছিলো। তুমি কি মনে কর যে চার বছর ব্যাপী এই গুলি করার প্রবণতা তার মগজ থেকে গাল-ভরা 'শাস্তি' কথাটা দিয়ে মুছে ফেলা যাবে? ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে ময়লা মুছে ফেলার মতন? আমরা ভালো করেই জানি, ব্যক্তিগত দুশমনকে আমরা গুলি করে হত্যা করতে পারি না, কিন্তু প্রচণ্ড ক্রোধে আমরা দিশেহারা হয়ে গেলে তা আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে তা ভেবে দেখ।"

বিচারকক্ষে প্রচণ্ড হট্টগোল চলে। প্রেসিডেণ্ট শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনায় ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

আমরা পাশাপাশি দণ্ডায়মান। উইলির ভয়ঙ্কর মূর্তি; কসোল মুষ্টিবদ্ধ। এই মুহূর্তে কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছুই করতে পারে না। আমরা এমনই বিপজ্জনক হয়ে গেছি। একজন মাত্র পুলিশ কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না। আমি এবার এক লাফে উপবিষ্ট জুরি সদস্যদের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। "আমরা আমাদের এক সাথীর পক্ষে আবেদন করছি; আপনারা তার বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ দেবেন না। জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে এমন উদাসীন হওয়ার আকাঙ্খা তার কোন দিন ছিলো না—আমাদের কারোরই ছিলো না, কিন্তু সীমান্তে আমাদের সব মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে হয়েছিলো। আর আমাদের প্রত্যাবর্তনের পর আমাদের সাহায্যে কেউ একটা হাত প্রসারিত করেনি। স্বদেশ প্রেম, কর্তব্য, পিতৃভূমি—এ কথাগুলো বার বার আমরা নিজেদের শুনিয়েছি শুধু এই যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য, শুধু এই যন্ত্রণার সার্থকতা প্রতিপাদন করার জন্য; কিন্তু স্বদেশ প্রেম, কর্তব্য আর পিতৃভূমি, তা ছিলো একটা বিমূর্ত ধারণা মাত্র। এই ধারণার সঙ্গে অনেক রক্তের স্মৃতি মিশে আছে, আর এই স্মৃতি এই ধারণাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

সহসা উইলি এসে আমার পাশে দাঁড়ায়।

"এক বছরও অতিক্রান্ত হয়নি যখন এই লোকটা"—সে আলবার্টকে দেখিয়ে বলে—"তার দুজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে একটা মেসিন্ গানের ঘাঁটিতে, সেক্টরে একটি মাত্র ঘাঁটি—ছিলো। তখন দুশমনের হামলা চলছে, তারা ধীর অটল চিত্তে তাক করে প্রতীক্ষা করছে। শত্রু পক্ষ সামনের পথ নিরাপদ মনে করে এগিয়ে এলে নাড়ি-উঁচু তাক করে তারা গুলি

করতে থাকে। এমনি করে অনেকক্ষণ চলতে থাকে। আক্রমণ প্রতিহত হয়। তার অনেক পর নতুন সৈন্যের আগমনে তাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। তারপর আমরা তাদের গুলিতে শত্রুপক্ষের হতাহতদের নিয়ে আসি। সাতাশ জনের পেটে গুলি লেগেছে। সবারই জখম মারাত্মক। এই লোকটাই তার দুজন সহকর্মীর সহযোগিতায় এই অসাধ্য সাধন করেছিলো। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে প্রথম শ্রেণীর আয়রণ-ক্রস পদকে ভূষিত করা হয়। তার কর্ণেল তাকে অভিনন্দন জানায়। আপনারা এখন বুঝতে পারেন; কেন এই লোকটা আপনাদের আইনের ধারা আর বেসামরিক আইনের আওয়াতায় পড়ে না। তার বিচার করার অধিকার আপনাদের নেই। সে একজন সৈনিক—আমাদের একজন। আমরা তাকে নির্দোষ বলে রায় দিলাম।"

বাদী পক্ষের উকিল তার সওয়াল-জওয়াব করতে দাঁড়ায়, "এত অস্বাভাবিক হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা"—বলেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে উইলিকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশকে হুকুম দেয়।

নতুন করে চেঁচামেচি শুরু হয়। উইলি সবাইকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমি আবার বলতে শুরু করি, "এটাকে বিশৃঙ্খলা বলছ? এটা কার দোষে? আমি বলছি এ দোষ তোমাদের। তোমাদের প্রত্যেককে আমাদের বিচারালয়ের সামনে দাঁড়ানো উচিত। তোমরা আর তোমাদের যুদ্ধ আমাদের বর্তমান অবস্থায় ফেলেছ। তার সঙ্গে আমাদের সবাইকে বন্দী করে রাখ। তাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ। যুদ্ধ সীমান্ত থেকে ফিরে আসার পর তোমরা আমাদের জন্য কখন কি করেছ? আমি বলছি, কিছুই করনি। তোমরা কেবল 'বিজয়' 'বিজয়' বলে কোলাহল করেছ। তোমরা যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচন করেছ, বীরত্বের মহিমা প্রচার করেছ আর নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করেছ।

"আমাদের সাহায্যে তোমাদের এগিয়ে আসা উচিত ছিলো, কিন্তু না, তোমরা সেই দুর্যোগময় মুহূর্তে আমাদের পরিত্যাগ করেছ যখন যুদ্ধ প্রত্যাগতদের পথের সন্ধান পাওয়া প্রয়োজন ছিলো। প্রতিটি ধর্মমঞ্চ থেকে তোমাদের তা ঘোষণা করা উচিত ছিলো। আমাদের সেনাবাহিনী যখন ভেঙে দেয়া হলো তখন বারবার আমাদের বলে দেয়া উচিত ছিলো, আমরা মহাভুল করেছি। আমরা সবাই মিলে তোমাদের পথের সন্ধান করব। সাহসে বুক বাঁধো। এটা অবশ্য তোমাদের পক্ষে [illegible] কঠিন

হবে, কারণ তোমরা পিছনে এমন কিছু রেখে যাওনি যা তোমাদের প্রত্যাবর্তনের পথের দিশা দিতে পারে। ধৈর্য ধারণ কর।' জীবনের তাৎপর্য আমাদের বুঝিয়ে দেয়া উচিত ছিলো। তা না করে তোমরা আমাদের ধুকে ধুকে মরতে দিলে। আমাদের অধঃপাতে যেতে দিলে। তোমাদের উচিত ছিলো দয়া-মায়া, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং প্রেম-প্রীতিতে আবার বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা দেয়া। তার বদলে তোমরা আবার জাল-জুচ্চোরি করতে ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রচার করতে আর ঘৃণ্য আইন চাপিয়ে দিতে শুরু করলে। আমাদের একজন ত ইতিমধ্যেই মাটির তলে চলে গেছে আর দ্বিতীয় জন এই ত দাঁড়িয়ে আছে।"

আমরা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য আত্মহারা। আমাদের সব ক্রোধ, তিক্ততা, মোহমুক্তিবোধ উত্তেজনায় টগবগ করছে। বিচার কক্ষে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা। অনেকক্ষণ এমন চলাব পর অবস্থাটা একটু শান্ত হয়। কোর্ট অবমাননাব দায়ে আমাদের প্রত্যেকের একদিনেব কারাদণ্ড হয়। আমাদেব তৎক্ষণাৎ বিচার-কক্ষ ত্যাগ করতে হয়। আমরা এখনো শক্তি প্রয়োগ করে পুলিশের হাত থেকে মুক্ত হতে পারি, কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা আলবার্টেব সাথে কারাগারে যেতে চাই। আমরা তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাই। তাকে দেখাতে চাই যে আমরা তার সঙ্গে রয়েছি।

পরে আমরা জানতে পারি যে আলবার্টের তিন বছর কারাদণ্ড হয়েছে; আর সে এই দণ্ডাদেশ শান্ত চিত্তে গ্রহণ করেছে।

(৩)

রাহের মনে একটা ধারণা শিকড় গেড়ে বসেছে যে সে তার অতীতকে আর একবার দেখবে, চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করবে। সে ফন্দী ফিকির করে একজন বিদেশীর পাসপোর্ট যোগাড় করে সীমান্ত অতিক্রম করে। সে শহর গ্রাম পেরিয়ে বড় বড় রেল-স্টেশনে অপেক্ষা করে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে।

কাল বিলম্ব না করে সে পথে নেমে শহর পেরিয়ে উঁচু ভূমির দিকে যাত্রা করে।

গ্যাস ল্যাম্পের আলোতে শিশুরা খেলা করছে; গৃহাভিমুখী শ্রমিকেরা পথে তার সামনে পড়ে। দু'একটা মোটর গাড়ী তার পাশ দিয়ে শোঁ করে বেরিয়ে যায়।

গোধূলীর ম্লান আলোতে তখনো সবকিছু বেশ দেখা যায়। যা হোক, রাহের চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত। শহর ছেড়ে সে এবার গেঁয়ো পথে চলে। একটু পরে সে একবার হোঁচট খায়। জং ধরা কাঁটাতারের বেড়ায় তার পায়জামা আটকে যায়। পায়জামাটা এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কাঁটাতার ছাড়াবার জন্য সে মাথা নীচু করে। একটা পুরানো বিধ্বস্ত ট্রেঞ্চের চারপাশের কাঁটাতারের ফাঁদ। সে আবার মাথাটা উঁচু করে। অনাবাদী যুদ্ধ প্রান্তর সামনে প্রসারিত হয়ে পড়ে আছে।

গোধূলীর আবছা আলোতে প্রান্তরটাকে একটা বরফ-জমা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বা শিলীভূত ঝড় বলে মনে হয়। রাহে মাটি বারুদ আর রক্ত মিশ্রিত একটা দুর্গন্ধ আবিষ্কার করে; তার নাসারন্ধ্রে মৃত্যুর তীব্র গন্ধ লাগে—যে মৃত্যু এখনো এই প্রান্তরে প্রতাপ-প্রতিপত্তি বিস্তার করছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে সে তার মস্তকদেশ নত করে, তার স্কন্ধদেশ কুঁজো হয়ে যায়, তার বাহুদ্বয় সামনের দিকে শিথিল হয়ে পড়ে, হাত দুটো পতনের জন্য প্রস্তুত হয়। শহুরে চলার গতিভঙ্গি আর নেই, বরং পশুর গুটিসুটি গোপন পদচারণা আর সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকের সচেতন সতর্কতা—

সে থেমে প্রান্তরটা পর্যবেক্ষণ করে। এক ঘণ্টা আগেও এই প্রান্তরটা ছিলো তার কাছে অদ্ভুত অপরিচিত। কিন্তু এখন প্রান্তরটা তার কাছে পরিচিতরূপে দেখা দেয়। প্রান্তরের প্রতিটি স্তর, প্রতিটি উপত্যকা তার চেনা। এ স্থানটা ছেড়ে সে যেন কোন দিন যায় নি; স্মৃতির প্রদীপ পুনরায় জ্বলতেই সময়ের ব্যবধান ঘুচে যায়। আর একবার লেফটান্যাণ্ট জর্জ রাহে রাত্রির অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে টহল দিচ্ছে। তার চার দিকে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা এবং তৃণ দলেব উপব বায়ু প্রবাহের মৃদুধ্বনি কিন্তু তার কর্ণকুহরে আবার যুদ্ধের গর্জন; তার চোখে পড়ে বিস্ফোরণের দৃশ্য। বিজন প্রান্তরের উপরে প্যারাসুট রকেটগুলো প্রকাণ্ড আকাশ প্রদীপের মতন ভেসে বেড়ায়। আকাশের মুখ থেকে যেন কালো কাশ নির্গত হয়; বজ্র নির্ঘোষে প্রকম্পিত ভূপৃষ্ঠ আদিগন্ত মথিত হয়ে যেন প্রস্রবণ আর গন্ধকের গহ্বর সৃষ্টি করে।

রাহে দাঁতে দাঁত চাপে। সে স্বপ্নচারী নয়, কিন্তু তবু সে তা প্রতিরোধ করতে পারে না। স্মৃতিরাশি ঘূর্ণীবায়ুর মতন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এখানে শান্তির অস্তিত্ব নেই, পৃথিবীর অবশিষ্টাংশের মতন এখানে শান্তির

ছলনাও নেই। এখানে এখনো সংগ্রাম আর যুদ্ধ চলছে, এখানে দুর্বোধ্য ধ্বংসলীলা চলছে আর ধ্বংসের ঘূর্ণীবায়ু আকাশে পথ হারাচ্ছে।

পৃথিবী তাকে ধরার জন্য মুষ্টিবদ্ধ হাত তার দিকে প্রসারিত করছে, ঘন গেরুয়া মাটি তার জুতোয় লাগছে, তার পদক্ষেপ ভারি হয়ে উঠছে। তার মৃত সঙ্গীরা যেন তাকে নিজেদের দলে আকর্ষণ করছে।

সে গহ্বর ভরা অন্ধকার প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটতে থাকে ; বাতাসেব তীব্রতা বাড়ে, মেঘেরদল দ্রুত ছুটোছুটি করে আর মাঝে মাঝে চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না মেঘের ফাঁক দিয়ে তৃণভূমিতে পড়ে। জ্যোৎস্নার ফাঁকে ফাঁকে সে চলা বন্ধ করে, তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে যায়। সে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাটির সঙ্গে মিশে নিশ্চল শুয়ে থাকে। সে জানে এটা কিছু নয়, কিন্তু আবার সে চমকে উঠে বোমাবিধ্বস্ত গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে সজ্ঞানে উন্মুক্ত দৃষ্টি মেলে ; সে এই প্রান্তরের বিধানের কাছে বশ্যতা স্বীকাব করে, যে প্রান্তরে কেউ কোন দিন মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে চলতে পাবে না।

চাঁদ একটা প্রকাণ্ড প্যারাসুট রকেট। বেড়ায় ব্যবহৃত বৃক্ষ কাণ্ড-গুলোকে জ্যোস্নায কালো দেখায়। বিধ্বস্ত প্রান্তরের বাইবেব ঢালু জায়গাটা দিয়ে কোন দিন আক্রমণ হয়নি। রাহে ট্রেঞ্চে উবু হয়ে বসে। কোমব বন্ধের ছেঁড়া টুকরো, দুটো মেস-টিন, একটা চামচ, মাটি মাখা হাত-বোমা, গুলির-থলি ট্রেঞ্চে পড়ে আছে ; আর তার পাশে ভিজা ধূসব-সবুজ কাপড়েব টুকরো, কাপড়ের জীর্ণ ফালি—কোন সৈনিকের ধ্বংসাবশেষ।

সে মাটিতে মুখ রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে—স্তব্ধতা কথা বলতে শুরু করে, মাটির অভ্যন্তরে শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি—গর্জন, গুড়গুড় শব্দ, হাততালি আর টুংটাং চাপা শব্দ। সে মাটি আঁকড়ে মাটিতে মাথা চেপে ধবে। তার মনে হয় সে কণ্ঠস্বর আর কান্না শুনতে পাচ্ছে। তার ইচ্ছে হয প্রশ্ন করতে, কথা বলতে, চীৎকার করতে। সে কান পেতে উত্তরেব প্রতীক্ষা করে—জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর।

কিন্তু কেবল বাতাস শোঁ শোঁ করে, মেঘের দল আরো নিচু দিয়ে দ্রুত ছুটে যায়, প্রান্তবের বুকে ছায়া ছায়াকে অনুসবণ করে। রাহে নিজেকে টেনে তুলে অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন চলে। শেষ পর্যন্ত সে অনেকগুলো কালো রঙের ক্রুশের সামনে থামে। একটার পিছনে একটা এমনি দীর্ঘ সারিবদ্ধভাবে ক্রুশগুলো দাঁড়িয়ে আছে যেমন করে দলে দলে একটা

কোম্পানী একটা ব্যাটেলিয়ান, একটা ব্রিগেড, একটা বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

সহসা সবকিছু তার বোধগম্য হয়ে যায়। এই ক্রুশগুলোর সামনে সব অবাস্তব বিমূর্ত ধারণা আর গালভরা সুন্দর চমৎকার বুলির প্রাসাদ-কাঠামো ধ্বসে পড়ে আছে; এখানেই শুধু এখনো যুদ্ধের অস্তিত্ব আছে। যারা এখান থেকে চলে গেছে তাদের মনে বা বিকৃত স্মৃতিতে যুদ্ধের অস্তিত্ব নেই। এখানেই শুধু জীবনের অতৃপ্ত দিনগুলো কবরের উপর আলেয়ার আলোর মতন বিরাজ করছে। এখানেই অতৃপ্ত অশান্ত জীবন প্রচণ্ড নীরবতায় আর্তনাদ করছে; এখানেই একটা অকালমৃত তরুণ পুরুষানুক্রমের শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা রাত্রির অন্ধকারে বিলাপ করছে।

তার দেহে শিহরণ জাগে। একটা তীব্র চীৎকারে সে শূন্যগর্ভ চোয়ালগুলো চিনতে পারে। এখানে একটি পুরুষানুক্রমের সত্য, শৌর্য আর জীবন নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই ভাবনা তার চিন্তাজাল ছিন্ন করে দেয়; তাকে ধ্বংস করে দেয়।

"আমার কমরেডস!" আমার সাথীরা! সে রাত্রি আর বায়ু প্রবাহকে সম্বোধন করে চীৎকার করে "কমরেডস, আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, এর বিরুদ্ধে কমরেডস!"

সে ক্রুশগুলোর সামনে দাঁড়ায়। ভাসমান মেঘের ফাঁকে বিচ্ছুরিত জ্যোস্নার আলোতে ক্রুশগুলো আলোকিত হয়। ক্রুশগুলো সম্প্রসারিত বাহু মেলে মাটির অভ্যন্তর থেকে উঠে আসে। তাদের পদক্ষেপ এগিয়ে আসে। সে তাদের সামনে পায়চারি করে। সে তার হাত সামনে প্রসারিত করে হাঁকে, "কমরেডস—মার্চ"—সাথীরা আমার এগিয়ে চল।

তার হাতটা পকেটে ঢোকে; আবার বাহুটা উপরে ওঠে। একটা একক গুলির শব্দ বাতাসে চার দিক ছড়িয়ে পড়ে। সে টলতে টলতে জানু পেতে বসে পড়ে। সে দুই বাহুতে ভর দিয়ে শেষ চেষ্টা করে ক্রুশগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। ক্রুশগুলো মার্চ করছে—এগিয়ে যাচ্ছে—ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের অনেক দূর যেতে হবে, অনেক সময় লাগবে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তারা শেষ যুদ্ধ করবে—জীবন-যুদ্ধ। তারা নীরবে সম্মুখ পানে এগোচ্ছে। এক কালো বাহিনী—পথ দীর্ঘ—মানুষের হৃদয়-অভ্যন্তরে এই পথের শেষ। অনেক বছর লাগবে,

কিন্তু তাদের কাছে সময়ের দীর্ঘতা কোন সমস্যা নয়। তারা তাদের শিবির ভেঙ্গে ফেলেছে, তারা চলছে—

তার মাথাটা নুয়ে পড়ে; তার চার দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সে নিজেও সারিবদ্ধ সেনাবাহিনীর সাথে এগোয়। কিন্তু বিলম্বে পথের সন্ধানপ্রাপ্ত ক্লান্ত পথচারীর মত সে এগোতে পারেনা, পথের মাটিতে পড়ে থাকে। তার বাহু দুটো প্রসারিত, দৃষ্টি ম্লান, জানু উঁচানো। দেহটায় আর একবার টান পড়ে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খিঁচতে থাকে। তারপর ঘুম আর ঘুম। এখন কেবল বাতাস বিজন প্রান্তরে হুহু করে গুমরে ফিরে। তার মাথার উপর অসীম সুনীল আকাশ আর মেঘের দল; চার দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তরের পরিখা, বিধ্বস্ত গহ্বর আর ক্রুশের সারি।

উপসংহার

(১)

মাটিতে মার্চ মাস আর ভায়োলেট ফুলের গন্ধ, তুষার বিন্দু আর চষা মাঠ বেগুনী লাল।

আমরা বন-পথ দিয়ে চলি। উইলি আর কসোল সামনে, ভ্যালেণ্টিন আর আমি তাদের পিছনে। কয়েক মাসের মধ্যে প্রথম বার আমরা একত্র হয়েছি। এখন আমাদের খুব বেশী দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

কার্ল তার নতুন গাড়ীটা আজকের জন্য আমাদের ধার দিয়েছে। সে আসতে পারে নি। তার সময় নেই। কয় মাস থেকে সে দেদার টাকা বানাচ্ছে। মার্কের মূল্যমান কমছে বলে তার ব্যবসায় খুব সুবিধে হচ্ছে। তাই তার সোফার গাড়ী চালিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছে।

"তুমি আসলে এখন কি করছ ভ্যালেণ্টিন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মেলায় মেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াই।" সে জওয়াব দেয়, "নাগরদোলা নিয়ে।"

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাই, "কবে থেকে?"

"তা অনেক দিন থেকে। আমার অংশীদার—তার কথা তোমার মনে আছে?—আমাকে বাদ দিয়েছে। সে এখন একটা রেস্তোঁরায় নাচে, ফক্সট্রট আর ট্যাঙ্গো নাচ। আজকাল এ নাচের খুব চাহিদা আর

তুমি ত জান আমার মতন যুদ্ধফেরত বুড়ো-হাবড়া এ ধরনের কাজের পক্ষে যথেষ্ট চটপটে নয়।"

"এই নাগর-দোলার ব্যবসায় কি বেশ আয় হয়?" আমি প্রশ্ন করি।

সে মাথা নাড়ে, "সে কথা আর বলোনা। পেট চলার জন্য যথেষ্ট নয় তবে মরণের জন্য যথেষ্ট; যদি আমার বক্তব্যটা তুমি বুঝতে পার। আর এই যে দিন রাত ঘুরে বেড়ানো—আগামী কাল আবার আমাদের পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। এবার ক্রেফেল্ডে যাব। মেরুদেশে বলতে পার আর্নস্ট,—জাপের কি হলো জান?"

আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দেই। "আমার মনে হয় শহর ছেড়ে চলে গেছে। এডলফও তাই। তাদের আর দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।"

"আর আর্থার?"

"সে একজন লক্ষপতি বনতে যাচ্ছে," আমি জওয়াব দেই।

"দু'একটা কাজ সে ভালো জানে।" ভ্যালেণ্টিন বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে।

কসোল চলতে চলতে থেমে হাত প্রসারিত করে বলে, "ওহে ছোড়ার দল, বেড়ানোটা চমৎকার সন্দেহ নেই যদি এই বেড়ানোর জন্য বেকার হয়ে থাকতে না হয়।"

"তোমার কি মনে হয় না যে শীগগিরই কোন একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে?" উইলি প্রশ্ন করে।

ফার্ডিন্যাণ্ড মাথা দুলিয়ে বলে, "তা এত সহজ নয়। কালো তালিকায় আমার নাম রয়েছে। আমি নাকি যথেষ্ট বশংবদ নই; তবু স্বাস্থ্যটা যে ভালো আছে তাই যথেষ্ট। আমি তাই মাঝে মাঝে বেঁচে থাকার জন্য জাদেনের গায়ে হুল ফুটিয়ে কিছু আদায় করি। সে ষাঁড়-ভেড়া-ঘোড়াব নাড়ী-ভুঁড়ি-চর্বির মধ্যে বেশ জেঁকে বসে আছে।"

অরণ্যের এক উন্মুক্ত জায়গায় আমরা থামি। কার্লের দেয়া এক বাক্স সিগার উইলি সবার সামনে তুলে ধরে। ভ্যালেণ্টিনের মুখে হাসি ফোটে। আমরা সবাই বসে বসে সিগার খাই।

গাছের শাখাগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে। কয়েকটা পাখী কিঁচির-মিচির করে। সূর্যের তাপ বেশ কড়া। উইলি হাই তোলে কোটটা বিছিয়ে তার উপর সটান শুয়ে পড়ে। কসোলও কতক শেওলা আর

লতা-পাতা জড়ো করে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ে। ভ্যালেণ্টিন করুণ মুখে একটা বীচ গাছের গোড়ায় বসে থাকে।

আমি এই পরিচিত মুখগুলোর পানে তাকাই। সহসা আমার চিন্তা-ভাবনা ওলট-পালট হয়ে যায়। এইত আমরা সবাই এক জায়গায় একত্র বসে আছি—আগে যেমন বহুবার বসেছি। কিন্তু এখন আমরা সংখ্যায় অনেক কম। আমরা কি সবাই সত্যি আগের মতন একত্র আছি?

কসোল কান খাড়া করে। দূর থেকে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কচি কণ্ঠস্বর। ওয়াণ্ডারভুয়েগেল—ঋতু পরিবর্তনের উৎসব। তরুণের দল এই রূপালী কুয়াশার দিনে গীটার নিয়ে যাযাবরের মতন পোশাক পরে অরণ্যে ঘুরে বেড়াবে। যুদ্ধের আগে আমরাও এই উৎসব পালন করতাম। লুদভিগ, ব্রেয়ার, জর্জ রাহে আর আমি। আমি পিছনে হেলান দিয়ে সে-সব দিনের কথা ভাবি।—ক্যাম্প ফায়ারের চার পাশে বসে লোকগীতি আর গীটার বাদন—মনোরম রাত্রে তারা ভরা আকাশ। সে ছিলো আমাদের তরুণ জীবন। তখনকার ওয়াণ্ডারভুয়েগেল উৎসবে ছিলো তারুণ্যের উচ্ছলতা, কল্পনাবিলাস আর উৎসাহ-উদ্দীপনা। আমাদের ট্রেঞ্চ জীবনেও এই উৎসব কিছু কাল উদযাপিত হয়েছিলো, কিন্তু ১৯১৭ সালে যান্ত্রিক যুদ্ধের ভয়াবহতায় তা বন্ধ হয়ে যায়।

কণ্ঠস্বর এগিয়ে আসে।

শোভাযাত্রার অতিক্রমণ প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি বাহুতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করি। অদ্ভুত মনে হয়। মাত্র কয় বছর আগেও আমরা এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কিন্তু এখন মনে হয় এরা অন্য এক পুরুষানুক্রম—আমাদের উত্তরপুরুষ। আমাদের অসম্পূর্ণ কাজ এরাই সম্পন্ন করবে—

চীৎকার প্রতিধ্বনিত হয়, ঐক্যতানের প্রতিধ্বনি; তারপর একটি মাত্র কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট শোনা যায়, কথা বোঝা যায় না। গাছের ডাল ভাঙছে, অনেক পায়ের পদচারণায় মাটি কাঁপছে, আবার একক চীৎকার, আবার অনেক পায়ের পদচারণায় শব্দ, তারপর স্তব্ধতা। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিঃসৃত স্পষ্ট হুকুম "ক্যাভালরি এপ্রোচিং বাই দি রাইট"—অশ্বারোহী বাহিনী ডান দিক দিয়ে আসছে—"বাই স্কোয়াড রাইট হুইল"—স্কোয়াড ডান দিকে ঘোর, "ডাবল্ মার্চ"—জোর কদম এগোও।

কসোল তড়াক করে উঠে যায়, আমিও; আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। আমরা কি সম্মোহিত হয়েছি? এ সবের অর্থ কি? এরা লতা-পাতার

আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছুটে অরণ্যের কিনারে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। আবার হুকুম "রেঞ্জ ফোর হানড্রেড"—পাল্লা চারশো গজ—"কভারিং ফায়ার" আত্মরক্ষামূলক গুলি—,"ফায়ার"—গুলি চালাও।

গুলির ঠকঠক শব্দ। ষোল থেকে আঠারো বছর বয়েসের তরুণদের এক দীর্ঘ সারি—পাশাপাশি অরণ্যের কিনারে শায়িত। তাদের পরনে ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট, চামড়ার কোমরবন্ধ সৈনিকের কোমর বন্ধের মতন বকলেস-আঁটা, সবার পোশাক অভিন্ন ; জ্যাকেট-পট্টি আর ব্যাজওয়ালা টুপি। অভিন্নতার উপর জোর। প্রত্যেকের হাতের ডগায় ইস্পাত লাগানো লাঠি। এ দিয়ে তারা গাছের কাণ্ডে আঘাত করে মেসিনগানের গুলির শব্দ অনুকরণ করে। কিন্তু সামরিক টুপির তলা থেকে রক্তিমগণ্ড কচিমুখ বেরিয়ে পড়ে। সতর্ক দৃষ্টিতে তারা অগ্রসরমান কাল্পনিক শত্রুদের খোঁজে। তাদের চোখে হলুদ পাতার আড়ালে লুক্কায়িত ভায়োলেটের কচি কিশলয়ের সৌন্দর্য পড়ে না, মাঠের বুকে অঙ্কুরিত ঘাসের রক্তিম মুকুলও তারা দেখতে পায় না। তারা দেখতে পায়না কচি খরগোসের দেহের সুবিন্যস্ত লোম। হ্যাঁ, খরগোসটা তারা দেখে, তবে তার সুবিন্যস্ত লোমের অপরূপ সৌন্দর্য না দেখে তারা খরগোসটাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করে আর সেই আঘাত বৃক্ষকাণ্ডে পড়ে ঠন ঠন শব্দ করে। তাদের পিছনে একজন শক্ত বেঁটে মজবুত লোক। তার পরনেও সামরিক পোশাক। সে হুকুম দেয়—"স্লো ফায়ার"—মন্থরভাবে গুলি কর। "দুশো গজ দূরে।" সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে কাল্পনিক দুশমনদের পর্যবেক্ষণ করছে।

"হায় যীশু!" আমি আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠি।

কসোল তার বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছে। "এটা আবার কি ধরনের নির্বুদ্ধিতা?" সে গর্জে ওঠে।

কিন্তু সে এবার বিপদে পড়ে যায়। দলের সর্দার—তার সঙ্গে আরো দুজন পরামর্শদাতা যোগ দিয়েছে—তার পানে কঠোর দৃষ্টি হেনে গর্জন করে। তার গর্জনে গ্রীষ্মের আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। "মুখ বন্ধ কর নির্বোধ ফাঁকিবাজেব দল, পিতৃভূমির শত্রু, বিশ্বাসঘাতকের দল!"

অন্য বালকেরা এবার সোৎসাহে তার সঙ্গে যোগ দেয়। একজন তার কচি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, "তোমাদের মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।" অন্য একজন ছেলে চেঁচায় "ভীরুর দল!" তৃতীয় বালক চেঁচায় "শান্তিবাদীর দল!" চতুর্থ বালক এবার বলে ওঠে,

"এই বলশেভিকদের উৎখাত করতে হবে, নইলে জার্মানী কোন দিন স্বাধীন হবে না।"

"ঠিক বলেছ।" সর্দার তার পিঠে সমর্থনসূচক মৃদু আঘাত করে বলে, "এদের এখান থেকে ভাগাও।"

ঠিক সেই মুহূর্তে উইলির ঘুম ভাঙে; সে এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলো। এ ব্যাপারে সে এখনো খাঁটি সৈনিক রয়ে গেছে। শুয়ে পড়তে পারলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সে দাঁড়িয়ে উঠতেই সর্দার থেমে যায়। উইলি চারদিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে। "এখানে কি হচ্ছে? ফ্যান্সি ড্রেস বল?" এ প্রশ্ন করেই সে পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করে। "তাই ত, তোমরা এখানে এসেছ দেখছি।" বলে সে সর্দারের প্রতি গর্জন করে। "তোমাদের কি হয়েছে, তাই এতক্ষণ ভাবছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। পিতৃভূমি—এত মৌরসী পাট্টা বলে তোমাদের সম্পত্তি। আর তোমরা ছাড়া বাকী সবাই বিশ্বাসঘাতক। তা হলে মজার ব্যাপার হলো, জার্মান-সেনাবাহিনীর তিন চতুর্থাংশ লোক বিশ্বাসঘাতক। এবার এখান থেকে সরে পড় বাঁদরের দল। এই বাচ্চারা যাদের এসব ব্যাপার জানার কোন প্রয়োজন এখন নেই, তাদের কি এ কয়টা বছরও উপভোগ করতে দিতে পারছ না?"

সর্দার তার বাহিনী নিয়ে সরে পড়ে; কিন্তু তারা বনভূমিতে আমাদের অবস্থানের আনন্দটা নষ্ট করে দিয়ে গেলো। আমরা শহর অভিমুখে ফিরে যাই। আমাদের পিছনে তাদের গাওয়া দেশাত্মবোধক গান প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়।—"সীমান্ত। সীমান্ত। সীমান্ত।"

"সীমান্ত।" উইলি নিজের মাথার চুল টানতে টানতে বলে, "যদি সীমান্তের সৈন্যদের কেউ সীমান্তে এ গান গাইতো।"

"হ্যাঁ" কসোল বিরস কণ্ঠে বলে "সুতরাং আবার নতুন করে খেলা শুরু হলো—"

গাঁয়ের ঠিক বাইরে একটা বিয়ারের উদ্যান দেখতে পাই। সেখানে উন্মুক্ত অঙ্গনে কয়েকটা টেবিল পাতা আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ভ্যালেনটিনকে চলে যেতে হবে জেনেও আমরা তাড়াতাড়ি বিয়ার খেতে বসে যাই: সময়ের সদ্ব্যবহার করতে চাই। কে জানে আবার কবে আমরা একত্র হব।

রক্তিম সূর্যের আভায় পশ্চিমাকাশ রাঙা হয়ে উঠছে। অরণ্যে যা দেখে এলাম সে দৃশ্য কিছুতেই আমরা ভুলতে পারছিনা। "হায় প্রভু।" উইলিকে লক্ষ্য করে বললাম, "উইলি, আমরা ত কোন মতে জীবন বাঁচিয়ে ফিরে এলাম; আচ্ছা, প্রভুর নাম করে বলত, ঠিক এই ধরনের কাজ করার জন্য আগ্রহী হবে, এমন মানুষ কেমন করে থাকতে পারে—"

"সব সময়ই এমন মানুষ থাকবে" উইলি অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে জওয়াব দেয়। "তবে আমাদের নিজেদের কথা ভুলো না; আমরাও আছি। আমাদের চিন্তাধারার মতন অনেকেরই চিন্তাধারা; হয়ত বেশীর ভাগেরই তাই। তুমি জান সেই সময় থেকে—লুদ্‌ভিগের মৃত্যু আর আলবার্টের কারাদণ্ড থেকে—আমার মগজে বহুবিধ চিন্তারাশি আনাগোনা করছে। আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে প্রত্যেকেই আপন সাধ্য মতন একটা কিছু করতে পারে, যে যত গবেটই হোক। আগামী সপ্তাহে আমার ছুটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আবার আমাকে শিক্ষকতার কাজে গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে; তাতে আমি যে খুশী তাতে সন্দেহ নেই। পিতৃভূমির সত্যিকার অর্থ কি, আমি আমার কচি ছাত্রদের তাই শিখাতে চাই। তাদের দেশ কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী নয়—তাদের স্বদেশ বৃক্ষ-লতা আব ভূমি-প্রান্তরের সৃষ্টি মাত্র; গাল ভরা বুলি নয়। আমি অনেক দিন থেকে এই সত্য উপলব্ধি করছি যে, একটা কিছু করার মতন যোগ্যতা আর বয়েস আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। আমার কাজ শিক্ষকতা করা আর আমার জন্য এ কাজই যথেষ্ট। আমি ত আর গ্যাটে নই।"

আমি মাথা দুলিয়ে তার কথায সায় দিয়ে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি; তারপর আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।

সোফার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। গোধূলীর ঘনায়মান অন্ধকারে গাড়ী চলতে থাকে। আমরা শহরের কাছাকাছি এসে গেছি। শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। গাড়ীর টায়ারের আওয়াজের সঙ্গে অন্যান্য আওয়াজ মিশছে। সন্ধ্যাকাশের বুক চিরে কীলকাকৃতির কি একটা উড়ে যাচ্ছে—এক ঝাঁক বুনো হাঁস। আমরা সেদিকে তাকাই। কস্যোল একটা কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়। আমাদের সবার মনে একই ভাবনা। আমরা এবার শহরের কোলাহলে প্রবেশ করি। ভ্যালেণ্টিন প্রথম নেমে যায়—তারপর উইলি—তারপর আমি।

সারা দিন অরণ্যে ছিলাম, তাই ক্লান্ত। আমি গ্রামাঞ্চলের একটা সরাইয়ে গিয়ে রাত্রির জন্য একটা ঘর ভাড়া নিলাম। বিছানা পাতা রয়েছে। তবে আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। আমি জানালার পাশে বসে গ্রীষ্ম রাত্রির চাঞ্চল্য কান পেতে অনুভব করি।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছায়ারা নীরবে ইতস্তত: নড়া-চড়া করে। অরণ্য-ভূমি থেকে আর্তকণ্ঠ ভেসে আসে। মনে হয় আহতের দল সেখানে পড়ে থেকে আর্তনাদ করছে। শান্ত চিত্তে নীরবে আমি অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি। অতীতের ভয়-ভীতি আমার আর নেই। অতীতের ভ্রূকুটি দেখে আমি আর ভয়ে পালিয়ে আসিনা, বরং তা দেখার জন্য দৃষ্টি মেলে দেই। আমার চিন্তাধারা আমি অতীতের পরিখা আর বোমাবিধ্বস্ত গর্ত-গুলোতে পাঠিয়ে দেই। সেই চিন্তাধারা যখন আমার কাছে ফিরে আসে, তখন তা ভীতি আর আতঙ্কের শিহরণ নিয়ে ফিরে আসে না, বরং সাহস আর ইচ্ছা-শক্তি সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে।

আমি এমনি এক ঝড়ের প্রতীক্ষা করেছি যে-ঝড় আমাকে জোর করে বিপদ থেকে মুক্ত করে আনবে। আমার অগোচরে মৃদু গতিতে সেই ঝড় আমার জীবনে এসেছে আর তা এখানেই আছে। আমি যখন নিরাশ চিত্তে ভাবছিলাম যে আমার সব শেষ হয়ে গেছে, তখনই নীরবে এই ঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছিলো। আমি ভেবেছিলাম বিভাজনে সবকিছুর শেষ, কিন্তু এখন আমি জানি ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়ায়ও বিভাজন রয়েছে। আর নব সৃষ্টির মূলে রয়েছে পুরাতনকে বিসর্জন।

আমার জীবনের একটা কাল বিনাশ সাধনের কাজে ব্যয়িত হয়েছে। সে জীবনে ছিলো ঘৃণা-বিদ্বেষ, হত্যা-নৃশংসতা-শত্রুতা; কিন্তু তাতে আমার জীবনের অস্তিত্ব নিঃশেষিত হয় নি। এই অস্তিত্ব আমার জন্য যথেষ্ট। আমার অস্তিত্ব নিঃশেষিত হয় নি; এই অস্তিত্ব আমার জন্য যথেষ্ট—আমার অভীষ্ট সাধনের ক্ষমতা জীবন-পথের পাথেয়। আমি আপন মনে কাজ করে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করব। আমি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর চিন্তা শক্তিকে কর্মতৎপর করে তুলব। জীবনটাকে সহজভাবে গ্রহণ করব; জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে যাব না। অনেক কিছু নতুন করে তৈরি করতে হবে, আর যা তৈরি আছে তার প্রায় সব-গুলোরই সংস্কার প্রয়োজন। যুদ্ধকালের '[illegible]

যা মাটি চাপা পড়েছে, সেগুলো উদ্ধারের জন্য কাজ করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সবাইকে যে প্রবর্তকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। দুর্বলতর এবং ক্ষীণ শক্তির অধিকারী মানুষের জন্যও কাজ রয়েছে। আমি তাদের মধ্যেই আমার স্থান খুঁজে নেব। তবেই মৃত আত্মারা তৃপ্তি পাবে ; অতীত আমাকে আর অনুসরণ করবে না বরং আমার সহায় হবে।

কত সহজ এই উপলব্ধি—কিন্তু তা অর্জনে আমার কত দীর্ঘ সময় লাগলো। লুদভিগের মৃত্যু আকাশ-প্রদীপের মতন জ্বলে আমাদের পথের ইঙ্গিত না দিলে আমরা হয়ত এখনো পথভ্রষ্ট হয়ে বিজন প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে কাঁটাতারের ফাঁদে বা বিস্ফোরক পদার্থের শিকার হতাম। যখন দেখলাম যে আমাদের স্বাভাবিক মহান অনুভূতি—নির্বুদ্ধিতা বিবর্জিত ইচ্ছাশক্তি আর মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনা জীবন—আমাদের চলা-পথের বাধা বিঘ্ন সব অর্ধ সত্য আর স্বার্থপরতাকে ঝেঁটিয়ে সরিয়ে আমাদের জন্য নতুন পথের সন্ধান দিতে পারলো না, বরং আমরা বিস্মৃতির জলাভূমিতে চমৎকার বুলির পাকে আর সামাজিক কর্মতৎপরতা, দুশ্চিন্তা আর অপকর্মের খানাডোবায় পড়ে গেলাম, তখনই আমরা নিরাশ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে সারা জীবনটাই হয়ত প্রস্তুতি গ্রহণের সময় ; মানুষের দেহ-কোষে প্রাণ-সঞ্চারের প্রক্রিয়া। আলোড়নের ফলে বৃক্ষের দেহ-কোষে প্রাণের সঞ্চার হয়। তারপরই বৃক্ষে শাখা-প্রশাখা মেলে, ফুল ফোটে, ফল ধরে। আমিও এবার প্রস্তুতি গ্রহণ করব।

আমরা তরুণ বয়েসে যে রঙিন স্বপ্ন দেখতাম এবং সীমান্ত-জীবনের অবসানে যে প্রাপ্তি আশা করতাম তা পরিপূর্ণরূপে রূপায়িত হবে না। আমাদের চলার পথ হবে অন্যান্য পথের মতন। কোথাও কঙ্করময়, কোথাও এবড়োখেবড়ো, কোথাও মসৃণ সমতল পল্লী প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে প্রসারিত। সে পথ হবে পরিশ্রমের পথ। আমাকে একলা চলতে হবে ; কখনো হয়ত চলার পথে সাথী জুটবে, কিন্তু ধরে নিতে হবে যে হয়ত কোন সাথী জুটবে না।

বারবার হয়ত বোঝার ভারে ক্লান্ত স্কন্ধ নুয়ে পড়বে, বারবার হয়ত পথের মোড়ে বা পথ-সীমান্তে পৌঁছে দ্বিধাগ্রস্ত হব ; কখনো হয়ত পথে একটা-কিছু ফেলে আসব, কখনো হয়ত হোঁচট-খেয়ে পড়ে যাব। কিন্তু আবার আমি উঠে দাঁড়াব ; সেখানে পড়ে থাকব না ; পিছন পানে না তাকিয়ে

আমি পথ চলতে থাকব। হয়ত প্রকৃত সুখী কোন দিন হব না ; যুদ্ধ হয়ত তা বিনষ্ট করে দিয়ে গেছে। আমি হয়ত কাজে মন প্রাণ ঢেলে দিতে পারব না, কোথাও স্থির থাকতে পারব না, তবে একবারে অসুখীও হয়ত হব না। কারণ একটা কিছু সর্বদা আমাকে টিকে থাকার সামর্থ্য দেবে— হয়ত আমার এ দুটো হাত মাত্র, অথবা একটা বৃক্ষ অথবা এই প্রাণচঞ্চল পৃথিবী।

বৃক্ষের প্রাণরস কাণ্ড বেয়ে উপরে ওঠে, অঙ্কুরের দল মৃদু শব্দে কাণ্ডের আবরণ ভেদ করে বেরোয় ; ক্রমবৃদ্ধির শব্দে অন্ধকার ভরে যায় ; চার দিকে প্রাণ চাঞ্চল্য জাগে। প্রাণচাঞ্চল্যে ঘরের আসবাব-পত্র ক্যাচ ক্যাচ করে, টেবিল-আলমারীতে চিড় ধরে। বহু বছর আগে কেউ গাছ কেটে টুকরো করে রেঁদা চালিয়ে টুকরোগুলো মসৃণ করে প্রয়োজনীয় আসবাব তৈরি করেছিলে। কিন্তু প্রতি বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে এগুলো প্রাণ চাঞ্চল্যে জেগে ওঠে। এগুলো আর প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র থাকে না, বাইরের জীবন-প্রবাহের অঙ্গ হয়ে দেখা দেয়। তখন আমার পায়ের তলাব তক্তা, জানালার কাঠামো ক্যাচ ক্যাচ করে। এমন কি আমার ঘরের বাইরে পথের পাশে পড়ে-থাকা জীর্ণ বাতাবী গাছেব কাণ্ডটা থেকে পর্যন্ত অঙ্কুব উদ্‌গত হয়। আর কয় সপ্তাহের মধ্যে এই কাণ্ডটার মাথার উপর প্রসারিত প্রকাণ্ড বাতাবী গাছটার মতন এই কাণ্ডটাও পেলব সবুজ কিশলয়ে ভবে উঠবে।